صحابیات
از نیاز فتحپوری
মহিলা
সাহাবী
নিয়ায
ফতেহ্‌পুরী

মহিলা সাহাবী

(সংশোধিত ও বর্ধিত সংস্করণ)

নিয়াজ ফতেহ্‌পুরী

অনুবাদ

গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

প্রফেসর'স বুক কর্ণার-ঢাকা

মহিলা সাহাবী

নিয়াজ ফতেহ্‌পুরী

অনুবাদ : গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

প্রকাশনায়

প্রফেসর'স বুক কর্ণার

১৯১ ওয়ারলেস রেলগেইট

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪১৯১৫, মোবাইল : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

প্রকাশকাল

১ম প্রকাশ : জুন, ১৯৮৭

৪র্থ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৭

পরিবেশনায় :

প্রফেসর'স বুক কর্ণার
১৯১, ওয়ারলেস রেলগেট,
বগ মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৯১৫, ০১৭১৬-৬৭৭৭৫৪

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
বড় মগবাজার ঢাকা
ফোন ঃ ৮৩৫৮৭৩৪

প্রচ্ছদ : প্রফেসর ডিজাইন সেন্টার

মুদ্রণ : ফয়সাল প্রেস

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র।

Mohila Shahabi : Written by Niaz Fathapuri Translated by Golam Shobhan Siddiki. Published by Professor's Book corner Dhaka.
Price: 140 Taka only.

উৎসর্গ

ইসলামী জীবনধারা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়িত করা যাদের স্বপ্ন, সে সব নারী সমাজের উদ্দেশ্যে ...
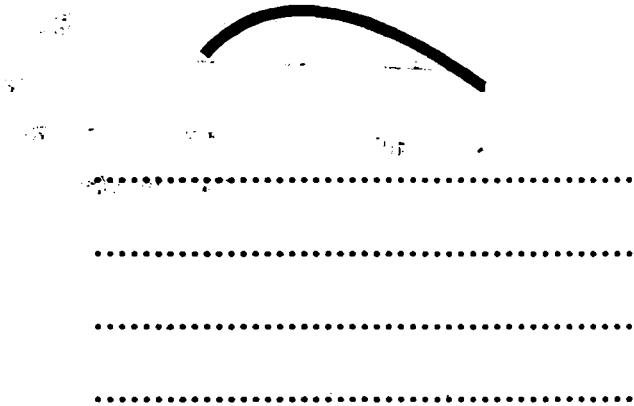
অনুবাদকের আরয

আল্‌হামদুলিল্লাহ 'মহিলা সাহাবী' তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এজন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো শুকরিয়া আদায় করছি।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে যেমনি পুরুষ ছিলেন, তেমনি ছিলেন মহিলাও। রিজাল শাস্ত্রে রচিত গ্রন্থাবলীতে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা সাহাবীদের সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থে মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাম, বানাতে তাইয়্যেবাত ছাড়াও ৪৪ জন মহিলা সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত পেশ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, পুরুষ সাহাবীদের জীবনী গ্রন্থ সাহাবা চরিত নামে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মহিলা সাহাবী সম্পর্কে বাংলা ভাষায় আলোচনা এই প্রথম। লেখক অনেক পরিশ্রম করে আরবী ভাষায় রচিত প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদী থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সংক্ষেপে অথচ খুবই সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। যে-সব মহিলা সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকে কেবল তাঁদের সম্পর্কেই নয়, বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়।

মোটকথা আজকের পরিবর্তিত সমাজে এ গ্রন্থখানী আলোকবর্তিকার কাজ করবে মনে করে আমি এটি অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছি। দিশেহারা নারী সমাজ এ গ্রন্থ পাঠে বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির দিশা পেলে শ্রম সার্থক মনে করবো।

পাঠক মহলের প্রতি অনুরোধ, আমি যেন নিয়মিত ভালো বই আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি, আমার জন্য আপনারা এ দোয়াই করবেন।

গোলাম সোবহান সিদ্দিকী
মে ২০০৪

প্রকাশকের কথা

'মহিলা সাহাবী' আমাদের প্রকাশনার একটি অন্যতম বই। বইটির ভূমিকাতে লেখক মুসলিম নারী সমাজের ঐতিহ্যকে সুন্দর ও সাবলিল ভাষায় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। যা প্রশংসার দাবীদার। বইটির ৪র্থ সংস্করণ প্রকিয়ার কারণে বর্তমানে বাজারে নেই। যার কারণে পাঠকমহল ও পাইকারদের তাগিদ দিন দিন বাড়ছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি তাগিদপত্র আমাদের নিকট এসেছে।

আলহামদুলিল্লাহ বইটির ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে অতিসত্তর। কিন্তু বইটি প্রকাশ করতে গিয়ে নানা সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে। যার ফলে প্রকাশনায় একটু বিলম্ব হলো। সাময়িক অসুবিদার জন্য আমরা দুঃখিত। বর্তমানে প্রকাশনা শিল্পের সকল খরচ বাড়ায় বইটির মূল্য সামান্য বাড়ানো হলো। বইটিতে মুদ্রণ জনিত ভুল-ক্রটি থাকা স্বাভাবিক। ভুল-ক্রটি ধরা পড়লে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদের জানালে তা পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

বইটি পড়ে পাঠক সমাজ উপকৃত হলে শ্রম স্বার্থক মনে করবো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে উত্তম যাযা দান করুন। আমীন।

—প্রকাশক

সূচিপত্র

আজওয়াজুন্নবী বা নবী সহধর্মিণী

বানাতুন্নবী বা নবী দুলালী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

মানুষের জীবন ধারায় 'নারী' প্রসঙ্গটি ইদানীং এতটা গুরুত্ব অর্জন করেছে যে, খোদার এই 'নাজুক' অথচ 'অতীব গুরুত্বপূর্ণ' সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা ছাড়া জীবনের কোন বিভাগ সম্পর্কেই আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয় না, হতে পারে না। কারণ, নীতি-নৈতিকতা জগতের কোন দিককেই নারী থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এ নাজুক শ্রেণীটিকে বাদ দিলে সমাজতত্ত্ব আর সভ্যতার ধারণাই অচল হয়ে পড়ে। নারীর স্বভাব-সুলভ লাজ-লজ্জা ও নির্জন-প্রীতি দেখে পুরুষ এ ধারণা করতে পারে যে, বিশ্ব-জাহানের এ কর্মশালায় তার কোন গুরুত্ব নেই। তার নরম-নাজুক দেহ, সূক্ষ্ম-ক্ষণভঙ্গুর ও দ্রুত প্রভাবিত হৃদয়ের কথা বিবেচনা করে পুরুষ মনে করতে পারে যে, কেবল রোদন করা আর দুঃখ-যাতনা ভোগ করার জন্যই বুঝি নারীর জন্ম হয়েছে। কিন্তু আমরা ক্ষণিকের তরেও এ কথা বিস্মৃত হতে পারি না যে, তার এই নির্জন প্রীতিই এ বিশাল বিশ্ব-লোকের এক একটি রহস্য মানুষের নিকট উদ্ভাসিত করেছে। নারীর এ কুসুম-কোমল নাজুকতাই জীবনের কঠিন-কঠোর পর্যায় অতিক্রমণে পুরুষের সহায়তা করেছে।

সন্দেহ নেই যে, পুরুষ তার চেষ্টা-সাধনা বলে তমদ্দুনের ক্রমবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এ জন্য সে গর্ব বোধও করতে পারে। নিঃসন্দেহে সে এ দাবীও করতে পারে যে, বিদ্যুৎ আর বাষ্পকে অনুগত ও সেবকে পরিণত করে সে মানুষকে সত্যিকার অর্থে মানুষ হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। সে একথাও বলতে পারে যে, আমেরিকার মতো নতুন নতুন দেশ সেই আবিষ্কার করেছে, বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টায় সে প্রাণ দিয়েছে। শিল্পকলা এবং নানাবিধ আবিষ্কার-উদ্ভাবনে দুনিয়ায় সে আল্লাহর প্রতিনিধির তাৎপর্য প্রতিভাত করেছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নৈতিক বিশ্বই হচ্ছে সভ্যতা-তমুদ্দুনের বিকাশের উৎসমূল। একথাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নারী বিহনে তমদ্দুনের বিকাশ সম্ভব নয়। তাই এ ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না।

আমরা স্বীকার করি যে, রাজ্য শাসন ও রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি পুরুষই স্থাপন করেছে, আইন-বিধান তারাই রচনা করেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ সাধন, কার্যকারণ পরম্পরা তাদেরই কীর্তি। কিন্তু সাথে সাথে আমরা এ তত্ত্বটি ভুলে যাই:

لِلْمَرْأَةِ سَلْطَةٌ فِيْ نَظَرَاتِهَا اَكْثَرُ نُفُوْذًا مِنَ الْقَوَانِيْنِ وَدُمُوْعُهَا اَقْوىٰ مِنَ الشَّرْعِ.

নারীর দৃষ্টি এমন সব কাজ করে, যেখানে শাসক গোষ্ঠীর প্রভাব-প্রতাপ ম্লান হয়ে যায়। তার দৃষ্টি আইন-কানুনের চেয়েও বেশি ক্রিয়াশীল। আর নারীর চোখের পানি এতই শক্তিশালী যে, তার সামনে বিশ্বের যে কোন আইন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য।

এতটা গুরুত্ব নিয়ে দুনিয়ায় তার আগমন ঘটলেও এবং পুরুষ তীব্রভাবে তার প্রতি মুখাপেক্ষী হলেও প্রকৃতির বিস্ময়কর বিধান এই যে, এ সম্মানজনক শ্রেণীর অসম্মান করা হয় সবচেয়ে বেশি। করুণার পাত্র নারীর প্রতিই নির্যাতন চালানো হয়েছে সর্বাধিক।

প্রাচীন ইতিহাসে নারী

প্রাচীন ইতিহাসে নারীর এমন শোচনীয় দশা ছিল যে, তা পাঠ করার পর তাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলে ইতিহাসের পাতা থেকে তা মুছে ফেলা যায় না। নিশ্চিহ্ন করা যায় না মানবতার ললাট থেকে এই তিলক চিহ্ন। একদিন মানুষ যে কোলে লালিত হয়েছিল, তাকেই সে আহত করেছে, করেছে ক্ষতবিক্ষত। নারীর বুকের সাথে তার যে গোটা জীবনধারা ও কর্ম প্রবাহ সম্পৃক্ত ছিল, তাকেই করেছে সে আহত। ইতিহাসের বর্বর যুগের কথা বাদ দিয়ে তথাকথিত সভ্যতা গর্বিত যুগেও এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই; যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এমন কোন বর্বর আচরণ ছিল না, যা নারীর সাথে করা হয়নি। দুনিয়ায় এমন কোন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ছিল না, যা এ মযলুম শ্রেণীকে সইতে হয়নি। নারী সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষ যতটা একমত, অন্য কোন বিষয়ে তাদেরকে ততটা একমত দেখা যায় না। ইতিহাস পাঠ থেকে জানা যায় যে, গুটি কতেক বিরল ব্যতিক্রম বাদে প্রায় সকলেই জোর দিয়ে বলেছে যে, পুরুষের

তুলনায় নারীর প্রকৃতি অত্যন্ত দুর্বল, অতি নিকৃষ্ট। এমনকি নারীর আত্মা বলতে কিছু আছে কিনা, প্রাচীনকালে এটাও ছিল বিতর্কের বিষয়।

প্রাচীনকালে চীন, ভারত, রোম এবং গ্রীসকে সভ্যতার লালনভূমি বলে মনে করা হতো। সেখানে নারীর অবস্থা কি ছিল? কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে, সেখানে নারীর সংসর্গ থেকে বিরত থাকা শিক্ষা দেয়া হতো। এক দেবতা স্বয়ং জুপিটারকে জিজ্ঞেস করেছিল: বংশধারা বৃদ্ধির ব্যাপারে তুমি আমাদেরকে নারী বিমুখ করোনা। অন্যত্র নিবেদন করা হয় যে, সূর্যের নীচে পুরুষের উপর নারীরূপী এই আপদ কেন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে?

ইস্ত্রোমেকীর বর্ণনা অনুযায়ী নারী সম্পর্কে গ্রীকদের ধারণা ভালোভাবে প্রকাশ পায় তাদের এ উক্তি থেকে: আগুনে জ্বলে-পুড়ে গেলে বা সর্প দংশন করলে তার চিকিৎসা সম্ভব, কিন্তু নারীর অনিষ্টের চিকিৎসা সম্ভব নয়।

সক্রেটিস বলেন, নারীর চেয়ে বেশি বিপর্যয়ের জিনিস দুনিয়ায় আর কিছু নেই। এ হচ্ছে এমন এক বৃক্ষ, যা বাহ্যত: খুব সুন্দর-সুদর্শন, কিন্তু কোন পাখী এ বৃক্ষের ফল খেলে মারা যায়। প্লেটো বলেন, যেসব পুরুষ অত্যাচারী আর নীচ, পরিণাম জগতে তারাই নারী হয়ে যায়। নারী যে হীন-ঘৃণ্য ও নীচ, এ ধারণা কেবল বিজ্ঞ দার্শনিকদেরই ছিল না। তথাকথিত ধার্মিক শ্রেণীরও নারী সম্পর্কে এমন ধারণা ছিল। কেডিস বার্ণার বলেন, নারী হচ্ছে শয়তানের হাতিয়ার। ইউহেন্না দামেস্কী বলেন, নারী হচ্ছে কর এর কন্যা। শান্তি নিরাপত্তার শত্রু। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ:) তাঁর মাকে ধমক দিয়েছিলেন।

ইউরোপ বিশেষ করে মহান রোম ছিল খৃষ্টবাদের কেন্দ্রস্থল। শান্তি প্রচারকের দল সেখানে সর্বত্র হযরত ঈসা (আ:) এর বাণী প্রচার করে বেড়ায়। এদিক থেকে তার এত অধ:পতন হয়েছিল, যার কোন নযীর খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। সেখানে নারীর অবস্থা ক্রীতদাসীর চেয়েও নিকৃষ্ট ছিল। জন্তু-জানোয়ারের মত শাসন করা হতো তাদেরকে আর বিশ্বাস করা হতো যে, এদের সুখ-শান্তির কোন প্রয়োজন নেই। সামান্য অপরাধের জন্য তাদেরকে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন মানব-মনে যাদুমন্ত্রের বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীকেও অভিযুক্ত করা হয় এবং নারীই হয় যুলুম-নির্যাতনের শিকার।

১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠ আলেকজান্ডার, ১৫২০ খৃষ্টাব্দে দশম লুই এবং ১৫২২ খৃষ্টাব্দে ৬ষ্ঠ এডিন যে নিষ্ঠুর-নির্মমভাবে নারী-শিশুকে জবাই করেছে, তাতে ইউরোপের ইতিহাসের পাতা রক্তে রঞ্জিত হয়ে রয়েছে। এলিজাবেথ এবং প্রথম জেমস-এর শাসনকালে এ অপরাধে হাজার হাজার নারীকে পুড়িয়ে মারা এবং লং পরিয়ামেন্টের শাসনামলে শূলবিদ্ধ করা ইতিহাসের অতি পরিচিত ঘটনা।

স্কটল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ জেমস যখন ডেনমার্ককে বিয়ে করে দেশে ফিরে আসেন, তখন তাঁকে বলা হয় যে, পথে তুফান সৃষ্টি করার জন্য কতিপয় নারী একত্র হয়ে যাদু করেছে। এ অভিযোগে নারীদেরকে গ্রেফতার করা হয় এবং অপরাধ স্বীকার করার জন্য তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতন সইতে না পেরে অপরাধ স্বীকার করলে এদের সকলকেই জবাই করা হয়। এমনিভাবে নারীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য ইংল্যান্ডে এক বিশেষ ধরনের পার্লামেন্ট গঠন করে। এ পার্লামেন্টে নারীদের প্রতি নির্যাতনের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়। মোট কথা, নারীদের প্রতি নির্যাতনের জন্য গোটা ইউরোপই ছিল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ডঃ স্প্রিং এর উক্তি অনুযায়ী এর পরিণতি দাঁড়িয়েছিল এই যে, খৃস্টানরা ৯০ লক্ষ নারীকে জীবিত পুড়ে মেরেছে।

প্রাচীনকালে যেহেতু নারীকে মনে করা হতো সস্তা পণ্য, তাই তখন তার নৈতিক মান কত শোচনীয় ছিল তা সহজেই অনুমতি হয়। ইরানে স্ত্রী আর বোন এর মধ্যে কোন পার্থক্য অবশিষ্ট ছিল না। প্রাচ্যে খৃস্টানরা মাকে মা মনে করতো না, বোনকে মনে করতো না বোন। আর হিন্দুদের নিকট তো এক নারী অনেক ভাইয়ের বধূ হতে পারত। এমনিভাবে হিন্দুস্তানের পবিত্র বেদ নারীদের নৈতিক মান উন্নত করার কোন চেষ্টা করেনি, বুদ্ধও প্রণয়ন করেননি এ শ্রেণীর জন্য কোন এক আইন-বিধান।

আরবের পূণ্য ভূমি যেখানে শেষ নবীর আবির্ভাব হয়েছিল, সেখানেও নারীকে মনে করা হতো এক নিকৃষ্ট জীব বলে।

জনৈক আরব কবি বলেন :

اِنَّ النِّسَاءَ شَيَاطِيْنُ خُلِقْنَ لَنَا

نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيَاطِيْنِ

নারী সেতো শয়তান, সৃষ্টি হয়েছে মোদের তরে।
পানাহ্ চাই মোরা শয়তানের চক্রান্ত হতে খোদার দরবারে।

বোহ্রার রইসের কন্যার মৃত্যু হলে আবূ বকর খাওয়ারযেমী শোক প্রকাশ করেন নিম্নোক্ত ভাষায়:

তুমি তার পর্দা-পুশিদা এবং সদগুণাবলী স্মরণ করলে শোকের চেয়ে বিদায় জ্ঞাপনই তোমার জন্য অধিক সমীচীন হতো। কারণ, যে সব জিনিসি প্রকাশযোগ্য নয়, তা লোপ পাওয়াই উত্তম। আর কন্যাদের মরে যাওয়াই বড় ফযীলত। আমরা এমন এক যমানায় বাস করছি, কারো স্ত্রী যদি তার আগে মারা যায়, তবে তার নেয়ামত যেন পরিপূর্ণ হয়েছে। কন্যাকে যদি সে কবলে রাখতে পারে, তবে সে যেন জামাতার নিকট থেকে পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।

জনৈক আরব কবি বলেন:

تَهْوِى حَيَاتِىْ وَاَهْوِىْ مَوْتَهَا شَفَقًا
وَالْمَوْتُ اَكْرَمُ نِزَالٍ عَلَى الْحُرُمِ

সে চায় আমার জীবন, আমি চাই তার মৃত্যু অনুগ্রহে,
কারণ, নারীর জন্য মৃত্যু, সে তো প্রিয়তম মেহমান!

ইউরোপের গালভরা বুলি

অধুনা ইউরোপ সভ্যতা-তমদ্দুন, নৈতিক উন্নতি আর নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিরাট দাবীদার। কিন্তু আসল কথা, ইতিহাসের সাক্ষ্য এ দাবীর বিরোধী। এ যুগে নারীর মর্যাদার ঝাণ্ডা অতীব গুরুত্বের সাথে উপরে তুলে ধরা হলেও সভ্যতার ধারক-বাহকরা ভিন্ন কথাও বলছেন।

সন্দেহ নেই যে, দান্তে এবং পিটার্ক অনেকাংশে নারীর অধিকারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। শেক্সপীয়ার তাঁর নাট্যকে নারীর নৈতিক দিক উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ কবি কার্ণলকেও এ চিন্তাধারার সমর্থক বলে মনে হয়। মধ্যযুগে জার্মান কবি হেনরিক ফন মেস্নন নারী প্রশস্তিতে কিছু কবিতা লিখেছেন। কিন্তু প্রথমত: এ ধরনের ঘটনা একান্ত বিরল, তাও

আবার মূল্যহীন, গুরুত্বহীন। কারণ, এসব দ্বারা নারী বিনোদনের উপকরণের চেয়ে বেশি মর্যাদা পায়নি।

জনৈক ফরাসী লেখক তাঁর বইতে লিখেছেন:

স্বামীর সম্মান করা নারীর কর্তব্য। কারণ, সে যে তার প্রভু-মালিক। সব কাজে সে স্বামীর আনুগত্য করবে, তাঁর মন মতো নিজেকে গড়ে তুলবে। তার উচিৎ হচ্ছে স্বামীর পা ধুয়ে দেয়া, ঘর-সংসার রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের চেহারা কাউকে না দেখানো।

নারীদের প্রতি যারা যুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রথমেই যাদের নাম নিতে হয়, তারা হচ্ছে ভলটেয়ার, রুশো, মন্টেস্কু ও ডুরটেন। আর এরাই হচ্ছে ইউরোপে স্বাধীনতার ভিত রচনাকারী। কিন্তু কোমল শ্রেণী সম্পর্কে এদের উক্তি অত্যন্ত কঠোর। মন্টেস্কু বলেন, প্রকৃতি পুরুষকে শক্তি ও বুদ্ধি দিয়েছে, কিন্তু নারীকে দিয়েছে কেবল শোভা-সৌন্দর্য। নারীর উপর থেকে বহিরাবরণটি খুলে ফেলা হলে তার গুরুত্ব আর মর্যাদা কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

ডেডরো মনে করতেন যে, নারী হচ্ছে কেবল দৈহিক ভোগ-বিলাসের উপকরণ। এ ধারণাটি রুশো আরও ভদ্র ভাষায় বর্ণনা করছেন এভাবে: পুরুষকে আনন্দ দেয়ার জন্য নারীর জন্ম হয়েছে। কিন্তু পুরুষের কি উচিৎ নয় নারীর সন্তুষ্টির কারণ হওয়া? রুশো এর জবাব দিয়েছেন অনেকটা দুর্বল ভাষায়: এটা পুরুষের জন্য তেমন জরুরী কাজ নয়।

এ চিন্তাধারার কারণেই ফরাসী বিপ্লব কেবল পুরুষের অধিকারের নিরাপত্তা বিধান করেছে, নারীর প্রতি এর কোন কৃপা দৃষ্টি পড়েনি। তাই দেখা যায়, একবার নেপোলিয়নও হেলেনা দ্বীপে এ মত ব্যক্ত করেছেন, নারী হচ্ছে প্রকৃতির পক্ষ থেকে পুরুষের জন্য একটা দান, যেন সে সন্তান উৎপাদন করতে পারে। নারী আমাদের অধিকারভুক্ত; কিন্তু আমরা নারীর অধিকারভুক্ত নই। ফ্রান্সের একজন প্রসিদ্ধ কবি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন: প্রকৃতি নারীর মতো প্রাণীকে সৌকর্য নিশ্চিহ্ন করার জন্য কেন সৃষ্টি করেছে; এ জন্য আমি প্রকৃতির প্রতি রুষ্ট।

নারী বিদ্বেষে জার্মানদেরকে বেশ অগ্রসর মনে হয়। তারা এ বিদ্বেষের ভিত্তিও স্থাপন করেছেন প্রজ্ঞা আর দর্শনের মূলনীতির উপর। তাইতো আমরা দেখতে পাই, শোপেন হাওয়ার বলেন: পুরুষের প্রজ্ঞা-বিচক্ষণতা

পরিপূর্ণতা লাভ করে ২৮ বছর বয়সে, আর নারীর ১৮ বছরে। সেহেতু ১৮ বছর বয়সের পর তার প্রজ্ঞা ও অনুভূতিতে কোন উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হয় না, সারাটা জীবন সে খুকী হিসাবেই অতিবাহিত করে।

নিটশের ধারণায় নারী মুক্তির পর দুনিয়ায় যে বিপদ দেখা দিতে পারে, তিনি সে সম্পর্কে দুনিয়াবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে এই যে, নারীর মনে পুরুষের ভয় হ্রাস পাচ্ছে। অথচ তার জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে কেবল এই যে, সে পুরুষের অধিকারে থাকবে এবং সেবা করে যাবে।

নারী সম্পর্কে ভেঞ্জেজ এর ধারণা হচ্ছে সবচেয়ে বিস্ময়কর। তিনি নারী সম্পর্কে একটা গ্রন্থ রচনা করে আত্মহত্যা করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল মাত্র ২৪ বছর। কিন্তু বইটি তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। প্রাচীনকাল থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত নারীর প্রতি যেসব দোষারোপ করা হয়েছে, এ গ্রন্থে তিনি সে সব সন্নিবেশ করেছেন। আর এসব উপস্থাপন করেছেন জ্ঞান এবং দর্শনের আবরণে। দুনিয়ায় নারীর মতো জীবও কেন সৃষ্টি করা হয়েছে- এ দুঃখে তিনি দুনিয়ার প্রতি রুষ্ট ছিলেন। আত্মহত্যা করে তিনি এ রুষ্টতার প্রমাণ দিয়েছেন।

ভেঞ্জেজ এর দর্শনের সার সংক্ষেপ এই যে, মাতৃগর্ভে সন্তান দু বিপরীত শ্রেণীতে বিভক্ত হয় না। অর্থাৎ তাঁর মতে এমন কোন পুরুষ নেই, যার মধ্যে কেবল পুরুষ সুলভ গুণ পাওয়া যায়; আর এমন কোন নারীও নেই, যার মধ্যে নিরেট নারী সূলভ বৈশিষ্ট্যই বর্তমান থাকে। সুতরাং নারী হচ্ছে সে, যার মধ্যে নারী সুলভ গুণাবলী পুরুষ সুলভ গুণাবলীর চেয়ে প্রবল। আর যার মধ্যে উভয় প্রকার গুণাবলী সমান সমান বর্তমান থাকে, সে হচ্ছে হিজড়া।

তার এ মূলনীতি অনুযায়ী ভালোবাসা হচ্ছে উভয় শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ। সর্বোত্তম ভালোবাসা হচ্ছে তাই, যাতে উভয় শ্রেণীর পুরুষ সুলভ ও নারী সুলভ গুণাবলীর ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, কারো মধ্যে যদি শতকরা ৮০ ভাগ পুরুষ সুলভ ও শতকরা ২০ ভাগ নারী-সুলভ স্বভাব বর্তমান থাকে, তাকে এমন নারী খুঁজতে হবে, যার মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ পুরুষ সুলভ ও ৮০ ভাগ নারী সুলভ গুণাবলী পাওয়া যায়। তেমনভিবে যে নারীর মধ্যে শতকরা ৩০ বা ৪০ ভাগ নারী সুলভ

গুণাবলী রয়েছে, তাকে এমন পুরুষ খুঁজতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে শতকরা ৭০ বা ৬০ ভাগ পুরুষ সুলভ গুণাবলী। এমন পুরুষই সে নারীর জন্য উপযুক্ত। ভেঞ্জেজ এর মতে দুর্বল শ্রেণী (নারী) আর সবল শ্রেণী (পুরুষ) এর মধ্যে আকর্ষণও একটা বৈজ্ঞানিক নিয়মের অধীন। এ নিয়মকে বলা যায় পূর্ণতার নিয়ম। তার মতে কর্তৃত্ব, পূর্ণতা ও আধিপত্য পুরুষেরই প্রাপ্য। বিশ্বে এ পর্যন্ত যত পূর্ণতার অধিকারী নারী জন্ম নিয়েছে, তারা পূর্ণতা লাভ করেছে এ জন্য যে তাদের মধ্যে পুরুষ সুলভ গুণাবলী বেশি ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তার মতে বিরাট পান্ডিত্যের অধিকারী নারীও মধ্যম ধরনের গুণের অধিকারী পুরুষের চেয়ে বেশি অগ্রসর হতে পারে না। তার মতে জৈবিক এবং দৈহিক বৃত্তিই কেবল নারী জীবনের বিস্ময়কর কীর্তি। এ সবের উর্ধ্বে উঠা পুরুষের চেয়ে বেশি অগ্রসর হতে পারে না। তার মতে জৈবিক এবং দৈহিক বৃত্তিই কেবল নারী জীবনের বিস্ময়কর কীর্তি। এ সবের উর্ধ্বে উঠা পুরুষের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু তা করা নারীর পক্ষে অসম্ভব। তাই স্বভাবতঃই পুরুষের অধীনে জীবন যাপনের জন্যই নারীর জন্ম হয়েছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, নারীর উন্নতি-অগ্রগতিকে পুরুষ অত্যন্ত ভীতির চোখে দেখে। অথচ মহান আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এবং গ্যালিলিওর কীর্তি তাদেরকে বিস্মিত করেনা। কিন্তু ক্লিওপেট্রা, জোয়ান অফ আর্ক এবং কেথরাইনের কীর্তি-কাহিনী শুনে তাদের বিস্ময়ের আর অবধি থাকেনা। নারীর প্রতি পুরুষের কু-ধারণা যেহেতু মানুষের প্রকৃতি হিসাবেই চলে এসেছে, তাই তারা নারীর উন্নতি অগ্রগতিকে প্রকৃতি বিরুদ্ধ এমনকি প্রকৃতির ভুল বলে মনে করে। পুরুষের মতে নারীর কর্তৃত্ব চলে কেবল আবেগ-অনুভূতির জগতে। মেধা-প্রজ্ঞা, চিন্তা-বিবেচনা, পরিকল্পনা ও পরিচালনায় তার ভূমিকা খুবই নগণ্য। কিন্তু সত্য কথা ও বাস্তব ঘটনা এই যে, চিন্তা এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের চেয়ে পেছনে থাকতে পারে না।

সন্দেহ নেই যে, পুরুষ বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানে নারীর চেয়ে অনেক বেশী উন্নতি সাধন করেছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, নারী-পুরুষের মানসিক শক্তিতে প্রকৃতি কোন পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। বরং প্রাচীনকালে থেকে নারীর প্রতি যে যুলুম চলে আসছে, এ হচ্ছে তারই পরিণতি। এ দাবীর সপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে এই যে, যখনই কোন নারী তরক্কী করার সুযোগ

পেয়েছে, সমকালীন সাহিত্যিক-সামাজিক পরিস্থিতি তার সহায়ক হয়েছে তখন সে কোন অংশেই পুরুষের চেয়ে পেছনে ছিল না।

নারী জীবনে ক্রমবিকাশ

বিগত কালে বিশেষ করে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নারী জীবনে অস্বাভাবিক পরিব্বর্তন সূচিত হতে থাকে। সে কল-কারখানায় কাজ করে, ডাক্তারী শিক্ষা করে, ওকালতী করে, বড় বড় পদ-মর্যাদা লাভ করে এবং কার্য দ্বারা সে একথা প্রমাণ করে যে, পুরুষরা যে সব কাজকে কেবল নিজেদের জন্যই নির্দিষ্ট বলে মনে করতো, নারীও তা সূচারুরূপে আঞ্জাম দিতে সক্ষম। কিন্তু বর্তমান সভ্যতা-জাগরণ আর অগ্রগতির যুগেও পুরুষ মনে করে নারীর বর্তমান উন্নতি-অগ্রগতি নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার মাত্র। অনতিবিলম্বে সে স্বস্থানে ফিরে যাবে। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, মানব জাতির সামাজিক গতি এবং সুষ্ঠু বিধান সত্যকে গোপন করে রাখতে দেবেনা। একথা তাদেরকে মানতে হবে যে, মানুষের যাবতীয় উন্নতি-অগ্রগতিতে নারীও পুরুষের পাশাপাশি অগ্রসর হতে পারে। কেবল পুরুসের দাসী আর সেবিকা হয়ে থাকার জন্যই দুনিয়ায় তাদের আগমন হয়নি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে অধুনা যেসব চিন্তা-গবেষণা চালানো হচ্ছে, তাতে প্রমাণিত হয় যে, আবিষ্কার-উদ্ভাবনার পূর্ণ যোগ্যতা বর্তমান রয়েছে নারীর মধ্যে। সভ্যতার ধারাও সে পরিবর্তন করতে পারে। বেতার যন্ত্র একজন নারীই আবিষ্কার করেন, যার নাম অডেনা। সুতা কাটার শিল্প চীন সম্রাজ্ঞীর আবিষ্কার। খৃষ্টপূর্ব ২ হাজার ৪ সালে এটা উদ্ভাবিত হয় চীন দেশে। গাড়ীতে অস্ত্র সজ্জিত করার কৌশলও একজন নারীর মস্তিষ্ক প্রসূত। চিত্রশিল্প সম্পর্কেও বলা হয়ে থাকে যে, জনৈক গ্রীক নারী এর আবিষ্কারক। লাঙ্গল চালনার পদ্ধতিও একজন নারীর উদ্ভাবনী শক্তির ফল। নৃতত্ত্ব থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাচীনকালে পুরুষ যখন শিকার আর লুটতরাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করতো, তখনো নারী গৃহে বসে যন্ত্রপাতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতো, যাকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে মানুষের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

মানব জাতির ইতিহাসকে কেবল পুরুষের ইতিহাস হিসেবে পাঠ করা উচিৎ নয়। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কেবল এজন্যই পাঠ করা উচিৎ নয় যে, তা নিছক পুরুষের মানসিক শক্তির ফলশ্রুতি। এ সত্যকে সামনে রেখেই ইতিহাস পাঠ করতে হবে যে, পুরুষের সকল কর্মকান্ডে নারীও সমান

অংশীদার। প্রাগৈতিহাসীক যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা দ্বারা জানা যায় যে, নারীই সর্বপ্রথম চাষাবাদ শুরু করে। ভূমিকে পরিষ্কার করে নারীই তা চাষাবাদযোগ্য করে তুলেছে। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, আদীকালে পুরুষ যখন জন্তু-জানোয়ার শিকার করে চামড়া নিয়ে আসতো, নারীই তা দিয়ে পোশাক প্রস্তুত করতো। নারীই তো গাছের পাতা দিয়ে ঘর তৈয়ার করে। সে-ই তো পশমী কাপড় ধোলাই করে; খাদ্য তৈয়ার করে এবং মাটির পাত্র তৈরী করে। নারীই তো গ্রামে-গঞ্জে হাট-বাজার স্থাপন করে। এসব বাজারে নারীরই কর্তৃত্ব ছিল। তাই এসব বাজারের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে বিশ্ব সভ্যতার পত্তন হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান আর আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে চিন্তা করলেও দেখা যাবে যে, এসব ক্ষেত্রে নারী উজ্জ্বল অবদান রেখেছে। অবশ্য পারিবারিক ঝামেলা আর গৃহের কর্তব্যের কারণে জ্ঞান লাভের কোন সুযোগই তার হতো না। পুরুষ তাকে এতটা স্বাধীনতাও দেয়নি, যাতে সে সহজে জ্ঞান লাভ করতে পারে। এত সবের পরও সে যা কিছু করেছে, তা মোটেই খাটো করে দেখা যায় না। সোভিয়া জার্মান এর কথা কে ভুলতে পারে, অংক শাস্ত্রে যিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জ্যোতির্বিদ্যায় নারীদের আবিষ্কারের কথা কে বিস্মৃত হতে পারে? যে যুগে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে পুরুষেরও তেমন অবগতি ছিল না, সে যুগে আকাশে নক্ষত্রের অবস্থান দেখে মিসরীয় নারীদের ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং অগলা ভেন্স নামে জনৈকা নারীর চন্দ্র গ্রহণ এবং সূর্য গ্রহণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কোন মামুলী ব্যাপার ছিল না। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ নারী দার্শনিক হিপাথিয়ার বৈজ্ঞানিক কীর্তিগাথায় ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। ইনি ভারোত্তলন যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং ভারবিদ্যা সম্পর্কে একটা গ্রন্থ রচনা করে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করেন। জার্মানের ইতিহাস ম্যারী কুনিসিয়া, মার্গারেট ক্রাশ এবং ম্যাডাম রেমকরকে কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারে না। এদের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী এবং আবিস্ক্রিয়ার কথা সকলে স্বীকার করতে বাধ্য। এমনিভাবে ফ্রান্সের জন উডমী, ম্যাডাম উডশামলী (যিনি নিউটনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুবাদ করে তাতে মূল্যবান টীকা সংযোজন করেছেন) ম্যাড লেপোট, ম্যাডম লা লভ, ম্যাডাম ডুব্যারী, ম্যাডাম ভেলা রুশো ও ম্যাডাম ক্লিম্যান্স (যিনি ডারউইনের রচনাবলী অনুবাদ করেছেন) বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ইতিহাসে এসব নারী উজ্জ্বল স্থান

অধিকার করে আছেন। নক্ষত্রপুঞ্জের গঠন প্রণালী সম্পর্কে যিনি সর্ব প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি হচ্ছেন স্যার উইলিয়াম হেজেস এর স্ত্রী।

আবিস্কার-উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে মাদাম কুরীকে কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না। ইনি রেডিয়াম আবিস্কার করেন। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এমন কোন যুগ ছিল না, যখন নারীরা নীতিশাস্ত্র এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি। থিওডোর সম্রাজ্ঞী, জানুবিয়া সম্রাজ্ঞী ও স্পেন সম্রাজ্ঞী ইসাবেলা, রুশ সম্রাজ্ঞী লুই, ম্যাডাম রোল্যান্ড (ফ্রান্সের মুক্তি সংগ্রামে যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন) এবং লিউসী নেটাম (যিনি ছিলেন দাস এবং নারী মুক্তির বিরাট সমর্থক) প্রমুখ এমন অনেক নারী আছেন, যাদের অবদানের কথা দুনিয়া ভুলতে পারে না। আরবের পুণ্য ভূমিতে যে সব জ্ঞানী-গুণী এবং সাহিত্যসেবী মহিলার জন্ম হয়েছে, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও শৌর্য-বীর্যের যেসব দৃষ্টান্ত আরবের মরুভূমিতে নারীরা স্থাপন করেছে, তাও কারো কাছে অজানা নয়।

মানব জীবনের এত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া সত্ত্বেও নারী ছিল উপেক্ষিতা অবহেলিতা। প্রাচীনকালের মতো আধুনিক কালেও সে রয়েছে গুরুত্বহীনা। তার অবদানের কথা খুব কমই স্মরণ করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এখন আমাদের দেখা উচিৎ ইসলাম নারীকে কতটুকু মর্যাদা দিয়েছে, মানবতার কোন স্তরে তাকে এনে দাঁড় করিয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, আধুনিক সভ্যতা নারীকে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করার সুযোগ এনে দিয়েছে। বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজকে এর প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও দৃষ্টিগোচর হবে যে, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর স্থান অনেক নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। এজন্য কেউ কেউ বলেন, নারীর জন্য আধুনিক শিক্ষা এবং স্বাধীনতা কল্যাণকর হতে পারে না। এ ধরনের মতকে আমরা সঠিক বলে মনে করি না। কারণ, নারীর লালন-পালন আর চরিত্র গঠনের প্রতি কখনো সত্যিকার গুরুত্বই দেয়া হয়নি। ফলে প্রাচীনকাল থেকে তার যে নৈতিক অধঃপতন চলে আসছে, তা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

ইসলামে নারীর উঁচু স্থান

ইসলাম এবং ইসলামের নবী নারী জাতির জন্য যে আদর্শ স্থাপন করেছেন, তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় যে নীতি অবলম্বন করেছেন, নিশ্চিতভাবে তা ছিল

নারীর পরিপূর্ণ উন্নতির নিশ্চয়তা বিধায়ক। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব ভূমিতে নারীদের সাথে জঘন্য আচরণ করা হতো। ইসলামের শিক্ষার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নারীত্বের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে, আজও যার নযীর খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। ইসলাম একদিকে–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

প্রত্যেক নর-নারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয, বলে পুরুষের পাশাপাশি নারীর জন্যও শিক্ষা ও অগ্রগতির দ্বার উন্মুক্ত করেছে। অপরদিকে তাদেরকে নৈতিক শিক্ষা দিয়ে ইসলাম একথাও বলে দিয়েছে যে, তাদের অবস্থা হচ্ছে পানপাত্রের মতো, যা সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। ইসলাম কিভাবে নারীর মর্যাদা বুলন্দ করেছে, কিভাবে তাদের সংস্কার-সংশোধন করেছে, এমন অনেক ঘটনা এ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

বিশ্ব জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতেই খোদায়ী নূরের প্রকাশ ঘটলেও রুহানিয়াত বা আধ্যাত্মিকতা গ্রহণ করার জন্য নারীর মতো উপযুক্ত অন্য কোন সৃষ্টি নেই। ইসলাম সর্ব প্রথম আধ্যাত্মিকতার প্রতি নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ কারণে মহিলা সাহাবীদের জীবনে তাকওয়া এবং ইবাদাতের এক বিশেষ রং পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের জন্য তারা কতো বড় কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং ধর্মের জন্য তারা প্রাচীনতম সম্পর্ক ছিন্ন করতেও কুণ্ঠিত হননি। হযরত সুমাইয়্যা ইসলাম গ্রহণ করলে কাফেররা তাঁকে কঠোর শাস্তি দেয়া শুরু করে। উত্তপ্ত বালুর মধ্যে তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তিনি তখন ছটফট করতেন। একদিন এ অবস্থায় রাসূলে খোদা তাঁকে দেখতে পেয়ে বলেন: সুমাইয়্যা! ঘাবড়াবেনা, ধৈর্য ধারণ কর জান্নাত তোমার ঠিকানা। এটা এমন কঠোর শাস্তি ছিল যে, তাঁর পরিবর্তে কোন পুরুষ হলে হয়তো ইসলাম ত্যাগ করতো। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত অটল ছিলেন। কোন শাস্তিই তাঁকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ইসলাম নারীদের মধ্যে এমন দৃঢ়তা সৃষ্টি করেছিল, যাতে তাদের সন্তানরাও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে নতুন নতুন জাতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। হযরত ওমর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর বোনের উপর যে সব নির্যাতন চালান তাও কারো অজানা নয়। হোদাইবিয়ার সন্ধির পর অনেক মহিলা সাহাবীর স্বামী ত্যাগ করার ঘটনাও ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

নামায-রোযা-হজ্জ্ব-যাকাত-জিহাদ ইত্যাদি ইবাদাত যথাযথভাবে আদায় করা খুবই কঠিন। কিন্তু ইসলাম এসব ক্ষেত্রে নারীদের মধ্যেও এমন স্পিরিট সৃষ্টি করেছে, যা অন্যান্য ধর্মে পুরুষদের মধ্যে দেখা যায় না, তা সোনায় সোহাগার কাজ করেছে। ওহোদ যুদ্ধে হযরত ছফিয়া তাঁর ভাই সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত হামযার কাফনের জন্য দু'প্রস্থ কাপড় নিয়ে আসেন। তিনি দেখতে পান, তাঁর ভাইয়ের লাশের পাশে অপর এক আনছারের লাশও পড়ে আছে। আনছারকে বাদ দিয়ে আপন ভাইকে দুপ্রস্থ কাপড়ে দাফন করবেন, এটা তার কাছে অসহ্য। তাই তিনি আনছারকে এক প্রস্থ কাপড় দিয়ে অপর প্রস্থ কাপড়ে ভাইকে দাফন করার ব্যবস্থা করেন।

একবার রাসূলে খোদা ঈদের খোতবায় ছদকা-খয়রাতের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঈদের এ জামায়াতে মহিলারাও উপস্থিত ছিলেন। তারা এজন্য কানের বালি আর হাতের আংটিও দান করে দেন। হযরত আসমা'র কাছে একটা দাসী ছাড়া দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না। তিনি দাসীটি বিক্রি করে সমুদয় টাকা ছদকা করে দেন। ত্যাগ ও কোরবানীর এহেন প্রেরণায় সকল মহিলা সাহাবীই উদ্দীপ্ত ছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে মহিলারা যেসব ভূমিকা পালন করেছেন, এ গ্রন্থের স্থানে স্থানে তাও দেখতে পাবেন পাঠক। এটাও জানতে পারবেন যে, সেকালের আরব নারীরা কী ছিলেন।

ইসলামে ইবাদতের পরই মোয়ামালাতের স্থান। এ ক্ষেত্রেও মহিলা সাহাবীরা পুরুষের চেয়ে কম ছিলেন না মোটেই। নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে আত্মত্যাগের স্থান অনেক উর্ধ্বে। এ ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থা ছিল এই যে, হযরত আয়েশা (রা) এক দিন রোযা রেখেছিলেন। ঘরে ছিল একটি মাত্র রুটি। এক ভিখারী এসে হাঁক দিলে রুটিটি ভিক্ষুককে দিয়ে দেয়ার জন্য দাসীকে বলেন। দাসী জিজ্ঞেস করলো, ইফতার করবেন কি দিয়ে? তিনি বললেন, তুমি দিয়ে দাও, পরে দেখা যাবে। হযরত সালমার দানশীলতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে আছে। তিনি আগামী দিনের জন্য একটা পয়সাও নিজের কাছে রাখতেন না। প্রতিদিন সব কিছুই ছদকা করে দিতেন। নবীজীর স্ত্রীদের মধ্যে হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের অবস্থা ছিল এই যে, তিনি নিজ হাতে চামড়া পাকাতেন আর এ পথে অর্জিত সমুদয় অর্থ গরীব-মিসকীনদের মধ্যে ছদকা করে দিতেন।

হিংসা-বিদ্বেষ আর প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা নারীর স্বভাব বলা যায়। বিশেষ করে ব্যাপারটা যখন হয় প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার। কিন্তু ইসলামের শিক্ষার ফলে তাদের মন থেকে এটাও দূরীভূত হয়েছিল। হযরত যয়নব সম্পর্কে হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি তো তাঁর সম্পর্কে ভালোই জানি। তাঁর মধ্যে মন্দের কোন গন্ধও নেই। ইনছাফপ্রিয়তার অবস্থা এই ছিল যে, মু'আবিয়া ইবনে খাদীজ হযরত আয়েশার ভাই মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকরকে হত্যা করে। কিন্তু মু'আবিয়া সম্পর্কে হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তাঁর সম্পর্কে ভালো বলেন। কারণ, মানুষের সাথে তাঁর আচরণ ছিল ভালো। আত্মীয়তা এবং সহানুভূতির চিন্তা এত তীব্র ছিল যে, খাদেম-সেবকের সাথে কোন প্রকার কঠোরতাকে তারা মোটেই বৈধ মনে করতেন না। একবার রাতের বেলা আবদুল মালেক তার খাদেমকে ডাকেন। তার আসতে দেরী হলে তিনি তাকে অভিশাপ দেন। হযরত উম্মে দারদা তখন তাঁর মহলে ছিলেন। সকালে তিনি আব্দুল মালেককে বললেন, রাতে তুমি খাদেমকে অভিশাপ দিয়েছ। অথচ রাসূলে খোদা কঠোরভাবে এটা বারণ করেছেন।

এ গ্রন্থের স্থানে স্থানে মহিলা সাহাবীদের জ্ঞানের খেদমত আর কীর্তি পরিলক্ষিত হবে। নবীজীর ফয়েয সেকালের মহিলাদের মধ্যে কেমন যোগ্যতা ও সূক্ষ্মদর্শীতা সৃষ্টি করেছিল, তাও পরিদৃষ্ট হবে। এ ব্যাপারে হযরত আয়েশার অবদান সবচেয়ে বেশি। তাঁর চিন্তাধারা কতটা সুস্থ-সঠিক ছিল, এর অনেক প্রমাণ অনেক ঘটনায় পাওয়া যাবে। এসব ঘটনা থেকে এটা জানা যাবে যে, তাঁর প্রমাণ উপস্থাপন এবং যুক্তি পেশ কতটা দাঁতভাঙ্গা এবং সময়োপযোগী ছিল। ছাফা-মারওয়া তাওয়াফ সম্পর্কে কালামে পাকে বলা হয়েছে:

انَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ – فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ

عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا. (البقرة : ١٥٨)

–নিশ্চয়ই ছাফা-মারওয়া আল্লাহ্‌র অন্যতম নিদর্শন। সুতরাং যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ্ব বা ওমরা করবে, এ পাহাড়দ্বয় প্রদক্ষিণ করলে তাতে কোন দোষ নেই।

হযরত ওরওয়া হযরত আয়েশাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে, কালামে মজীদের বর্ণনা ধারা থেকে মনে হয় যে, ছাফা-মারওয়া তাওয়াফ করায় কোন দোষ নেই। অর্থাৎ এটা না করলেও কোন দোষ নেই। হযরত আয়েশা বললেন যে অর্থ করেছো আয়াতের, তাই হলে এভাবে বলা হতো, فَلَاجُنَاحَ اَنْ لَّايَطَّوَّبَ بِهِمَا তা প্রদক্ষিণ না করলেও কোন দোষ নেই। আয়াতটি যেহেতু নাযিল হয়েছে আওস-খাযরাজ গোত্র সম্পর্কে, ইসলামের পূর্বে যারা মানাত মূর্তির পূজা করতো। ছাফা-মারওয়া প্রদক্ষিণ করাকে খারাপ মনে করতো। এ কারণে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন যে, সেখানে প্রদক্ষিণ করায় কোন দোষ নেই।

কুরআন মজীদ সম্পর্কে হযরত আয়েশার জ্ঞান ও পান্ডিত্য প্রসঙ্গে অপর ঘটনা হচ্ছে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত–حَتَّى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ সম্পর্কে পাঠক মূল গ্রন্থে বিস্তারিত জানতে পারবেন । এছাড়া আরও অনেক ঘটনা দ্বারা হযরত আয়েশার প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং দ্বীনের ব্যাপারে তাঁর সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে।

হাদীস শাস্ত্রে দেরায়াত বা যাচাই-বাছাইর স্থান অতি উচ্চে। সত্যিকার অর্থে হযরত আয়েশাকেই এর স্থপতি বলতে হয়। কারণ, তিনিই সর্বপ্রথম এ নীতি প্রয়োগ করেছেন। স্বজনদের ক্রন্দনের ফলে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার হাদীস তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি হাদীসটির বিশুদ্ধতা অস্বীকার করেন। কারণ, দেরায়াত অনুযায়ী তা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি প্রমাণ হিসেবে কালাম মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত উপস্থাপন করেন: وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى (الانعام : ١٦٤) -কোন ভার বহনকারী অন্যের ভার বহন করেনা।

এমনিভাবে শবে মেরাজে রাসূলে খোদা আল্লাহ্কে দেখেছেন, এ বর্ণনা তাঁর সামনে করা হলে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এ বর্ণনা করেছে, সে মিথ্যা বলেছে। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা বলেন– لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ - কোন দৃষ্টি তাঁকে পায় না।

আত্মীয়তার হক আদায় করা এত কঠিন কাজ যে, বড় বড় দ্বীনদার এবং সংযত ব্যক্তিরাও এ ব্যাপারে হিমশিম খেয়ে যান। কিন্তু মহিলা সাহাবীরা এ

ব্যাপারে তাদের অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন পুরোপুরি।

আর পারস্পরিক সহানুভূতির এ অবস্থা যে, কোন মহিলার পায়ে সামান্য কাঁটা বিধলেও মহল্লার সকল মহিলারা নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা নিযে তার সাহায্যে হাযির হতো।

সত্যিকার নারীত্ব

ফল কথা এই যে, ইসলাম নারীর নৈতিক চরিত্র উন্নত করে তাকে সম্মান করা পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে। এটা এমন এক অপূর্ণতা, যা অতীত জাতির পথ প্রদর্শকরা উপলব্ধি করতে পারেনি। একজন নারী তরক্কী করে কর্মক্ষেত্রে পুরুসের চেয়েও বেশি শ্রম-সাধনা করতে পারে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবিস্কার-উদ্ভাবনা দ্বারা সে অস্বাভাবিক সংযোজন করতে পারে, এটা মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু নারীর চরিত্র যদি উন্নত না হয়, সে যদি তার আসল নারীত্বই হারিয়ে বসে, তবে তার সব উন্নতিই অর্থহীন। নারী তখন এমন এক আযাবে পর্যবসিত হয়, যার ফলে পুরুষের জন্য দুনিয়াও জাহান্নামে পরিণত হয়।

আজ আমরা পাশ্চাত্যের সমাজ-সংস্কৃতি আর নারীদের উন্নতি-অগ্রগতি দেখে ঈর্ষান্বিত হই। নিশ্চিতই এসব ঈর্ষাযোগ্য। যদি সঙ্গে সঙ্গে তাদের চরিত্রও পূত-পবিত্র, উন্নত ও নিষ্কলুষ হয়; চরিত্রও হয় চেহারার মতই সুদর্শন। এমনটি না হয়ে থাকলে আমাদের চেষ্টা করা উচিত তাদের জ্ঞান স্পৃহা আর তরক্কীর সাথে সাথে ইসলামের নৈতিক শিক্ষায় তাদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। এ ব্যাপারে মহিলা সাহাবীরা আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ হতে পারেন।

এ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখেই বর্তমান গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। অহেতুক কল্প-কাহিনী বাদ দিয়ে এমন সব গ্রন্থ তাদের সামনে উপস্থাপন করা উচিত, যাতে তারা সত্যিকারভাবে নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে এবং তদনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

নিয়ায ফতেহপুরী

২১ জুন ১৯২৩

উম্মাহাতুল মু'মেনীন

বা

নবীজীর সহধর্ম্মিণীগণ

মহিলা সাহাবী

১

উম্মুল মু'মেনীন হযরত খাদীজা (রা)

উম্মুল মু'মেনীন হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন আরবের সবচেয়ে শরীফ বংশ কোরাইশ এবং কোরাইশের সর্ব শ্রেষ্ঠ খান্দানের পূত-পবিত্র সন্তান। তাঁর নাম ছিল খাদিজা আর উপাধী ছিল তাহেরা-পূণ্যবর্তী নারী। তাঁর পিতা খুওয়ালিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল ওয্যা ইবনে কুসাই ইবনে মুররাহ এবং নানা ছিলেন আসাম ইবনে হারাম ইবনে ওয়াহা ইবনে হাজার ইবনে আব্দ ইবনে মাহীছ ইবনে আমের। অর্থাৎ কয়েক পুরুষ ওপরে গিয়ে তাঁর পিতৃকূল এবং মাতৃকূল এক ছিল।[১] হযরত খাদীজার পরদাদা কুসাই ছিলেন রাসূলে খোদা (সা:)-এর বড় দাদা। এদিক থেকে হযরত খাদীজা এবং রাসূলাল্লাহ্ (সা:) দাদা ছিলেন এক।

বিবাহ

প্রথমে হযরত খাদীজার সাথে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের বিয়ের প্রস্তাব আসে, কিন্তু কোন কারণে বিয়ে হয়নি। এরপর আবূ হালার সাথে-যার আসল নাম ছিল হিন্দ ইবনে নাব্বাশ-তাঁর বিয়ে হয়। আবূ হালার পিতা তাঁর বংশের মধ্যে অতি ভদ্র বলে স্বীকৃত ছিলেন। পুত্র আবূ হালাকে নিয়ে তিনি মক্কা শরীফ এসে বসবাস করেন।[২] আবূ হালা'র মৃত্যুর পর আতীক ইবনে আবদে এবং তাঁরও মৃত্যুর পর আতীক ইবনে আবেদ এবং তাঁরও মৃত্যুর পর চাচাত ভাই ছাইফী ইবনে উমায়্যার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু কিছু দিন পর ছাইফীরও ইনতিকাল হলে তিনি তৃতীয়বার বিধবা হন।

ব্যবসা

তৎকালে সিরিয়ার সাথে কোরাইশদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল সবচেয়ে বেশি। সেখানেই হযরত খাদীজার পণ্য বেশি বিক্রী হতো।[৩] হযরত খাদীজা

কর্মচারী দ্বারাই বাণিজ্যিক কাজ চালাতেন। আল্লাহ্ তাঁকে অগাধ ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। তাঁর ধন-সম্পদের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু একের পর এক পতি বিয়োগের ফলে তাঁর মন বিষণ্ন হয়ে ওঠে।

রাসূলে খোদা (সা:) এর বয়স যখন পঁচিশ বছর, তখন তাঁর পুত-পবিত্র চরিত্রের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আরবের দিকে দিকে তিনি 'আল-আমীন' বা একান্ত বিশ্বাসী বলে খ্যাত ছিলেন। হযরত খাদীজার দৃষ্টি পূর্ব থেকেই তাঁর মতো একজন পূত-পবিত্র ব্যক্তিত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর কথা শুনে তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আকৃষ্ট হন। তিনি রাসূলে খোদার খেদমতে এ মর্তে বার্তা প্রেরণ করেন যে, আপনি সিরিয়ায় আমার পণ্য নিয়ে যেতে রাজী হলে আমি ভৃত্য মাইসারাকে আপনার সহগামী করবো। এজন্য অন্যদেরকে যা বিনিময় দেই, আপনাকে তার দ্বিগুণ দেবো।[৪]

এদিকে রাসূলে খোদার পৃষ্ঠপোষক চাচা আবূ তালেবের মাধ্যমে তিনি হযরত খাদীজার ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হন। তাই তিনি ইবনো দ্বিধায় হযরত খাদীজার এ প্রস্তাবে সম্মত হন।[৫] পণ্যদ্রব্য নিয়ে তিনি বসরা রওয়ানা হন। তিনি যে সব পণ্য নিয়ে যান, তার সবই বিক্রয় হয়ে যায়। মক্কায় ফিরে মুনাফা হিসেব করে দেখেন, আগের চেয়ে দ্বিগুণ ব্যবসা হয়েছে। এতে হযরত খাদীজা অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাঁকে প্রতিশ্রুত পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি পারিশ্রমিক দান করেন।[৬]

মহানবীর সাথে বিবাহ

এ সময় হযরত খাদীজা মহানবী (সা:) সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারেন। তাঁর কাছে মহানবীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি আরবের প্রথা অনুযায়ী কোন উকীল ছাড়াই তিনি মহানবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তীব্র আকাঙ্খা মনে মনে পোষণ করেন। হযরত খাদীজা প্রথমে তাঁর খাদেমা নাফীসার মাধ্যমে পয়গাম পাঠান। মহানবীর পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়ে তাঁর চাচা আমর ইবনে আসাদকে এজন্য ডেকে পাঠান।[৭]

হযরত খাদীজার পিতা 'হরবুল ফুজজার; এ নিহত হন। এ কারণে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন চাচা আমর ইবনে আসাদ। অবশেষে হযরত খাদীজার গৃহে সমবেত হন। আবূ তালেব বিয়ের খোতবা পড়ান। পঁচিশ রোপ্য মুদ্রা

(দিরহাম) মোহর ধার্য হয়। এসময় হযরত খাদীজার বয়স ছিল ৪০ বৎসর।

ইসলাম গ্রহণ

সকল জীবন চরিতকার এ ব্যাপারে একমত যে, নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথমে রাসূলাল্লাহ্‌র ওপর ওহী নাযিল হলে তিনি অনেকটা শংকিত হয়ে পড়েন এবং ঘরে ফিরে এসে হযরত খাদীজার নিকট তা প্রকাশ করেন। হযরত খাদীজা শুনে বললেন, আপনি সত্য কথা বলেন, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখেন, আমানত রক্ষা করেন, অতিথিদের সেবা করেন, বিপদাপদে মানুষের সাহায্য করেন। আল্লাহ্ আপনাকে একা ছাড়বেন না। অতঃপর তাঁকে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে নিয়ে যান। ওয়ারাকা ছিলেন সে সময়ের মশহুর খৃস্টান আলেম। তাওরাত-ইঞ্জীল সম্পর্কে তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান। তিনি বলেন। সবশুনে তিনি বুঝতে পারলেন এবং বললেন, এতো সে নামুস (ফেরেশতা), যিনি হযরত মুসা (আ:)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তোমার জাতি যখন তোমাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে, তখন আমি যদি বেঁচে থেকে তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম! এর কিছুদিন পরই ওয়ারাকা মারা যান।[৯]

ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ ইয়াহইয়া ইবনে ফোরাত-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এক বর্ণনায় সে সময়ে ইসলামের যে চিত্র অংকন করেছেন, আফীফ কিন্দীর ভাষায় তা ছিল নিম্নরূপ:

আমি জাহেলী যুগে মক্কায় এসেছিলাম স্ত্রীর জন্য আতর এবং কাপড়-চোপড় ক্রয় করতে। সেখানে আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালেবের কাছে অবস্থান করি। ভোর বেলা কা'বা শরীফের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। আব্বাস ও আমার সাথে ছিলেন। এসময় একজন যুবক আগমন করেন এবং আকাশ পানে তাকিয়ে কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ান। একটু পরে একজন শিশু এসে যুবকটির ডান পাশে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পরই একজন নারী এসে এসে এদের পেছনে দাঁড়ায়। এরা দু'জন যুবকটির পেছনে নামায আদায় করে চলে যায়। তখণ আমি আব্বাসকে বললাম, তুমি কি জান, এ যুবক এবং মহিলাটি কে? আমি জবাব দিলাম– না। তিনি বললেন, যুবকটি হচ্ছেন

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল মোত্তালেব আর শিশুটি হচ্ছে আলী। আবূ তালেব ইবনে আব্দুল মোত্তালেবের পুত্র। যে নারীকে তুমি উভয়ের পেছনে নামায আদায় করতে দেখেছ, তিনি হচ্ছেন আমার জোয়ান ভাতিজা মুহাম্মদ এর স্ত্রী খাদীজা ইবনেতে খুওয়াইলিদ। আমার ভাতিজার ধারণা, তার ধর্ম খাছ ইসলামী ধর্ম এবং তিনি যা কিছু করেন, আল্লাহ্‌র হুকুমেই করেন। যতদূর আমার জানা আছে, সারা দুনিয়ায় এ তিনজন ছাড়া আর কেউ তাদের দ্বীনের অনুসারী নেই। একথা শুনে আমার মনে আকাঙ্খা জাগে যে, চতুর্থ ব্যক্তি যদি আমি হতাম।[১০]

সত্য প্রচার এবং ইসলাম প্রসারের কাজে তখন নবীজীকে যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, সে সম্পর্কে ধারণা করার জন্য কেবল এ টুকুই যথেষ্ট যে, দীর্ঘ দিন তাঁকে স্ত্রীকে নিয়ে গোপনে নামায আদায় করতে হয়েছে।[১১] এমন বিপদে শংকুল সময়ে হযরত খাদীজা কেবল তাঁর সাথে একমতই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন তাঁর দুঃখে দুঃখী, বিপদে শান্তনা দাত্রী। সকল সময়ে বিপদে তাঁকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য করেছেন। জীবন-চরিত্র গ্রন্থে এর অসংখ্য উদাহরণ বর্তমান রয়েছে।

তাঁর প্রতি নবীজীর ভালবাসা

যে সহানুভূতিশীল স্ত্রী স্বামীর সন্তুষ্টি, তাঁর আনুগত্য এবং সুখ-শান্তিতে সর্বদা নিয়োজিত থাকা ছাড়াও স্বীয় প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সকল বিপদাপদ দূর করে দেয়, বিরোধী মুশরিক দলের বিরোধিতাকে করে তুচ্ছ প্রতিপন্ন- এমন স্ত্রী স্বামীর নিকট কতটা প্রিয় হবে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাইতো দেখা যায়, হযরত খাদীজার ইনতিকালের পর মহানবীর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তাঁর কথা উল্লেখ করে গুণাবলীর প্রশংসা না করে তিনি কখনো ঘরের বাইরে যেতেন না।[১২]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, হযরত খাদীজার প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা (?) ছিল, রাসূলের অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি ততটা ছিল না। একদিন রাসূলে খোদা (সাঃ) আমার সামনে তাঁর কথা উল্লেখ করলে আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে বলি, সে তো ছিল বৃদ্ধা স্ত্রী, এখন আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনাকে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট স্ত্রী দান করেছেন, তবুও আপনি তার কথা কেন স্মরণ করেছেন? আমার কথা শুনে আল্লাহ্‌র রাসূল ক্রুদ্ধ হন। রাগে তাঁর পশম

মোবারক উত্তপ্ত হয়ে উঠে। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম, তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী আমি পাইনি। যখন সকলে ছিল কাফের, তখন সে ঈমান এনেছিল। যখন সকলে আমাকে অবিশ্বাস করেছিল, তখন সে আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলো। যখন সকলে আমাকে ত্যাগ করেছিল। তখন সে অর্থ সম্পদ দ্বারা আমার সহায়তা করেছিলো। আল্লাহ্ তা'য়ালা তার গর্ভেই আমাকে সন্তান দান করেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এরপর আমি অন্তরে অন্তরে বলি-ভবিষ্যতে আমি কখনো খারাপ অর্থে তাঁর নাম মুখে নেবো না।[১৩] যতদিন বিবি খাদীজা বেঁচেছিলেন, রাসূলে খোদা অন্য কোন বিবাহ করেননি্ তাঁর প্রতি রাসূলে ভালোবাসার এটাও এক বড় প্রমাণ।

চরিত্র বৈশিষ্ট্য

হযরত খাদীজা ছিলেন অত্যন্ত সন্তান বৎসলা নারী। সন্তান প্রতিপালন কাজে তিনি খুব যত্নশীলা ছিলেন। গৃহকর্মে তিনি ছিলেন সুনিপূণা। এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণে রাসূলাল্লাহ বলেছিলেন– সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন সন্তানের মাতা এবং গৃহকর্ত্রী। রাসূলের সম্মান-মর্যাদার প্রতি তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। রাসূল যা কিছু বলতেন, তিনি সবই মেনে নিতেন। নবুওয়াত লাভের আগে পরে সব সময় তাঁর এ বৈশিষ্ট্য ছিল।[১৪]

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) বলেন, নবীজী (সাঃ) বলেছেনঃ দুনিয়ার সমস্ত নারীর ওপর চারজন নারীর মর্যাদা রয়েছে-মারইয়াম ইবনেতে ইমরান, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া, খাদীজা ইবনেতে খুওয়াইলিদ এবং ফাতিমা ইবনেতে মুহাম্মদ।[১৫] হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, রাসূলে খোদা (সাঃ) মাটির ওপর চারিটি রেখা এঁকে বলেন, জান, এটি কি? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল বললেন, জান্নাতী নারীদের মধ্যে চারজন সর্বশ্রেষ্ঠ– খাদীজা ইবনেতে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা ইবনেতে মুহাম্মদ, মারইয়ারম ইবনেতে ইমরান এবং আসিয়া ইবনেতে মুযাহিম অর্থাৎ ফেরাউনের স্ত্রী।[১৬] নবীজী হযরত খাদীজার যত তারীফ করতেন, অন্য কোন স্ত্রীর ততটা করতেন না।[১৭]

একদা হযরত খাদীজা (রাঃ) নবীজীর সন্ধানে বের হন। এটা এমন এক সময়ের কথা, যখন গোটা আরব তাঁর দুশমন ছিল। পথে হযরত জিবরাঈল

খোদার সব কয়জন সন্তানই জন্ম গ্রহণ করেন বিবি খাদিজার গর্ভে। ইবরাহীম জন্ম গ্রহণ করেন মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে।[২০] উপরোক্ত সন্তানাদীর মধ্যে বিবি খাদীজার গর্ভে রাসূলের দু'জন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছেন, না একজন, এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে দু'জনই তাঁর গর্ভজাত। উভয় পুত্র সন্তানই নবুওয়্যাত লাভের পূর্বে ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় কাশেম হাটি পাটি পা-পা করছেন, আর আবদুল্লাহ্ খুব অল্প বয়সেই ইনতিকাল করেন।[২১] আলী ইবনে আব্দুল আযীয জুরজানী বলেন, নবীজীর সন্তাদের মধ্যে সকলের বড় ছিলেন কাশেম। এরপরই যয়নব। আর কালবী বলেন, অতঃপর কাশেম, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা, রোকাইয়্যা এবং সব শেষে আব্দুল্লাহ। এটাই সবচেয়ে নির্ভুল তথ্য।[২২]

ওফাত

হযরত খাদীজা বিবাহের পর রাসূলের খেদমতে ২৪ বৎসর কাটান।[২৩] নবুওয়াতের অষ্টম বর্ষে হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে রমযান মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।[২৪] এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বৎসর। তখন পর্যন্ত নামায ফরয হয়নি। জানাযার বিধান হয়নি। কাজেই নামাযে জানাযা ছাড়াই রাসূলাল্লাহ্ তাঁকে দাফন করেন। হাজুন গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২৫] রাসূলাল্লাহ্র চাচা আবূ তালেব এবং হযরত খাদীজার একই বৎসর ইনতিকাল করেন। কারো কারো মতে আবূ তালেবের তিন দিন পর হযরত খাদিজা ইনতিকাল করেন। একের পর এক এ দুঃখজনক ঘটনার ফলে মহানবী অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হন। কারণ হযরত খাদীজা ছিলেন রাসূলের দুঃখে দুঃখী, ইসলামের জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। আর আবূ তালেব ছিলেন রাসূলে খোদার পৃষ্ঠপোষক।[২৬] হযরত আয়েশা (রা) এর সাথে বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্র রাসূলের দুঃখ লাঘব হয়নি।

১. তাবাকাতে ইবনে সাআদ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮১, ২. ঐ, ৩. দোররুল মানসুর (মিশরীয় সংস্করণ) পৃষ্ঠা ১৮০, ৪. তাবাকাতে ইবনে সাআদ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৯, ৫. দোররুল মানসুর পৃষ্ঠা ১৮১, ৬. তাবাকাতে ইবনে সাআদ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৯, ৭. ঐ, ৮. আল এছাবাহ পৃষ্ঠা ৫৪৯, ৯. বোখারী শরীফ ১ম খন্ডে বিস্ত ারিত আলোচনা রয়েছে, ১০. তাবাকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১১, ১১. ঐ পৃষ্ঠা ১০, ১২. আল এস্তীআব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৪০, ১৩. ঐ পৃষ্ঠা ৭৪১, ১৪. আল এছাবাহা পৃষ্ঠা ৫৪০, ১৫. আল এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৪০, ১৬. ঐ, ১৭. আল এছাবাহ ৫৪১, ১৮. ঐ. ১৯. আল এছাবাহ পৃষ্ঠা ৫৪১, ২০. ঐ, ২১. তাবাকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮, ২২. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৪৩৫, ২৩. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৪৩৫, ২৪. তাবাকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১১, ২৫. ঐ, ২৬. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৪৩৯।

২

উম্মুল মু'মেনীন হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রা)

উম্মুল মু'মেনীন হযরত সাওদা পিতার নাম যাম'আ ইবনে কায়েস ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে উদ্দ'আমেরী আর মাতার নাম শমুস ইবনেতে কায়েস ইবনে যায়েদ আমর ইবনে আমেরিয়া।

বিবাহ

চাচাত ভাই সাকরান ইবনে আমর এর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। সাকরান আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় এলে সাওদাও তাঁর সাথে ছিলেন।[১] সাকরান এবং সাওদা একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ এবং হিজরত করেন। মক্কায় সাকরানের ইনতিকাল হয়।[২] ইদ্দত পুরো হলে রাসূলে খোদা তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। সাওদার পক্ষ থেকে হাতের ইবনে আমর ইবনে আবদে শামসের অভিভাবকত্বে বিয়ে হয়। হযরত সাওদা হচ্ছেন প্রথম মহিলা, যিনি হযরত খাদীজার ইনতিকালের পর মহানবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এ বিবাহের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, হযরত ওসমান ইবনে মাযউনের স্ত্রী খাওলা নবীজীর খেদমতে হাজির হন। হযরত খাদিজার ইনতিকালের ফলে নবীজী অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। হযরত খাদীজার বিরহ-ব্যাথ্যা তাঁকে ব্যথিত করে তুলে। খাওলা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! খাদীজার ইনতিকালে আপনাকে অত্যন্ত বিষন্ন দেখছি। হযরত বললেন, ঠিক ব্যাপার তো তাই। খাওলা বললেন, তাহলে আপনার জন্য বিবাহ ঠিক করি?[৩] নবীজী তা মঞ্জুর করলে খাওলা সাওদাকে সুসংবাদ শুনান। সাওদা তা কবুল করে বললেন, আমার পিতা-মাতাকে জিজ্ঞেস করে নেব। সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর নবুওয়্যাতের দশম সালে তাঁর পিতা যামআ ৪শ দিরহাম মহরের বিনিময়ে বিবাহ পড়ান।[৪] খুব সম্ভব যাম'আ খুব বেশি বৃদ্ধ হয়ে

পড়েছিলেন বলে হাতেম ইবনে আমর ইবনে আবদে শামসকে বিবাহ অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়।

এ বিয়ের পর সাওদার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে যাম'আ- যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি- এসে এ সম্পর্কে জানতে পেরে গভীরভাবে ব্যথিত হন এবং মস্তক ধূলি ধূসরিত করেন। ইসলাম গ্রহণের পর এ আচরণের কথা মনে পড়লে তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করতেন।[৫]

সাধারণ অবস্থা

হেলাল ইবনে মোহাম্মদ এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে সাআদ উল্লেখ করেন যে, সাকরান ইবনে আমর এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা কালে একবার সাওদা স্বপ্নে দেখেন যে, নবীজী (সা:) আগমন করে তাঁর কাঁধে কদম মোবারক স্থাপন করেছেন। তিনি স্বামী সাকরান-এর নিকট এ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করলে সাকরান বলেন, তুমি সত্যিই এ স্বপ্ন দেখে থাকলে খোদার শপ আমি মারা যাবো এবং নবীজী তোমাকে বিয়ে করবেন। তিনি পুনরায় স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে আছেন, আকাশের চাঁদ ছুটে এসে তাঁর মাথায় পড়ছে। এ স্বপ্ন সম্পর্কেও সাকরানকে অবহিত করলে তিনি বলেন, আমি খুব সহসা মারা যাবো এবং আমার পরে তুমি বিয়ে করবে। সাকরান সে দিনই অসুস্থ হন এবং কয়েক দিনের মধ্যে ইনতিকাল করেন।[৬]

হযরত সাওদা এবং হযরত আয়েশার বিয়ের মাঝখানে খুব একটা ব্যবধান ছিল না। মাত্র কযেক দিন আগ-পিছ। যাই হোক, হযরত আয়েশাকে বিয়ে করার আগে হযরত সাওদার সাথে নবীজীর বিয়ে হয়েছে। উভয় স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল না। ঘটনাবলী থেকে প্রকাশ পায় যে, পরস্পরের মধ্যে সখ্যতা এবং ঐক্য বর্তমান ছিল। ঘর-কন্নার মাঝে হযরত সাওদা হযরত আয়েশাকে পরামর্শ দিতেন।[৭]

হযরত সাওদার কণধ ছিল দীর্ঘ। হযরত আয়েশা বলেন, এ দৈর্ঘ্যের ফলে তাকে সহজে চেনা যেতো। একবার তিনি প্রকৃতির ডাকে জঙ্গলে গমন করেন। হযরত ওমর তাঁকে চিনে ফেলেন। হযরত ওমর ইতিপূর্বে আযওয়াজে মুতাহহারাতের বাইরে গমন সম্পর্কে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে পর্দার প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন। তাই তিনি সাওদার প্রতি লক্ষ্য

করে বলেন, সাওদা! আমি আপনাকে দেখে ফেলেছি। কথাটি তাঁর খুব খারাপ লাগে এবং নবীজীর নিকট শেকায়াত করেন।[৮] এ ঘটনা পর্দার বিধান নাযিলের আগের। ইমাম বোখারী বলেন, এ ঘটনার পর হিজাব বা পর্দার আয়াত নাযিল হয়েছে।

বিদায় হজ্জের পর নবীজী (সা:) আযওয়াজে মোতাহহারাতকে বলেন, অতঃপর আর ঘরের বাইরে যাবে না। হযরত আবূ হোরায়রা বলেন, নবীজীর ওফাতের পরও অন্যান্য স্ত্রীরা হজ্জ করেন। কিন্তু সাওদা ইবনেতে যাম'আ এবং যয়নব জাহাশ এ নির্দেশটি এমন কঠোরভাবে মেনে চলেন যে, আর ঘরের বাইরে যাননি।[৯] হযরত সাওদা বলতেন, আমি হজ্জ করেছি, ওমরা করেছি। এখন আল্লাহ্র নির্দেশ মতো ঘরে বসে কাটাবো।[১০] হিজরী দশম বর্ষে হজ্জের সময় হযরত সাওদাও নবীজীর সাথে ছিলেন। অন্যদের মুযদালেফা ত্যাগের আগেই নবীজী তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দেন, যাতে ভিড়ে তাঁর কষ্ট না হয়। কারণ তাঁর দেহ ছিল বেশ মোটা।[১১]

চরিত্র বৈশিষ্ট্য

ওপরের বর্ণনা থেকে হযরত সাওদার আত্মত্যাগ এবং আনুগত্য পরায়ণতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অন্যান্য বর্ণনা নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে। এসব বর্ণনা থেকে তাঁর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে।

হযরত ওমর থলিতে পুরে হযরত সাওদার কাছে কিছু দিরহাম পাঠান। হযরত সাওদা জানতে চাইলেন, এতে কি আছে? বলা হলো, দিরহাম। তিনি বললেন, থলির খেজুরের মতো! এ বলে তখনই বণ্টন করে দেন।[১২] হযরত আয়েশা বলেন, সাওদা ছাড়া অপর কোন নারী আমি হিংসা পরশ্রীকাতরতামুক্ত দেখিনি। সাওদা ছাড়া অপর কোন নারী সম্পর্কে আমার মনে আকাংখাও জাগেনি যে, তার দেহে যদি আমার প্রাণ হতো।[১৩] তাঁর মেযাজ ছিল খুব কড়া। কোন কোন সময় মামুলী ব্যাপারে রাগ করে বসতেন।[১৪] কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি তাঁর মধ্যে হাসি-কৌতুকের পবিত্র মযাকও আমানত রেখে ছিল। অনেক সময় কথা দিয়ে তিনি নবীজীকে হাসাতেন।[১৫] একবার তিনি নবীজীকে বলেন, গত রাত্রে আমি আপনার পেছনে নামায পড়েছি। কিন্তু আপনি রুকুতে এত দেরী করছেন যে, আমার নাক ফেটে রক্ত বের না হয়, সেজন্য আমি নাক চেপে ধরেছিলাম। হযরত তাঁর কথা শুনে মৃদু হাসেন।[১৬]

ওফাত

হযরত ওমরের খেলাফত কালের শেষের দিকে হযরত সাওদা ইনতিকাল করেন।[১৭] এ বিষয়ে ইবনে আব্দুল বার এর মতের সাথে ইমাম বোখারীসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দেসীনরাও একমত। আফাফান ইবনে মুসলেম এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে সা'আদ লিখেন যে, একদা সকল আযওয়াজে মুতাহহারাত মিলিত হয়ে নবীজীকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কে সর্ব প্রথম আপনার সাথে মিলিত হবেন? হযরত জবাব দেন, তোমদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে দরায। নবীজীর ওফাতের পর তাদের সকলে একে অন্যের হাত মাপেন। দেখা যায়, হযরত সাওদার হাত সবচেয়ে দরায।[১৮] কিন্তু সকলের আগে হযরত যয়নব ইবনেতে জাহাশের ওফাত হলে জানা যায় যে, দরায হাত অর্থ দাতার হাত, সদকা-দান-খয়রাত। এটা ছিল হযরত যয়নবের অতি প্রিয় কাজ। মুহাম্মদ ইবনে আমর বলেন, হাদীসটি সাওদার ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়, আর আসলেও তাই। বরং হাদীসটি হযরত যয়নব ইবনেতে জাহাশ সম্পর্কে। আযওয়াজে মুতাহহারাতের মধ্যে সকলের আগে তাঁর ইনতিকাল হয়েছিল। সাওদা তখনও বেঁচেছিলেন।[১৯]

আওলাদ

অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থে তাঁর সন্তানাদি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই। যুরকানী উল্লেখ করেন যে, তাঁর প্রথম স্বামীর পক্ষে একমাত্র পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তাঁর নাম ছিল আবদুর রহমান। হালুলার যুদ্ধে তিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।

১. তাবাকাত পৃষ্ঠা ৩৬. ২. ঐ, ৩. ঐ পৃষ্ঠা ৩৯, ৪. যুরকানী ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ২৬০, ৫. যরকানী ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৪৬০, ৬. ঐ. ৭. তাবাকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ছহীহ বোখারী বাবুল হাদায়া ও বাবুত তাহরীম, ৮. ছহীহ বোখারী, ৯. তাবাকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৭, ১০. ঐ পৃষ্ঠা ৩৮, ১১. ছহীহ বোখারী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২২৮, ১২. তাবাকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৮, ১৩. ঐ পৃষ্ঠা ৩৭ ও ছহীহ বোখারী. ১৪. তাবাকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৫ ঐ. ১৬. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৫৭. ১৭. তাবাকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৭. ১৮. ঐ. ১৯. ঐ।

৩

উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)

উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা, ডাক নাম উম্মে আব্দুল্লাহ বা আব্দুল্লাহর মা। সিদ্দীকা লকব বা উপাধী। পিতৃকুল আবূ বকর ইবনে আবূ কোহাফা ইবনে ওসমান ইবনে 'আমের ইবনে ওমর ইবনে কা'আব ইবনে সা'আদ ইবনে তাইম এবং মাতৃকুল উম্মে রোমান ইবনেতে 'আমের ইবনে উয়াইমের ইবনে আবদে শাম্‌শ ইবনে ইতাব ইবনে আযীনা ইবনে সাবী' ইবনে ওয়াহমান ইবনে হারেস ইবনে গানাম ইবনে মালেক ইবনে কেনানা। অর্থাৎ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) পিতৃকুলের দিক থেকে তাইম বংশের এবং মাতৃকুলের দিক থেকে কেনানা গোত্রের ছিলেন।

হযরত আয়েশার কোন সন্তানাদি ছিলো না। এজন্য তাঁর কোন কুনিয়াতও ছিল না। আরবে কুনিয়াত বা ডাক নামকে মনে করা হতো শরাফতের প্রতীক। এ কারণে একদা তিনি নবীজীকে বলেন, ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! অন্যান্য নারীরা কুনিয়াত দ্বারা মশহুর। তাই আপনি আমার জন্যও একটা কুনিয়াত প্রস্তাব করুন। নবীজী বললেন, তুমি আব্দুল্লাহ্‌র নামে কুনিয়াত গ্রহণ কর অর্থাৎ উম্মে আব্দুল্লাহ্ কুনিয়াত ধারণ কর। আব্দুল্লাহ্ ছিল হযরত আয়েশার বোনের ছেলের নাম।[১]

জন্ম

ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আয়েশার জন্ম সাল উপেক্ষিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে রাসূলে খোদার সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছে এবং বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ৬ বৎসর।[২] এ ব্যাপারে গবেষকরা একমত। তাই দেখা যায়, হিজরতের ৯ বৎসর আগে তাঁর জন্ম হয়েছে।

শিশুকাল

শিশুকালে তিনি ছিলেন অন্যান্য শিশুদের চেয়ে স্বতন্ত্র। শৈশব থেকে তাঁর মধ্যে এমন সব গুণাবলী লক্ষ্য করা যায়, যদ্বারা তাঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সম্পর্কে ধারণা করা মোটেই কঠিন নয়। শৈশবের স্মৃতি সাধারণত: বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যায়। কিন্তু তিনি ছিলেন এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। শৈশবের প্রতিটি কথা তাঁর স্মরণ ছিল। রাসূলে খোদা যখন হিজরত করেন, তখন তাঁর বয়স ছিলো ৯ বৎসর। কিন্তু হিজরতের ঘটনা পরম্পরা যতটা হযরত আয়েশা স্মৃতি শক্তি দিয়ে ধরে রাখতে পেরেছিলেন। অতটা অন্য কোন সাহাবী পারেন নি। ইমাম বোখারী সূরা কামার-এর তাফসীরে লিখেছেন:

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهَى وَاَمَرُّ. (القمر : ٤٦)

এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন হযরত আয়েশা খেলা করছিলেন। ইমাম বোখারী এ রেওয়াতটিও গ্রহণ করেছেন হযরত আয়েশার কাছ থেকে।

একদা হযরত আয়েশা গুটি খেলছিলেন। এমন সময় রাসূলে খোদা উপস্থিত হন। একটি গুটি ছিল ঘোড়া মার্কা। এর উভয় দিকে পালক লেগেছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা! এটা কি? আয়েশা জবাব দেন, ঘোড়া। তিনি বললেন, ঘোড়ারতো পালক থাকে না। তিনি এতটুকুও চিন্তা না করে বললেন, কেন? হযরত সুলাইমান (আ:) এর ঘোড়ারতো পালক ছিল।[৩] তাঁর জবাব শুনে রাসূলে খোদা হাসলেন।

সহপাঠীদের কাছে তাঁর খেলাধুলার ঘটনা নানাভাবে অনেক রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং এটা অনেক প্রসিদ্ধিও লাভ করেছে। তাই এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা আমরা তেমন জরুরী মনে করি না। যাই হোক, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের শৈশবকালও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, একথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য হযরত আয়েশার উপরোক্ত ঘটনাই আমরা যথেষ্ট মনে করি।

বিবাহ

হযরত সাওদা অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে যে, বিবি খাদীজার ইনতিকালের পর নবীজীকে বিষণ্ন দেখে হযরত ওসমান ইবনে মায্‌উনের স্ত্রী খাওলা তাঁকে বিবাহের অনুরোধ করেন। কিন্তু সেখানে ইচ্ছা করে একথা উল্লেখ

করা হয়নি যে, নবীজী খাওলাকে জিজ্ঞেস করেন, কাকে বিবাহ করবো? জবাবে তিনি আরজ করেন, কুমারী এবং বিধবা দুঃরকম নারীই বর্তমান রয়েছে। সাওদা ইবনেতে যামআ বিধাবা এবং আয়েশা ইবনেতে আবূ বকর কুমারী। যার সম্পর্কে হুকুম হয়, চেষ্টা করে দেখবো। যাই হোক, অবশেষে নবীজীর ইঙ্গিত পেয়ে খাওলা হযরত আবূ বকরের নিকট গমন করেন এবং তাঁর সাথে আলাপ করেন। তখন মুখ ডাকা ভাইয়ের মর্যাদা সৎ ভাই এর চেয়ে কম ছিল না। জাহিলিয়াতের যুগ থেকে এ রসম চলে আসছিল। হযরত আবূ বকর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, ভাইয়ের মেয়েকে কি বিবাহ করা যায়? খাওলা নবীজীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। হযরত বরেন, আবূ বকর আমার দ্বীনী ভাই। এমন ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা জায়েজ।[৪]

ইতিপূর্বে যুবাইর ইবনে মুতআম-এর পুত্রের সাথে হযরত আয়েশার বিবাহের প্রস্তাব আসে। তাই হযরত আবূ বকর যুবাইরকে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু যুবাইর-এর খান্দান তখনও ইসলাম সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিল না। তাই জুবাইর এর মা এ বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, এমন মেয়ে আমার ঘরে এলে আমার ছেলে বেদ্বীন হয়ে যাবে।[৫] সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত হওয়ার পর ৬ বছর বয়সে নবুওয়্যাতের দশম বর্ষে হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে হযরত আশেয়ার সাথে নবীজীর বিবাহ সম্পন্ন হয়।[৬] শাওয়াল মাসে ৫শ দিরহাম মহরানার বিনিময়ে বিবাহ হয়।[৭] নবী সহধর্মিণীদের মোহরানা ছিল সাধারণত: পাঁচ শত দিরহাম।[৮]

যতো সাদাসিধেভাবে হযরত আয়েশার বিয়ে হয়েছে, স্বয়ং তাঁর বর্ণনা থেকেই সে সম্পর্কে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন যে, নবীজীর সাথে যখন আমার আক্‌দ হয়, আমি তখন অন্য মেয়েদের সাথে খেলা করি। পিতা আমাকে ঘরের বাইরে যেতে বারণ করার পর পর্যন্ত বিবাহ সম্পর্কে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।[৯] নবীজী পূর্ব থেকেই এ বিবাহের সুসংবাদ লাভ করেন। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে রেশমে মোড়া কোন জিনিস দেখাচ্ছে আর বলছে, এটা আপনার জন্য। তিনি খুলে দেখেন, তাতে রয়েছে হযরত আয়েশা।[১০]

হিজরত ও ঘরে তুলে নেয়া

নবীজী মদীনা শরীফ পৌঁছে পরিবার-পজিনকে নিয়ে আসার জন্য যায়েদ ইবনে হারেসা এবং তাঁর গোলাম আবূ রা'ফেকে মক্কা শরীফ প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে দু'টি উট ও পাঁচশ দিরহামও দেন। প্রয়োজনীয় কেনা-কাটার জন্য। এ অর্থ তিনি হযরত আবূ বকর (রা:) এর নিকট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা:)ও এদের সাথে দু'তিনটি উটসহ আবদুল্লাহ্ ইবনে আরীকতকে প্রেরণ করেন এবং স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ্র মাধ্যমে খবর পাঠান যে, তারা যেন হযরত আয়েশা (রা:) তাঁর বোন আসমা, এবং মাতা উম্মে রোমানকে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

এরা যখন মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, তখন তাল্হা ইবনে আবদুল্লাহ্ও হিজরতের উদ্দেশ্যে এদের সঙ্গী হন। আবূরাফে' এবং যায়েদ ইবনে হারেসার সাথে ছিলেন হযরত ফাতিমা, হযরত উম্মে কুলসুম, হযরত সাওদা ইবনেতে যামআ, উম্মে আইমান এবং উসামা ইবনে যায়েদ আর আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ বকর এর সাথে ছিলেন উম্মে রোমান এবং আবদুল্লাহ্র দুবোন- আয়েশা এবং আসমা। গোটা কাফেলা যখন মিনা ময়দানে উপস্থিত হয় তখন হযরত আয়েশা এবং তার মাতা উম্মে রোমান যে উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন, তা এত দ্রুত বেগে ছুটে চলে যে, উম্মে রোমান অস্থির হয়ে চিৎকার জুড়ে দেন। যা হোক শেষ পর্যন্ত উটকে আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় এবং সকলে নিরাপদে পৌঁছেন। গোটা কাফেলা যখন নিরাপদে মদীনা পৌঁছে, হযরত তখন মসজিদে নববী এবং আশ-পাশের গৃহ নির্মাণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত সাওদা এবং তাঁর সন্ত ানদেরকে একটি গৃহে স্থান দেয়া হয়।[১১] আর হযরত আয়েশা (রা: অবস্থান করেন বনু হারেসে। মদীনার আবহাওয়া এদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল ছিল না বিধায় এখানে এসে অধিকাংশ মুহাজিরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত আয়েশা অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষায় নিয়োজিত হন। হযরত আবূ বকর (রা:) সুস্থ্য হওয়ার পর হযরত আয়েশা (রা:) নিজেই অসুস্থ হড়ে পড়েন। এ সময় অসুস্থতার কারণে তার মাথার সব চুল পড়ে যায়।[১২]

মোট কথা, এসব বিপদ কেটে ওঠার পর হযরত আবূ বকর (রা:) নবীজীর খেদমতে আরয করেন যে, আপনি আয়েশাকে ঘরে তুলে আনছেন না কেন? রাসূল বললেন, মহর আদায় করতে অক্ষম, তাই। হযরত আবূ বকর

নিজে রাসূলকে পাঁচশ দিরহাম করয দেন মহর পরিশোধ করার জন্য রাসূল (সাঃ) তা হযরত আয়েশার নিকট প্রেরণ করেন।[১৩]

এ হচ্ছে হযরত আয়েশাকে ঘরে তুলে নেয়ার কাহিনী। ঘটনাটি ঘটে হিজরী প্রথম সালের শাওয়াল মাসে। তখন হযরত আয়েশার বয়স ৯ বৎসর এখানে স্মর্তব্য যে, হযরত আয়েশার বিবাহও হয়েছিল শাওয়াল মাসেই আর তাঁকে ঘরে তুলে নেয়াও হয় এ মাসেই। তাই তিনি এ মাসে বিয়ের অনুষ্ঠানকে বেশি পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, আমার বিয়ে এবং বিদায় দুটোই শাওয়াল মাসে হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বামীর নিকট আমার চেয়ে বেশি ভাগ্যবর্তী আর কেউ নেই।[১৪] এর পেছনেও একটা কথা আছে। কোন কালে শাওয়াল মাসে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। তাই অনেকে এ মাসটিকে অশুভ মনে করতো। এ মাসেই নবীজীর বিয়ে করা এবং বধুকে ঘরে তুলে আনা ছিল আরবের তদানীন্তন কল্পকাহিনী এবং প্রথা পূজার অবসান।

সাধারণ অবস্থা

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা চর্বিত চর্বন বৈ কিছুই নয়। হযরত আবূ বকর (রাঃ) ইসলামের ডাকে সর্ব প্রথমে সাড়া দিয়েছেন, একথা সকলেরই জানা। হযরত আয়েশা যখন চোখ খোলেন তখন তাঁর গৃহের পরিমন্ডলে কুফর-শির্ক এর চিহ্নও থাকার কথা নয়। তিনি নিজেও বলেন, আমি যখন পিতা-মাতাকে চিনতে পেরেছি, তখন মুসলমান হিসেবেই তাঁদেরকে দেখতে পেয়েছি।[১৫]

হযরত আয়েশার জীবনে যে সব ঘটনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোকে চারটি শিরোনামে বিভক্ত করা যায়– ইফ্‌ক বা অপবাদ আরোপের ঘটনা, ঈলা, তাহরীম এবং তাখঈর। এখানে সংক্ষেপে এসব সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

ইফ্‌ক বা অপবাদ আরোপের ঘটনা

হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনাটি ঘটে মিরীসী' যুদ্ধ ব্যপদেশে সফর উপলক্ষ্যে। এ সফরে হযরত আয়েশা (রাঃ) নবীজীর সাথে ছিলেন। সফরে গমনকালে স্বীয় বোন হযরত আসমার কাছ থেকে একটি হার ধার নেন। হারটি ছিল তার গলায়। তখন তার বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর একবার পথি মধ্যে রাত হয়ে যায়। রাত্রিবেলা কাফেলা এক স্থানে অবস্থান

করে। হযরত আয়েশা (রা:) প্রকৃতির ডাকে অবস্থান স্থল থেকে একটু দূরে গমন করেন। সেখান থেকে ফিরে গলায় হাত দিয়ে দেখেন, হার নেই। একেতো অল্প বয়সে গয়নার প্রতি নারীদের বেশ একটা মোহ থাকে, তদুপরি ধার করা জিনিষ। তাই তিনি বেশ ঘাবড়ে যান। অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি ধারণা করেছিলেন যে, কাফেলা রওয়ানা করার পর তিনি হারটি খুঁজে নিয়ে ফিরে আসবেন। যাওয়ার সময় তিনি কাউকে বলেও যাননি। সামান্য তালাশের পরই হারটি পাওয়া যায়। ওদিকে কাফেলা তৈয়ার ছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতেই কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায়। তিনি ফিরে এসে দেখেন, কেউ নেই; সবাই চলে গেছে। বাধ্য হয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে সেখানে পড়ে থাকেন। ছাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল সাহাবী প্রয়োজনীয় কাজে কাফেলার পেছনে থাকতেন। ভোরে তিনি সেখানে পৌঁছে হযরত আয়েশাকে চিনতে পারেন। কারণ, পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার আগে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। নিকটে এসে দুঃখ করে উটের পিঠে তুলে নিয়ে রওয়ানা করেন এবং দুপুর নাগাদ কাফেলার সাথে মিলিত হন।

ওদিকে মোনাফেকরা রাতদিন এ চেষ্টায় নিয়োজিত ছিল, যেভাবেই হোক, নবীজী এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের দুর্নাম রটাতে হবে। তাদের এ কোশেশ জোরে-শোরে জারী ছিল। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছিল মোনাফিকদের সর্দার। সে রটনা করে যে, হযরত আয়েশা (রা:)-র সতীত্ব হানী হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। গুটি কতেক মুসলমানের ওপরও মোনাফেকদের অপপ্রচারের প্রভাব পড়ে, ভ্রান্তির শিকার হয়ে অনেকাংশে। তারাও এ ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু ঘটনাটি ছিল ভিত্তিহীন, এর মূলে বিন্দুমাত্রও সত্যতা নিহিত ছিল না। অনুসন্ধান করে হযরত আয়েশার নিষ্পাপ হওয়া এবং মোনাফেকদের চক্রান্ত প্রমাণিত হয়। তা সত্ত্বেও হযরত আয়েশার ওপর এসবের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। ক্ষোভে-শোকে-দুঃখে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। যাই হোক, নিশ্চিত হওয়ার পর সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে, এমন কি নবীজীর এ উক্তির পর- হযরত আয়েশা নিষ্পাপ থাকলে স্বয়ং খোদা তার পবিত্রতার সাক্ষ্য দেবেন- বারাআত বা মুক্তির আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতে স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হযরত আয়েশার নিষ্কলুষতা প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয় ঃ

لَوْلَا اِذْسَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلْمُؤْمِنَاتُ بَاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ

مُّبِيْنٌ. (النور : ١٢)

এটা তোমরা শুনে মোমেন নারী-পুরুষ সম্পর্কে ভালো ধারণা কেন করনি? কেন বলনি যে, এতো স্পষ্ট অপবাদ?

[এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের সূরা নূর-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত সূরার ১১ থেকে ২০ আয়াতের তর্জমা এবং তাফসীর দ্রষ্টব্য। অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাওলানা সাইয়্যেদ সুলায়মান নাদভী রচিত সীরাতে আয়েশা (হযরত আয়েশার জীবন চরিত) গ্রন্থ দেখার জন্য বিজ্ঞ পাঠক মন্ডলীকে অনুরোধ জানাচ্ছি– অনুবাদক]

হযরত আয়েশার পবিত্রা-নিষ্কলুষতা সম্পর্কে কুরআন মজীদের আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাঁর মন শান্ত হয়। মাতা বলেন, আদরের দুলালী, উঠ এবং স্বামীর পদ চুম্বন কর। কিন্তু তিনি নারী সুলভ অভিমানের সুরে জবাব দেন– আমি কেবল আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করবো। অন্য কারো কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো না।[১৬]

তাহরীমের ঘটনা ছিল এই যে, যে পরিমাণ রসদ এবং খেজুর মহা নবীর স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, এমনিতেই তা ছিল অপর্যাপ্ত। উদারতা, দানশীলতা এবং আতিথেয়তার কারণে তা মোটেই যথেষ্ট হতো না। এ দিকে যুদ্ধের পর যুদ্ধে বিজয়, বার্ষিক আমদানী বৃদ্ধি এবং পর্যাপ্ত গনীমতের মাল সঞ্চয় হতে দেখে একদা সকল স্ত্রী মিলে এ অপর্যাপ্ত পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য নবীজীর সমীপে সম্মিলিত আবেদন পেশ করেন। হযরত আবূ বকর এবং হয়রত ওমর যেহেতু নবীজীর অনাড়ম্বর জীবনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন, তাই তাঁরা তাঁদের কন্যাদ্বয়কে বুঝিয়ে-শুজিয়ে এ দাবি থেকে নিবৃত্ত করেন। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীরা তাদের দাবিতে অটল থাকেন। ঘটনাচক্রে এ সময় নবীজী ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান এবং একটি গাছের গোড়ায় পড়ে এক পাশে আঘাত পান। হযরত আয়েশার হুজরার নিকটেই ছিল একটা বালাখানা। নবীজী এখানে অবস্থান করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, এক মাস স্ত্রীদের সাথে মিলিত হবেন না।

মোনাফেকরা রটনা করে যে, নবীজী স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন। হযরত ওমর খবর পেয়ে মসজিদে নববীতে ছুটে যান। সমস্ত সাহাবীকে বিষণ্ন, বেদনা ক্লিষ্ট দেখতে পান। তিনি হযরতের দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তৃতীয় দফায় অনুমতি পাওয়া যায়। দেখতে পান, নবীজী একটা খালী চার পায়ায় শুয়ে আছেন। দেহ মোবারকে দাগ পড়েছে, কয়েকটি মাটির পাত্র এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে। এ অবস্থা দেখে তাঁর চোখে অশ্রু নেমে আসে। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন? হুজুর বললেন, না। হযরত ওমর (রাঃ) সাধারণ মুসলমানকে এ খোশ খবর শুনালেন। এ মাসিট ছিল ২৯ দিনের। হযরত আয়েশা বলেন, আমি এক একটি দিন গণনা করে চলছিলাম। ২৯ তম দিনে তিনি বালাখানা থেকে নেমে আসেন। প্রথমে আমার কক্ষে প্রবেশ করেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এক মাসের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আজতো ২৯ তারিখ মাত্র। হুজুর বললেন, মাস ২৯ দিনেরও হয়।[১৭]

এ ঘটনার পর একদিন তিনি হযরত আয়েশার নিকট গমন করেন। বলেন, আয়েশা! আমি তোমাকে একটা কথা বলবো। পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে তাড়াহুড়ো করে জবাব দেবে না। হযরত আয়েশার আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কী সে কথা? জবাবে তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেনঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً – وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا . (الاحزاب : ٢٨-٢٩)

হে নবী! আপন স্ত্রীদেরকে বলে দাও যে, তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন এবং তার চাকচিক্য চাও তবে এসো, আমি তোমাদেরকে ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দেই এবং সুন্দরভাবে বিদায় করি। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং পরকালের নিবাস চাও, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের মত নেক স্ত্রীদের জন্য বিপুল বিনিময় ঠিক করে রেখেছেন। (সূরা আহযাব : ২৮-২৯)

হযরত আয়েশা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কোন ব্যাপারে পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করবো? আমি তো আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং পরকালের গৃহ চাই। নবীজী এ জবাব পছন্দ করেন এবং তাঁর চেহারায়

আনন্দের আভা ফুটে ওঠে। তিনি বলে, তোমার অন্যান্য সাথীকেও একই কথা বলবো। হযরত আয়েশা বললেন, আমার জবাব সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবেন না। নবীজী তা মঞ্জুর করেন[১৮] এবং অন্যান্য স্ত্রীকেও একই কথা বলেন। তাঁরাও একই জবাব দেন।[১৯] উপরোক্ত আয়াতকে আয়াতে তাখঈর বলা হয়। কারণ, স্ত্রীদের পক্ষ থেকে পার্থিব ভোগ-বিলাস দাবি করা নবীর মানও মর্যাদার পরিপন্থী। তাই এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে গ্রহণ করবে, তারাই থাকবে, অন্যথায় বিদায় নেবে।

নবীজী হযরত আয়েশাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এমন কি ফযীলত-মর্যাদা এবং অন্যান্য গুণাবলীর বিচারেও হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন অন্যান্য স্ত্রীদের চেয়েও প্রিয়। তাঁর উক্তি থেকেও এ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তিনি বলেন, পওয়ারদিগার! যা কিছু আমার আয়ত্তাধীন, (অর্থাৎ স্ত্রীদের মধ্যে সাম্য বজায় রাখা) সে ক্ষেত্রে ইনসাফ থেকে যেন আমি বিরত না থাকি, আর যা আমার আয়ত্তের বাইরে (অর্থাৎ আয়েশার মর্যাদা ও ভালোবাসা) তা ক্ষমা করে দাও।[২০] হযরত আমর ইবনুল আস নবীজীকে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দুনিয়ায় আপনার সব চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? রাসূল বললেন, আয়েশা। তিনি বললেন, আমি জানতে চাচ্ছি, পুরুষদের মধ্যে কে সব চেয়ে প্রিয়। জবাব দিলেন, আয়েশার পিতা।[২১] এছাড়া আরও অনেক ঘটনা আছে, যা থেকে জানা যায় যে, নবীজী হযরত আয়েশার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন। হযরত ওমর (রাঃ) তার খেলাফত কালে নবীজীর অন্যান্য স্ত্রীদের তুলনায় হযরত আয়েশাকে দু'হাজার দিরহাম বেশি দেন। কারণ, তিনি নবীজীর অত্যন্ত প্রিয় ভাজন ছিলেন।

হযরত আয়েশাও নবীজীকে এমনিভাবে ভালোবাসতেন। তাইতো দেখা যায়, কখনো কখনো হযরত আয়েশা রাত্রে ঘুম থেকে ওঠে নবীজীকে পাশে না পেয়ে অস্থির হয়ে যেতেন। একদা এমনি এক ঘটনা ঘটে। নবীজীকে পাশে না পেয়ে ভাবলেন, হয় তো অপর কোন স্ত্রীর গৃহে গেছেন। এদিক-ওদিক খুঁজে দেখেন, তিনি সাজদাতে নিমগ্ন। ভ্রান্ত ধারণার জন্য তিনি নিজের কাছে লজ্জিত হন। অবচেতনভাবে তিনি বলেন ওঠেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, আমি কোন্ খেয়ালে ছিলাম, আর আপনি কোন্ হালে আছেন।[২২]

স্বামীর প্রতি ভালোবাসা

রাসূলে খোদা যে কাপড় পরিধান করে ইনিতকাল করেছেন, হযরত আয়েশা তা হেফাযত করে রাখেন। একদিন তিনি জনৈক সাহাবীকে নবীজীর তহবন্দ এবং এক খানা কম্বল দেখিয়ে বলেন, খোদার কসম, হযরত এ কাপড় পরিধান করে ইনতিকাল করেছেন।[২৩] হযরত আয়েশা রাসূলে খোদার নিকট অত্যন্ত প্রিয় হলেও তাঁর খেদমতের ওপর এ ভালোবাসার কোন প্রভাব পড়তো না। বরং তিনিই নবীজীর বেশি সেবার সুযোগ লাভ করতেন। পবিত্রতা-পচ্ছিন্নতার প্রতি বেশি আকর্ষণের কারণে রাসূরে খোদা বারবার মেসওয়াক চিবায়ে নিতেন আর হযরত আয়েশা এ খেদমত আনজাম দিতেন।[২৪]

একবার নবীজী একখানা কম্বল গায়ে জড়িয়ে মসজিদে গমন করেন। জনৈক সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কম্বলে দাগ দেখা যাচ্ছে। তিনি কম্বল খুলে গোলামের মারফত হযরত আয়েশার কাছে পাঠান ধুয়ে শুকিয়ে ফেরত পাঠাবার জন্য। হযরত আয়েশা নিজ হাতে তা ধুয়ে-শুকিয়ে নবীজীর কাছে প্রেরণ করেন।[২৫] তিনি নিজ হাতে গৃহের সমস্ত কাজ করতেন।

হযরত আয়েশা রুটি তৈয়ার করে রাসূলে খোদার অপেক্ষায় থাকেন। তাঁর আগমনে বিলম্ব দেখে ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি ঘরে এস হযরত আয়েশাকে জাগিয়ে তোলেন।[২৬]

নবীজীর ওফাতের সময় হযরত আয়েশার বয়স ছিল ১৮ বৎসর। রাসূলাল্লাহ্ ১৩ দিন অসুস্থ ছিলেন। এ সময় পাঁচ দিন তিনি অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে অবস্থান করেন। অবশিষ্ট ৮ দিন অবস্থান করেন হযরত আয়েশার হুজরায়। ১১ হিজরীর ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার আয়েশার কোলে মাথা রেখে তিনি পরপারে যাত্রা করেন। হযরত আয়েশার হুজরার এক কোণে তাঁকে দাফন করা হয়।[২৭]

নবুওয়াতের মর্যাদার বিষয় বিবেচনা করে আল্লাহ্ তা'আলা হযরতের স্ত্রীদের জন্য পুনঃবিবাহ হারাম করে দিয়েছেন। তাই বিধবা অবস্থায় হযরত আয়েশার জীবনের ৪৮ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়ে তিনি চারজন খলীফার শাসনকাল দেখতে পেয়েছেন।

রাসূলে খোদার ওফাতের পর হযরত আবূ বকর (রা:) এর খেলাফত স্বীকার করে সকলে বায়আত করলে নবীজীর স্ত্রীরা হযরত ওসমান (রা:) এর মাধ্যমে মীরাস দাবি করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে হযরত আয়েশা (রা:) স্মরণ করিয় দিয়ে বলেন, যে, নবীজী বলে গেছেন, কেউ আমার ওয়ারিশ হবে না। আমার রেখে যাওয়া জিনিস হবে ছদকা।

হযরত আয়েশা বিধবা হওয়ার দুঃবছরের মধ্যে হযরত আবূ বকরের খেলাফতকাল শেষ হয়ে যায়। হিজরী ১৩ সালে তাঁকে পিতৃহারাও হতে হয়। মৃত্যুকালে তিনি পিতার শিয়রে উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবূ বকর তাঁকে কিছু সম্পত্তি দিয়েছিলেন। এসব সম্পদে অন্যান্য সন্তানদেরও অংশ ছিল। হযরত আবূ বকর জিজ্ঞোস করলেন, তুমি কি অন্য ভাই-বোনদেরকেও দেবে? হযরত আয়েশা জবাব দিলেন, অবশ্যই। ইনতিকালের পর হযরত আবূবকরকেও হযরত আয়েশার হুজরায় নবীজীর পাশে দাফন করা হয়।

হযরত ওমরের শাসনকালে নবীজীর স্ত্রীদের প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক দশ হাজার দিরহাম বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। হযরত আয়েশাকে ১২ হাজার দিরহাম বৃত্তি দেওয়া হয়। তাঁকে বেশি দেওয়ার কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, হযরত আয়েশা ছিলেন নবীজীর অতি প্রিয়। ইরাক বিজয়ের পর গনীমতের মালের মধ্যে এক কৌটা মণি-মুক্তাও পাওয়া যায়। গনীমতের মাল বণ্টনের মাল বণ্টনের সময় এটি বণ্টন করা খুব কঠিন মনে হয়। হযরত ওমর এ বলে সকলের অনুমতি চান যে, আপনারা পছন্দ করলে আমি এটি উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশাকে দিতে পারি। কারণ তিনি, নবীজীর অতি প্রিয়জন ছিলেন। সকলে সানন্দে অনুমতি দেন। হযরত ওমর কৌটাটি হযরত আয়েশার নিকট প্রেরণ করেন। খুলে দেখে তিনি বলেন, হযরতের পর খাত্তাবের পুত্র ওমর আমার প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। হে খোদা, তাঁর দানের জন্য আগামীতে আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না।[২৮]

হযরত ওমরের ইনতিকালের সময় উপস্থিত হলে তিনি পুত্র আবদুল্লাহকে হযরত আয়েশার খেদমতে প্রেরণ করেন নবীজীর পাশে দাফন করার অনুমতির জন্য। তিনি বলেন, এ স্থানটি আমার নিজের জন্য রাখলেও ওমরের জন্য তা আনন্দের সাথে ত্যাগ করছি। এ অনুমতি পাওয়ার পরও হযরত ওমর ওছিয়ত করেন, আমার মৃতদেহ আস্তানার সামনে রাখবে। অনুমতি পাওয়া গেলে ভেতরে দাফন করবে, অন্যথায় সাধারণ

মুসলমানদের কবরস্তানে দাফন করবে। তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী কাজ করা হয়। হযরত আয়েশা অনুমতি দেন। মৃতদেহ হযরত আয়েশার হুজরায় দাফন করা হয়।[২৯] কিন্তু মুসলমানদের নিকট এ আত্মত্যাগের যে মর্যাদা হতে পারে, তা আলোচনা করার অপেক্ষা রাখে না।

শৈশবে হযরত আয়েশা ছিলেন হালকা পাতলা[৩০] কিন্তু ১৪/১৫ বৎসর বয়সে উপনীত হলে দেহ কিছুটা ভারী হয়ে পড়ে।[৩১] তাঁর দেহের রং ছিল সাদা গোরা।[৩২] তাঁর চেহারা ছিলো সদা হাস্যোজ্জ্বল।[৩৩]

লেবাস

হযরত আয়েশার লেবাস সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায় কেউ বলেন, তিনি লাল রঙ্গের জামা এবং কালো ওড়না পরিধান করতেন।[৩৪] কিন্তু অধিকাংশ বর্ণনাকারী জাফরানী রঙ্গের লেবাসের উল্লেখ করেছেন।[৩৫] কাসেম ইবনে মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আয়েশাকে এহরামের অবস্থায়ও স্বর্ণের আংটি এবং হলুদ রঙ্গের লেবাস পরিহিতা দেখেছি।[৩৬] কখনো একখানা রেশমী চাদর ব্যবহার করতেন, পরে এটি আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরকে দান করেন।[৩৭] অল্পে তুষ্টির কারণে একজোড়া লেবাস কাছে রাখতেন, ধুয়ে পরিস্কার করে তাই ব্যবহার করতেন।[২৮] পাঁচ দিরহাম মূল্যের একটা জামা ছিল। সেকালে এটি এতই মূল্যবান ছিল যে, বিয়ের অনুষ্ঠানে নব বধুর জন্য তা ধার নেয়া হতো।[৩৯]

লেবাসে শরীয়তের বিধানের প্রতি এতটা লক্ষ্য রাখতেন যে, একবার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী হাফছা ইবনেতে আবদুর রহমান পাতলা ওড়না পরিধান করে তাঁর সাথে দেখা করতে এলে তিনি এটি ছুঁড়ে ফেলে বলেন, সূরা নূর-এ আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেছেন, তুমি কি পড়নি? অতঃপর একটা মোটা কাপড়ের ওড়না এনে তাকে দেন।[৪০] একবার এক বাসায় বেড়াতে যান। গৃহকর্তার দু'জন যুবতী কন্যাকে ইবনো চাদরে নামায পড়তে দেখে তাকীদ দিয়ে বলেন, আগামীতে বিনা চাদরে কখনো নামায পড়বে না।[৪১]

চরিত্র মাধুর্য

ঘর-সংসার করার পর নারী চরিত্রের সর্ব প্রথম যে জিনিসটির প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তা হচ্ছে স্বামীর আনুগত্য ও তার সন্তুষ্টি বিধান। হযরত আয়েশার মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। রাসূলাল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের

জন্য তিনি রাত-দিন সচেষ্ট থাকতেন, তাঁকে অসন্তুষ্ট দেখলে তিনি অস্থির হয়ে যেতেন।[৪২] নবীজীর নিকটাত্মীয়দের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। তাদের কোন কাজ এড়িয়ে চলতেন না। হযরত আয়েশা সীমাহীন দানশীলতা দেখে বিচলিত হয়ে একদা তাঁর বোনের চেলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের বলেছিলেন যে, তাঁর হাত ইবনোরণ করা উচিত। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি আবদুল্লাহ্র সাথে কথা না বলার কসম করে বসেন। কিন্তু নবীজীর মাতৃকুলের লোকজন সুপারিশ করলে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি।[৪৩] হযরতের বন্ধুদেরও সম্মান করতেন আপনজনের মতোই। যতদূর সম্ভব তাদের কথা রদ করতেন না।[৪৪] যথা সম্ভব কারো হাদিয়া ফেরত দিতেন না। মুহাম্মদ ইবনে আশআস নামে জনৈক সাহাবী তাঁর খেদমতে একটি পুস্তিন পেশ করে অনুরোধ করেন যে, এটা গরম কাপড়, আপনি এটি পরিধান করুন। তিনি গ্রহণ করেন এবং প্রায় সময় ব্যবহার করতেন।[৪৫] পর্দার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। একবার ইবনে ইসহাক নামে জনৈক অন্ধ হযরত আয়েশার সাথে সাক্ষাত করতে এলে তিনি পর্দা করেন। ইবনে ইসহাক বললেন, আপনি আমার থেকে পালাচ্ছেন। আমি তো আপনাকে দেখছিনা। জবাবে হযরত আয়েশা বললেন, তুমি আমাকে না দেখতে পেলে কি হবে, আমিতো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।[৪৬]

নারীরা সাধারণত: বেহিসাবী। কিন্তু হযরত আয়েশার মধ্যে অল্পে তুষ্টির গুণটি বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস এবং বিত্ত-বিভবের প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপও করতেন না। ইমাম তিরমিযী যুহ্দ বা দুনিয়া ত্যাগ অধ্যায়ে উল্লেখ করেন যে, আঁ-হযরতের পর একবার তিনি খাবার তলব করেন। অতঃপর বলেন, আমি কখনো তুষ্ট হয়ে খাইনা। কারণ, এতে কান্না আসেনা। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, কেন? বললেন, যে অবস্থায় নবীজী দুনিয়া ত্যাগ করেছেন, তা আমার স্মরণ আছে। খোদার কসম, তিনি দিনে দু'বার তুষ্ট হয়ে গোশত-রুটি খাননি।

তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তার সাথে কথা না বলার কসম করলে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের তাঁর কাছে মাফ চেয়ে নেন। আঁ-হযরতের মাতৃকুলের লোকদের দ্বারা সুপারিশ করালে তিনি কেঁদে বলেন ঃ

اِنِّيْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيْدٌ

–আমি কসম করেছি, আর কসমের বিষয়টি কঠোর।

অবশেষে সাহাবীদের পীড়াপীড়ি এবং সুপারিশে মাফ করে দেন, কিন্তু কসমের কাফফারায় ৪০ জন গোলাম মুক্ত করেন।[৪৭]

একবার রাসূলের দরবারে বনূ শফক গোত্রের একদল প্রতিনিধি উপস্থিত হয়; কিন্তু তিনি তখন বাসায় ছিলেন না। হযরত আয়েশা তাদের জন্য তখনই খোরবুজা (এক প্রকার খাদ্য) তৈয়ার করার ব্যবস্থা করেন। রাসূলে খোদার আগমনের পূর্বেই তাঁদের মেহমানদারী করান। নবীজী গৃহে পৌঁছে প্রথমেই জানতে চান মেহমানদারীর ব্যবস্থা হয়েছে কি না। তারা জানালেন যে, সে সব সম্পন্ন হয়েছে।[৪৮]

একদিন তিনি রোযা ছিলেন। ঘরে একটা রুটি ছাড়া খাবার আর কিছুই ছিল না। এ সময় এক মিসকীন নারী উপস্থিত হলে তাকে রুটিটি দেওয়ার জন্য তিনি খাদেমাকে নির্দেশ দেন। খাদেমা আরয করলো, তবে কি দিয়ে ইফতার করবেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ রিজিকের যিম্মাদার। বিকেলে কোন একজন বকরীর গোশ্ত প্রেরণ করে। তিনি খাদেমাকে ডেকে বললেন, এই নাও। এতো তোমার রুটির চেয়ে উত্তম।[৪৯]

হযরত উম্মে হানীর বর্ণনা অনুযায়ী নবীজী কেবল একবার ইশ্রাকের নামায পড়েছেন। কিন্তু অনেক সাহাবা নিয়মিত তা আদায় করতেন। হযরত আয়েশা বলেন, আমি নবীজীকে কখনো ইশরাকের নামায পড়তে না দেখলেও আমি নিজে তা পড়ি। তিনি অনেক কিছু পছন্দ করতেন উম্মতের ওপর ফরয হয়ে যাবে এ আশংকায় তদনুযায়ী আমল করতেন না।[৫০]

রাসূলে খোদা তাহাজ্জুদের নামাযে সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান এবং সূরা নিসা পুরো পড়তেন। ভয় ভীতির কোন আয়াত এলে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করতেন এবং তা থেকে পানাহ চাইতেন। সুসংবাদের আয়াতেও দোয়া করতেন এবং এ জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেন। হযরত আয়েশা গোটা রাত তাহাজ্জুদের নামাযে রাসূলের সাথে শরীক থাকতেন।[৫১]

দুশমনের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করাও তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর আপন ভাই মোহাম্মদ ইবনে আবূ বকরকে হযরত মু'আবিয়া ইবনে খাদীজ হত্যা করেন। একদা কোন যুদ্ধে তিনি সিপাহসালার নিযুক্ত হন। হযরত আয়েশা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, এ যুদ্ধে সৈন্যদের সাথে মু'আবিয়ার আচরণ কেমন ছিল। তিনি বললেন, তাঁর মধ্যে কোন দোষ নেই। সকলেই

তার প্রতি সন্তুষ্ট। কারো উট মারা গেলে তিনি তাকে অন্য উট দিতেন। কারো ঘোড়া মারা গেল তাকে অপর ঘোড়া দিতেন। কারো ভৃত্য পলায়ন করলে তাকে অপর ভৃত্য দিতেন। এ সব শুনে হযরত আয়েশা বলেন, তিনি আমার ভাইকে হত্যা করেছেন এ কারণে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টি বা বিদ্বেষ পোষণ থেকে আমি আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাই। আমি নিজে রাসূলে খোদাকে এ দোয়া করতে শুনেছি– হে খোদা! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের সাথে কোমল আচরণ করে, তুমিও তার সাথে কোমল আচরণ করো। আর যে আমার উম্মতের সাথে কঠোরতা করে তুমিও তার সাথে কঠোরতা করো।[৫২]

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা:) আবিসিনিয়ায় ইনতিকাল করেন। তাঁর লাশ মক্কায় এনে দাফন করা হয়। হযরত আয়েশা ভালোবাসার টানে তার কবরে গমন করেন এবং বলেন, আমি মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকলে সেখানেই তোমার লাশ দাফন করতাম, যেখানে তোমার ইনতিকাল হয়েছে। তাহলে আমি তোমার যিয়ারতে আসতাম না।[৫৩] তার ভাই মোহাম্মদ ইবনে আবূ বকর এর সন্তানেরা এতীম হয়ে গেলে হযরত আয়েশা নিজে তাদের প্রতিপালন করেন।[৫৪]

একদা জনৈক ভিক্ষুক দরজায় হাযির হলে তিনি এক খন্ড রুটি দিয়ে বিদায় করেন। এরপর একজন সুবেশী মুসাফির হাজির হলে তাকে বসতে দিয়ে কাবাব দেন। এ পার্থক্যের জন্য কেউ আপত্তি জানালে তিনি বলেন, রাসূলে খোদা বলেছেন: –اَنْزِلُوْا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ –মানুষের সাথে আচরণ করবে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী।[৫৫]

হযরত আয়েশা গীবত, পরনিন্দা এবং কটুক্তি থেকেও কঠোরভাবে বিরত থাকতেন। তিনি কখনো কারো ক্ষতি করেননি। হাদীস গ্রন্থে তাঁর অসংখ্য বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, এর কোন একটিও এমন নেই, যদ্দারা কারো অবমাননা বা কাউকে মন্দ বলা প্রকাশ পায়। তিনি সতীনদের সাথেও হাসীখুশী জীবন কাটাতেন। তাদেরকে কোন অভিযোগের সুযোগ দিতেন না। বরং তিনি তাদের ফযীলত ও গুণাবলীর কথা প্রকাশ করতেন। যাদের দ্বারা তিনি দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন, তিনি তাদেরকেও মন্দ বলেননি। অপবাদ আরোপের ঘটনায় এক হিসেবে হযরত হাসসান ইবনে সাবেত এর ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হয়। এতে হযরত আয়েশা মনে অত্যন্ত আঘাতও পেয়েছেন। কিন্তু

এরপরও তিনি তাঁর সম্মান করতেন, তাঁকে কাছে বসাতেন। এক বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত হাসসান ইবনে সাবেত দৃষ্টিশক্তি হারাবার পর একবার হযরত আয়েশার অনুমতি নিয়ে তাঁর খেদমতে হাযির হন। তিনি সম্মানের সাথে তাঁকে বসতে দেন। তিনি চলে গেলে অন্যরা বলে–ইনিও কি সাহাবী? হযরত আয়েশা বললেন, এ কবিতাটি কি তাঁর নয়?

فَانَّ اَبِىْ وَ وَالِدَهُ وَ عِرْضَىْ– لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءٌ.

–হযরত মুহাম্মদ (সা:)এর মান সম্মানের জন্য আমার পিতা-মাতা এবং মান-মর্যাদা উৎসর্গীকৃত।

তাঁর সমস্ত গুনাহ মাফের জন্য এ কবিতাটিই যথেষ্ট বলে হযরত আয়েশা উল্লেখ করেন।[৫৬]

অপবাদের ঘটনার পরিসমাপ্তির পর হযরত হাসসান ইবনে সাবেত তাঁর অপরাধের কাফফারায় হযরত আয়েশার প্রশংসায় রচিত তাঁর কাসীদার কয়েকটি পংক্তি হযরত আয়েশাকে শোনান। এ সব কাসীদার একটি ছিল এই–

حِصَانٌ رِزَانٌ مَاتُزَنُّ بِرِيْبَةٍ–

وَتُصْبِحُ غَرْقَىْ مِنْ لُحُوْمِ الْحَوَافِلِ.

–তিনি নিষ্পাপ, মর্যাদাবান এবং সন্দেহমুক্ত। তিনি কখনো নারী দেহের গোশ্‌ত খান না। (অর্থাৎ তাদের বদনাম করেন না)।

পংক্তিটি শুনে হযরত আয়েশা কেবল এ টুকুই বলেন– কিন্তু তুমিতো এমন নও।[৫৭] হযরত আয়েশার কোন কোন ভক্ত অপবাদে অংশ নেয়ার জন্য হযরত হাসসানের নিন্দা করতে চাইতেন। হযরত আয়েশা কঠোরভাবে তাদেরকে বারণ করেন। তিনি বলেন, তাকে গাল-মন্দ দিবে না। কারণ, তিনি নবীজীর পক্ষ থেকে মুশরেক কবীদের জবাব দিতেন।[৫৮]

হযরত আয়েশার দানশীলতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। তিনি অতি উদার হস্তে খোদার পথে ব্যয় করতেন। কম-বেশির চিন্তা করতেন না; যা কিছু সামনে পেতেন, অভাবীকে দান করতেন। একবার ইবনে যুবায়ের হযরত আয়েশার নিকট এক লাখ দিরহাম প্রেরণ করেন। তিনি সেদিন

রোজা ছিলেন। তখনই সব দান করে দেন। সন্ধ্যা হলে উম্মে দাররা বললেন, উম্মুল মু'মেনীন! এ অর্থ থেকে কিছু গোশ্‌তও তো আনাতে পারতেন। জবাবে বললেন, তুমি স্মরণ করিয়ে দিলে না কেন?[৫৯]

একদা হযরত মুনকাদের ইবনে আবদুল্লাহ্ হযরত আয়েশার খেদমতে হাজির হন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোন সন্তানাদী আছে? তিনি বললেন, না। হযরত আয়েশা বললেন, আমার কাছে দশ হাজার দিরহাম থাকলে তোমাকে দিয়ে দিতাম। সৌভাগ্য বশতঃ সেদিন বিকেলে আমীর মু'আবিয়া তাঁর কাছে কিছু অর্থ পাঠান। বললেন, কত তাড়াতাড়ি আমার পরীক্ষা হচ্ছে। তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে হযরত মুনকাদেরকে ডেকে আনালেন। তাঁকে দশ হাজার দিরহাম দান করলেন। তিনি এ অর্থ দিয়ে একটি দাসী ক্রয় করেন। এ দাসীর গর্ভে অনেক সন্তান জন্ম নিয়েছে। মুসতাদরাকে হাকেমেও এ বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে।

তিনি আল্লাহ্‌কে খুব ভয় করতেন। তাঁর অন্তর ছিল অতি কোমল। হযরত ওসমান (রা:) যখন শহীদ হন, তিনি তখন মক্কায় ছিলেন। তালহা এবং যুবায়ের মদীনা থেকে মক্কায় পৌঁছে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলে তিনি সংশোধন চেষ্টায় বসরা গমন করেন এবং সেখানে হযরত আলীর সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। হযরত আয়েশা উটের পিঠে বসে যুদ্ধ করেন বলে এ যুদ্ধ উষ্ট্রের যুদ্ধ নামে খ্যাত। ঘটনাচক্রে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরে এতে অংশ গ্রহণের কথা মনে পড়লে তাঁর প্রাণ বিগলিত এবং মন বিচলিত হতো। তিনি শিশুর মতো কেঁদে ফেলতেন।[৬০] এ ভুলের জন্য তিনি সব সময় অনুতাপ করে বলতেন, আজ থেকে ২০ বৎসর পূর্বে আমি যদি তিরোহিত হতাম!

নবীজী এ উষ্ট্রের যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করেই স্ত্রীদেরকে বলেছিলেন, এতে তোমাদের একজন উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বসবে। এর আশ-পাশে অনেকেই নিহত হবে। এরপরই হবে তার মাগফিরাত।[৬১]

তিনি রাত্রিবেলা একা কবরস্তানে গমন করতেন। তিনি যে কতটা সাহসী ছিলেন, এ থেকেই তা অনুমেয়। খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন চারিদিক থেকে মুশরেকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যায়, আর শহরের অভ্যন্তরে ইহুদীদের হামলার আশংকা দেখা দেয়, তখন তিনি নির্দ্বিধায় দুর্গের বাইরে এসে যুদ্ধের মানচিত্র দেখতেন।[৬২] ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানরা যখন অস্থির,

হযরত আয়েশা তখন পৃষ্ঠে মশক বহন করে পানি পান করানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[৬৩]

ফযীলত-বৈশিষ্ট্য

হযরত আয়েশা (রা:) আল্লাহ্‌র দরবার থেকে কেবল নারীদের ওপর মর্যাদা বা ফযীলত লাভ করেননি, বরং ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য এবং পূর্ণতার বিচার-বিবেচনায় কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী এবং মহিলা সাহাবীর চেয়ে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান-বুদ্ধি, শরীয়তের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং প্রজ্ঞা-বিচক্ষণতায় তিনি যে বৈশিষ্ট্য লাভ করেন, তা অন্যদের মধ্যে ছিল বিরল। দ্বীনি শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়াও তাঁর মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যা তাঁকে অন্যান্য স্ত্রীদের ওপর বিশিষ্ট মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। তাঁর গলার হার হারিয়ে যাওয়া উপলক্ষ্যে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হওয়া মুসলমানদের জন্য রহমতের কারণ হয়েছে।[৬৪] নবুওয়াতের আস্তানায় তাঁর প্রবেশের সুসংবাদ নবী করীম (সা:)কে দেওয়া,[৬৫] তাঁর শয্যায় ওহী নাযিল হওয়া,[৬৬] হযরত জিব্‌রাঈল (আ:) কর্তৃক তাঁর কাছে সালাম পাঠানো, হযরতের দু'দফা তাঁকে স্বপ্নে[৬৮] দেখা ইত্যাদি দ্বারা হযরত আয়েশার মর্যাদা প্রকাশ পায়। কাম ইবনে মোহাম্মদের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আয়েশা নিজেই বলেছেন, আমার মধ্যে এমন দশটি গুণাবলী রয়েছে যেগুলোর কারণে অন্যান্য স্ত্রীদের ওপর আমার প্রাধান্য সূচীত হয়–

এক. আমি ছাড়া অন্য কোন কুমারী নারী নবীজীর বিবাহ বন্ধনে আসেননি।

দুই. নবীজীর স্ত্রীদের মধ্যে কেবল আমারই এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, আমার পিতা-মাতা উভয়ই মোহাজির।

তিন. মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিষ্কলুষতায় কুরআন মজীদের আয়াত নাযিল করেছেন।

চার. হযরত জিব্‌রাঈল (আ:) আমার রূপ ধারণ করে নবীজীর নিকট আগমন করবে বলেন, আয়েশাকে বিবাহ করুন।

পাঁচ. আমি তাঁর সামনে থাকতাম আর তিনি নামায পড়তেন।

ছয়. ওহী নাযিলের সময় কেবল আমিই তাঁর কাছে থাকতাম।

সাত. যখন রাসূলের রূহ মোবারক ঊর্ধ্বলোকে উড়ে যায়, তখন তাঁর মাথা ছিল আমার বুকের উপর।

আট. আমি এবং নবীজী একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম।

নয়. যে রাত্রে আমার পালা ছিল, সে রাত্রে নবীজী ইন্তিকাল করেন।

দশ. আমার হুজরা নবীজীর দাফন স্থান হওয়ার গৌরব লাভ করেছে।[৬৯]

ইতিহাস এবং হাদীসগ্রন্থ সাক্ষী, এসব গুণাবলীতে অপর কোন স্ত্রী হযরত আয়েশার শরীক ছিল না।

ওরওয়া বলেন, হযরত আয়েশার মধ্যে আর কোন গুণাবলী না থাকলেও কেবল অপবাদের ঘটনাই তাঁর মর্যাদা-শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ, এ উপলক্ষে তাঁর জন্য কুরআন মজীদের আয়াত নাযিল হয়েছে, যা কেয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হবে।[৭০] নবীজী বলতেন ঃ

فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .

–সমস্ত নারীদের ওপর আয়েশার এমন শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, যেমন সমস্ত খাদ্যের ওপর সারীদের[৭১] শ্রেষ্ঠত্ব আছে।[৭২]

তাঁর ব্যক্তিগত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে এবার বিশেষজ্ঞদের অভিমত লক্ষ্য করুন:

মাসরূক তাবেঈকে কেউ জিজ্ঞেস করে, আয়েশা কি 'ফরায়েয' সম্পর্কে অবহিত ছিলেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لَقَدْ رَأَيْتُ شَيْخَةَ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ صَلْعَمُ الاَكَابِرَ يَسْئَلُوْنَهَا عَنِ الْفَرَائِضِ.

–যার হাতে আমার জীবন নিহিত, তাঁর শপথ-আমি বড় বড় সাহাবীকে তার কাছে ফারায়েয সম্পর্কে, জিজ্ঞেস করতে দেখেছি।[৭৩]

এ মাসরূক সম্পর্কেই আফ্ফান ইবনে মুসলেমের বর্ণনা এই যে, হযরত আয়েশা থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করে তিনি বলতেন:

حَدَّثَتْنِىْ الصَّادِقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيْقِ الْمُبَرَّاةُ كَذَا وَكَذَا.

–সত্যবাদীর কন্যা সত্যবাদিনী- যার নিষ্কলুষতা সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে– আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে–

ইমাম যুহ্‌রী বলেন ঃ

لَوْ جُمِعَ عِلْمُ النَّاسِ كُلُّهُمْ وَعِلْمُ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلْعَمْ فَكَانُ عَائِشَةً اِلاَّ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا.

–সকল পুরুষ এবং উম্মুল মু'মেনীনদের সকলের এলেম একত্র করা হলে হযরত আয়েশার এলেম হবে তাদের সবার চেয়ে বেশি।[৭৫]

হযরত আবূ মূসা আশআরী বলতেন,

مَااَشْكَلَ عَلَيْنَا اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلْعَمَ حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَئَلْنَا عَائِشَةَ اِلاَّ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا.

–ওরওয়া ইবনে যুবায়ের বলেন:

مَاوَجَدْتُ اَعْلَمَ بِفِقْهِ وَلاَبِطِبِّ وَلاَبِشِعْرٍ مِّنْ عَائِشَةَ.

ফিক্‌হ, তিব এবং কবিতা সম্পর্কে হযরত আয়েশার চেয়ে বেশি জ্ঞানী কাউকে আমি দেখতে পাইনি।[৭৭]

এ ওরওয়া তার পিতার উধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, অধিকন্তু হযরত আয়েশা ৬০-৭০ এমন কি শত শত কাসীদা মুখস্ত শুন্‌তেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের পুত্র আবূ সালমা ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী। তিনি বলেন ঃ

مَارَئَيْتُ اَحَدًا اَعْلَمَ بِسُنَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلْعَمَ وَلاَاَفْقَهَ فِىْ رَأىٍ اِنِ احْتَيْجَ اِلى رَايِهِ وَلاَاَعْلَمَ بَايَةٍ فِيْمَا نَزَلَتْ وَلاَ لِفَرِيْضَةٍ مِنْ عَائِشَةَ.

হযরত আয়েশার চেয়ে সুন্নাতে নববীর বড় আলেম, দ্বীনের সূক্ষ্মতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ, কালামে মজীদের আয়াতের শানে নুযূল এবং ফারয়েয সম্পর্কে বেশি জ্ঞানের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি।[৭৮]

'আতা' ইবনে আবূ রাবাহ বলেন ঃ

كَانَتْ عَائِشَةُ اَفْقَهَ النَّاسِ وَاَحْسَنَ النَّاسِ وَاَعْلَمَ النَّاسِ رَأيًا فِيْ الْعَامَّةِ.

হযরত আয়েশা ছিলেন সবচেয়ে বড় ফকীহ, সবচেয়ে উত্তম মানুষ এবং লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সুস্থ মতের অধিকারিণী।[৭৯]

একদিন আমীর মু'আবিয়া তাঁর দরবারে জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন; সবচেয়ে বড় আলেম কে? তিনি বললেন, আমীরুল মু'মেনীন! আপনি নিজে। তিনি বললেন, না আমি কসম করে বলছি, সত্য সত্য বল। তিনি বললেন, সত্য বলছি, হযরত আয়েশা।

একটি পর্যালোচনাঃ

হযরত আয়েশার জীবন চরিত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কেবল মহিলা সাহাবী হিসেবেই নয়, বরং সাহাবায়ে কেরামের তুলনা ও তার মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, দার্শনিকসুলভ মন-মস্তিষ্ক নিয়ে তাঁর জন্ম হয়েছিল। দ্বীনের সূক্ষ্মজ্ঞান, ইজতিহাদের ক্ষমতা, যাচাই-বাছাইয়ের যোগ্যতা, নানা ঘটনা যথাযথভাবে স্মরণ রাখা এবং পুংখানুপুংখ বর্ণনা করা, সুস্থ চিন্তা এবং সঠিক মতামত ব্যক্ত করায় তাঁর মর্যাদা ছিল অনেক উর্ধ্বে। তিনি যা কিছু বলতেন, যে ব্যাখ্যা করতেন, তা ছিল সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক এবং যুক্তিনির্ভর। তার এমন বর্ণনা খুব কমই পাওয় যাচে, যা বিশ্বাস করার জন্য অহেতুক ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে।

সন্দেহ নেই যে, তিনি রাসূলে খোদার সান্নিধ্যে আসার কারণে তার কথা ও কাজ পর্যবেক্ষণ করার ভালো সুযোগ পেয়েছিলেন। আমরা জানি যে, তিনি ছাড়া আরো অনেকেরই এ সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এতে হযরত আয়েশার মানসিক শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট ধরা পড়ে। একটা কথা রাসূলে খোদার যবান মোবারক থেকে হযরত আয়েশা ছাড়া অন্যরাও শুনতো; কিন্তু তা থেকে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌছতেন এবং তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যেভাবে তার মন-মানসে পৌছত, অন্যদের পক্ষে তা সম্ভব হতো না।

তিনি ছিলেন অন্ধ অনুকরণের ঘোর বিরোধী। রাসূলে খোদার কথা ও কাজের সত্যিকার তাৎপর্যে উপনীত হওয়ার জন্য সর্বদা চেষ্টা করতেন তিনি। তাই পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, শরীয়তের সবচেয়ে যুক্তিযুক্তের

অনুবর্তনের যে প্রবল ধারা তার বর্ণনা থেকে প্রতিভাত হয়, তা সাধারণত অন্য কারো বর্ণনায় পরিলক্ষিত হয় না।

রাসূলে খোদার মোবারক যুগে নারীদের জন্য মসজিদে নামায পড়ার অনুমতি ছিল। সে মতে হযরত আয়েশা এটাকে সব সময়ের জন্য জায়েয বলবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু এ অনুমতি স্বভাবত: কত সময়ের জন্য হতে পারে, সে সম্পর্কে তিনি ভালোভাবে ওয়াকেফ ছিলেন। তাই পরবর্তী যুগে নারীদের পতন লক্ষ্য করে তিনি বলেন:

لَوْاَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلْعَمْ مَا اَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مَنَعَ نِسَاءَ بَنِى اِسْرَائِيل

রাসূলে খোদা যদি জানতেন, নারীদের কি দশা হবে, তাহলে তিনি বনী ইসরাইলের মতো নারীদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন।

ইবাদাতে শিরক থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য ইসলামে যতটা সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, তা কারো নিকট গোপন নয়। এ ব্যাপারে হযরত ওমরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে গাছটির নিচে বায়আতুর রিদওয়ান সম্পন্ন হয়েছে, তা কেটে ফেলেন এ আশংকায়, যাতে লোকেরা পরবর্তীতে এ গাছটিকে মোবারক ভাবত শুরু না করে। এ ব্যাপারে হযরত আয়েশাও ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। তাঁর সময়ে কা'বা শরীফের চাবীধারী ছিলেন ইবনে ওসমান। তিনি হযরত আয়েশাকে বলেন যে, কা'বা শরীফের গেলাফ নামানোর পর তা দাফন করে দেয়া হয়, যেন মানুষের নাপাক হাত তা স্পর্শ করতে না পারে। হযরত আয়েশা বলতেন, এটাতো কোন যুক্তিযুক্ত কথা হলো না। গেলাফ খুলে ফেলার পর যার ইচ্ছা তা ব্যবহার করতে পারে। তুমি তা বিক্রি করে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে তার মূল্য বিতরণ করে দাওনা কেন?[৮০]

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, দ্বীনের সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুধাবন এবং বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগে কালামে এলাহীর মর্মোদ্ধারের পূর্ণ জ্ঞান তাঁর ছিল। কখনো এমন বিষয় উত্থাপিত হলে তার মুজতাহিদসুলভ অভিমত দ্বারা উচ্চ মর্যাদা পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রমাণিত হতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মৃত ব্যক্তির শ্রবণ সম্পর্কে হযরত ওমরের একটি বর্ণনা রয়েছে। তাঁর জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলে খোদা বলেন,

مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لاَيُجِيْبُوْنَ.

তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শোন না, কিন্তু তারা জবাব দেয় না।

এ বর্ণনা শুনে হযরত আয়েশা বলেন, এটা রাসূলের বাণী নয়। কারণ, এর বিরুদ্ধে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত রয়েছে:

وَمَااَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِيْ الْقُبُوْرِ. (فاطر : ٢٢)

যারা কবরে রয়েছে, তুমি তাদেরকে শুনাতে পার না।

কুরআনে আরও বলা হয়েছে:

اِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتٰى. (النمل : ٨٠)

তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পার না।[৮১]

এমনিভাবে শবে মে'রাজের ঘটনায় আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন এবং পরিবার-পরিজনের কান্নাকাটির ফলে মৃত ব্যক্তির আযাবের বিষয়টি উত্থাপিত হলে তিনি দর্শন সম্পর্কে কালামে মজীদের আয়াত–

لاَتُدْرِكُهُ الاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاَبْصَارَ.

চক্ষু তাঁকে দেখতে পায় না এবং তিনি চক্ষুকে দেখতে পান। (সূরা আনআম, আয়াত–১০৩)

এবং দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ মুর্দার শাস্তি সম্পর্কে–

لاَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى . (بني اسرائيل : ١٥)

কোন ভার বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করে না। (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত–১৫)

পেশ করে, কেবল কালামে এলাহী সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয়ই দেননি, বরং কার্যতঃ এটাও বলে দিয়েছেন যে, শরীয়তের ব্যাপারে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়। বিচার বুদ্ধি কি ধরনের হওয়া দরকার, তাও তিনি বলে দিয়েছেন।

তিনি কেমন পরিপূর্ণতার মাধ্যমে ইসলামের সত্যিকার প্রাণসত্তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর জীবনের কোন কোন ঘটনা থেকে তারও

প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূলে খোদার সমস্ত শিক্ষা এবং প্রতিটি কার্যধারা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে যার পরনাই সরলতা অবলম্বিত হয়েছে। আর এজন্যই ইসলামকে বলা হয় স্বভাব ধর্ম। এ সূক্ষ্ম তত্ত্বটি হযরত আয়েশা সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। এটা কেবল তারই পক্ষে সম্ভব। তার সময়ে ইবনে আবূস সায়েব তাবেঈ ওয়ায-নিছহতে বড় আগ্রহী ছিলেন। প্রত্যেক নামাযের পর তিনি ছন্দোবদ্ধ ভাষায় দোয়া করতেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। হযরত আয়েশা জানতে পেরে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, সপ্তাহে একদিন, কিম্বা বড়জোর তিন দিনের বেশি ওযায করবে না।সংক্ষিপ্ত দোয়া করবে। ছন্দোবদ্ধ ভাষা কোন প্রয়োজন নেই। ওয়ায-তালকীন এবং দীর্ঘ দোয়া দ্বারা লোকদের ঘাবড়ে দেয়া রাসূলে খোদা এবং তার সাহাবীদের নীতি ছিল না।[৮২]

হযরত আয়েশা ইচ্ছে করলে কেবল এতটুকুই বলতে পারতেন যে, ওয়ায সক্ষিপ্ত করবে। কিন্তু তিনি লম্বা-চওড়া দোয়ার রহস্য উদঘাটন করে ছন্দোবদ্ধ ভাষা ব্যবহার করতে বারণ করেন। কারণ, তিনি জানতেন, দোয়া দীর্ঘ করার কারণ কি।

আমরা এখানে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য, চিন্তার বিশুদ্ধতা, অভিমতের পরিচ্ছন্নতা এবং দ্বীনের সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুধাবনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি।[৮৩]

এক. ফজরে নামাযে পর্যাপ্ত সময় থাকা সত্ত্বেও কেবল দু'রাকাত ফরয এবং দু'রাকাত সুন্নতের বিধান রয়েছে। বাহ্যত: এর কোন যুক্তি বুঝা যায় না। এ সম্পর্কে হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যেহেতু পজরের নামাযে কেরায়াত দীর্ঘ করা হয়, তাই বেশি রাকয়াতের বিধান করা হয়নি।

দুই. হযরত ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আসর এবং ফজরের নামাযের পর আর কোন নামায পড়া যাবে না। বাহ্যত: এ নিষেধের কোন কারণ বুঝা যায় না। কিন্তু হযরত আয়েশা এর কারণ উল্লেখ করে বলেন, কেউ সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় নামায পড়লে সূর্য পূজারীদের সাথে সাদৃশ্য হবে। তাই তা থেকে নিবৃত্ত করার জন্যই এ সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তিন. আজকাল নফল নামায সাধারণত: বসে পড়া হয়। কারণ, কোন কোন হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নবীজী নফল নামায বসে পড়তেন। জনৈক ব্যক্তি এ ব্যাপারে হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটা সে সময়ের কথা, যখন নবীজী দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

চার. একবার রাসূলাল্লাহ্ (সা:) নির্দেশ দেন যে, কোরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি রাখা যাবে না। কোন কোন সাহাবী মনে করলেন, এ নির্দেশ বুঝি সব সমেয়র জন্য। আর কেউ কেউ মনে করলেন যে, এটা সাময়িক নির্দেশ, তিনি এর যুক্তিপূর্ণ কারণ উল্লেখ করে বলেন, তখন খুব কম লোকই কোরবানী করতে পারতো, তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে কোরবানী করতে অক্ষম ব্যক্তিরাও কোরবানীর গোশ্ত পেতে পারে।

পাঁচ. মক্কা শরীফের নিকটে মুহাচ্ছার নামে একটা উপত্যকা আছে, হজ্জের সময় নবীজী (সা:) এখানে অবস্থান করেছেন এ কারণ পরবর্তীকালে সাহাবীরাও এখানে অবস্থান করেন। এমনিক হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরাতো এখানে অবস্থানকে হজ্জের সুন্নাতের মধ্যে গণ্য করেন। হযরত আয়েশা ছিলেন এর বিরোধী। তিনি বলতেন, এখানে অবস্থানকে হজ্জের সুন্নাতের মধ্যে শামিল করা ঠিক নয়। কারণ, এখান থেকে হজ্জের জন্য রওয়ানা হওয়া হতো– এজন্য এখানে অবস্থান করতেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে অবস্থান উত্তম– এ নিয়তে নয়।

ছয় যে আয়াতে চার স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে, তার ভাষা হচ্ছে এই:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّتُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ (النساء : ٣)

তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, এতীমের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে নারীদের মধ্য থেকে

যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয়, দুই-দুই, তিন-তিন এবং চার-চার জনকে বিবাহ করতে পার। (সূরা নিসা, আয়াত–৩৩)

বাহ্যত: এ আয়াতের অর্থ অনেক অস্পষ্ট। এতীমদের সাথে ইনসাফ এবং চার বিয়ের অনুমতির বৈধতা দুর্বোধ্য। হযরত ওরওয়া এ ব্যাপারে হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কোন কোন এতীম বালিকা সম্পত্তির ব্যাপারে ওলী-অভিভাবকের সাথে শরীক থাকে এবং তারা এদেরকে বিয়ে করে কম মোহর দেয়। এমন পরিস্থিতিতে তাদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এটা ইনসাফের পরিপন্থী।

সাত. কুরআন মজীদের একটি আয়াতে আছে ঃ

حَتّٰى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا

এমনিক যখন রাসূলগণ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা মনে করে বসেছিলেন যে, তাদের সাথে মিথ্যা বলা হয়েছে– তখন আমাদের সাহায্য এসেছে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত–১১০)

হযরত ওরওয়া হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেন, এ আয়াতে 'কুযেবু' না 'কুয্‌যেবু'। তিনি বললেন, কুয্‌যেবু। তিনি বললেন, মিথ্যা প্রতিপন্ন করার তো নিশ্চয়তা ছিল তাহলে এর সাথে ظَنُّوْا (ধারণা করেছে)– এর কি প্রয়োজন ছিল? হযরত আয়েশা বললেন, পয়গাম্বর কি খোদার সম্পর্কে এ ধারণা করতে পারেন যে, খোদা তাঁর সাথে মিথ্যা ওয়াদা করছেন। ওরওয়া জিজ্ঞেস করেন, তাহলে এর অর্থ কি? তিনি বললেন, এটা পয়গাম্বরের অনুসারীদের সম্পর্কে। তারা যখন ঈমান এনেছে এবং জাতির লোকেরা তাদেরকে যখন উত্যক্ত করেছে এবং খোদার সাহায্যে বিলম্ব দেখা যাচ্ছে, তখন পয়গম্বররা ভাবলেন যে, এ বিলম্বের কারণে ঈমানদাররাও যেন আমাদেরকে অস্বীকার না করে বসে, এমন অবস্থায় তাদের কাছে খোদার সাহায্য পৌঁছেছে।

আট. মোতআ বিবাহ সম্পর্কে তখন পর্যন্ত কারো কারো মতদ্বৈততা ছিল এবং এর সম্পর্কে নানা হাদীসও উত্থাপন করা হতো। কিন্তু হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে কেন সাহায্য নাও না?

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُوْنَ . الاَّ عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اوما مَلَكَتْ اَيمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ (المؤمنون : ٤)

এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাযত করে আপন স্ত্রী-দাসী ছাড়া, তাদের জন্য কোন তিরস্কার নেই (অর্থাৎ যারা নিজেদের স্ত্রী এবং দাসী ছাড়া অন্য কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে না, তারা তিরস্কার মুক্ত) (সূরা মোমিনূন, আয়াত–৫, ৬)

তিনি কোন মন-মানস এবং মেধা-প্রতিভার অধিকারীণী ছিলেন, তিনি কতো দূরদর্শী ছিলেন, তাঁর দৃষ্টি কতো সুদূরপ্রসারী ছিল, এসব ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণত: দেখা যায় এবং এটাই স্বাভাবিক যে, কিছু লোক দার্শনিক সুলভ মন-মানসের অধিকারী হয়ে থাকে। আর এমন লোকেরা ধর্মীয় বিধানের ব্যাপারে বেপরোয়া এবং উদাসীনই থাকে। সব কিছুকেই জ্ঞানের আলোকে দেখার কারণে তারা অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা করে এবং শেষ পর্যন্ত এরা তাকওয়ার সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় না। এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা ছিলেন রীতিমতো ব্যতিক্রম। এত কিছুর পরও তাক্‌ওয়ার প্রতি তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন।

আরবের বাইরের দেশ বিজয়ের পর নুতন নুতন শরাবের নুতন নুতন নাম সম্পর্কে আরবরা পরিচিত হলে এসবের হালাল-হারাম সম্পর্কে তাদের জানারও প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ, আরবে কেবল আঙ্গুরের শরাবকেই খামর বলা হতো। আর এখন তাদের সামনে এসছে অনেক নুতন নুতন শরাব। তাই হযরত আয়েশা বললেন, তোমরা শরাবের পাত্রে খেজুর পর্যন্ত ভেজাবেনা। নারীদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, তোমাদের মশকের পানি থেকে নেশা সৃষ্টি হলে তাও হারাম। রাসূলে খোদা (সা:) সাধারণত: যে কোন নেশাদার বস্তুকেই হারাম বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৮৪]

আরবের বদ রসমের সাথে টোটকারও প্রচলন ছিল। বিশেষ করে নারীদের মধ্যে এ প্রথাটি ছিল ব্যাপক। কিন্তু নিজে নারী হওয়া সত্ত্বেও হযরত আয়েশা টোটকাকে খুব খারাপ মনে করতেন। একবার কোন এক শিশুর শিয়রে ক্ষুর[৮৫] রাখা হয়েছে দেখে তিনি নিষেধ করে বলেন, রাসূলে খোদা (সাঃ) টোটকার ঘোর বিরোধী ছিলেন।[৮৬] এসব গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে এমন একটা বিশেষ গুণও ছিল, যার জন্য আরব দেশের নারী-পুরুষ সকলে খ্যাত ছিল অর্থাৎ বিপদের সময় তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। যুদ্ধের ময়দানে পৃষ্ঠে মশক বহন করে তিনি আহতদেরকে পানি পান করাতেন।[৮৭]

দুনিয়ার সাধারণ ভদ্রতা সম্পর্কেও তিনি ছিলেন গর্বের ধন। তালহার কন্যার নামও ছিল আয়েশা। তিনি নিজেই এর লালন-পালন করেন। মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর কাছে আসতেন, চিঠি পত্র লিখতেন এবং উপহার-উপঢৌকন পাঠাতেন। হযরত আয়েশাকে এসব জানান হলে তিনি বলেন, চিঠি পত্রের জবাব দেবে এবং উপহারের জবাবে উপহার পাঠাবে।[৮৮]

রাবীদের শ্রেণীতে হযরত আয়েশার মর্যাদা অতি উচ্চে। হযরত আবূ হোরায়রা এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ছাড়া আর কারো কাছ থেকে এত অধিক পরিমাণ বর্ণনা পাওয়া যায় না। হযরত আবূ হোরায়রার বর্ণনা সবচেয়ে বেশি–৫৩৭৪টি। এরপরই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের স্থান ২৬৬০টি। অতঃপর হযরত আয়েশার স্থান। তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২ হাজার ২শত ১০টি।

ওফাতের ঘটনা

হিজরতের ৯ বৎসর পূর্বে হযরত আয়েশার জন্ম এবং হিজরী ৫৮ সালে ইনতিকাল হয়েছে, এ ব্যাপারে সকলেই একমত। এ হিসেবে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৭ বৎসর। তিনি অতীব প্রশংসা পছন্দ করতেন না। তাই তোষামোদকারীদেরকে সাক্ষাৎ দানে তিনি ইতস্তত করতেন।

তিনি তখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা:) তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি জানতেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস তাঁর প্রশংসা করবেন, তাই তিনি অনুমতি দিতে ইতস্তত করেন। কিন্তু তাঁর প্রশংসা করবেন, তাই তিনি অনুমতি দিতে ইতস্ত ত করেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্নেরা পীড়াপীড়ি করে বললো যে, আপনি উম্মুল মু'মেনীন। তিনি আপনাকে সালাম এবং বিদায় জানাতে এসেছেন। এদের পীড়াপীড়ির জবাবে বললেন, তোমরা ইচ্ছে করলে তাকে আসতে দিতে পার। তাঁকে আসতে দেয়া হলো। তিনি এসেই বললেন, আপনার জন্য সুসংবাদ। হযরত (সা:) এর সাথে আপনার মিলনে দেহ এবং প্রাণ বিরহের বিলম্ব মাত্র! আপনি ছিলেন রাসূলের প্রিয়তমা সহধর্মিনী। সে রাত আপনার গলার হার হারিয়ে গেলে নবীজী তা সন্ধান করেন। আপনার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। জিবরাঈল আমীন আপনার চারিত্রিক নিষ্কলুষতার বাণী বহন করে আসমান থেকে নাযিল হয়েছেন। কুরআনের এসব আয়াত কেয়ামত পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হবে। তিনি বললেন, ইবনে আব্বাস, ইবনে আব্বাস, আমাকে মাফ করবে। সে সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত, আমি যদি অস্তিত্ব লাভ না করতাম। এটাই ছিল আমার পছন্দ।

ইনতিকালের আগে ওছিয়ত করেন, আমাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করবে, যেখানে নবীজীর অন্যান্য স্ত্রীদেরকে দাফন করা হয়েছে। পীড়িত হওয়ার পর বলতেন, হায়, আমি যদি জন্ম না নিতাম, আমি যদি পাথর হতাম, প্রস্তর খন্ড হতাম! কেমন আছেন দর্শনার্থীরা জানতে চাইলে বলতেন, আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি।[৮৯] ৫৮ হিজরীর ১৭ রমযান মঙ্গলবার রাতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৯০] তখন আমীর মুয়াবিয়ার খেলাফত কাল। তাঁর ইন্তিকালের রাত মশাল জ্বালানো হয়। এত প্রচুর পরিমাণ মহিলার আগমন ঘটে, যাতে ঈদ বলে ভ্রম হয়।[৯১]

তার ইন্তিকালে সকলে দুঃখিত হয়। মাসরূক বলেন, নিষিদ্ধ না হলে আমি উম্মুল মু'মেনীনের জন্য মাতমের আয়োজন করতাম।[৯২] ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, হযরত আয়েশার ইন্তিকালে কে কে দুঃখিত হয়েছেন। মাসরূক বলেন, তিনি যাদের মা ছিলেন, তারা সকলেই দুঃখিত হয়েছেন।[৯৩] রাত্রেই দাফন করার জন্য তিনি ওছিয়ত করেছিলেন। তাই সে রাতেই তাকে দাফন করা হয়। তার দাফনে এত

বেশি লোকের সমাগম হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। হযরত আবূ হোরায়রা জানাযার নামায পড়ান। আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের কাসেম ইবনে মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে মোহাম্মদ এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহমান লাশ কবরে রাখেন।[৯৪]

[উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশার জীবনেতিহাস এত বিশাল-বিস্তৃত যে, একটি নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে তা আলোচনা করা অসম্ভব। এজন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রয়োজন। এ এফ এম আব্দুল মজীদ রুশদী প্রণীত গ্রন্থটিতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা স্থান পেয়েছে। এক্ষেত্রে মাওলানা সাইয়্যেদ সুলায়মান নাদ্‌ভী রচিত সীরাতে আয়েশা গ্রন্থখানি অতি মূল্যবান এবং তথ্যবহুল। পাঠক মহল থেকে সাড়া পেলে অদূর ভবিষ্যতে গ্রন্থটি প্রকাশ করার চেষ্টা করা হবে।

[ইন্‌শাআল্লাহ্—অনুবাদক]

১. তবকাতে ইবনে সাআদ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৩, ২. আল এছাবাহ পৃষ্ঠা ৬৯১, ৩. আবূ দাউদ কিতাবুল আদাব. ৪. ছহীহ বোখারী অধ্যায়, বড়দের নিকট ছোটদের বিবাহ দেওয়া, ৫. মুসনাদে ইমাম আহমদ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৪১১, ৬. তবকাতে ইবনে সাআদ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪০, ৭. ঐ পৃষ্ঠা ৪৩, ৮. ছহীহ মুসলিম কিতাবুন নিকাহ্, ৯. তবকাতে ইবনে সা'আদ পৃষ্ঠা ৪০, ১০. ঐ পৃষ্ঠা ৪৪, ১১ ছহীহ বোখারী হিজরত অধ্যায়, ১২. তবকাতে ইবনে সাআদ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৩, ১৩. ঐ পৃষ্ঠা ৪১, ১৪. ঐ পৃষ্ঠা ৪৩, ১৫. ছহীহ বোখারী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৫২. ১৬. গোটা ঘটনা গৃহীত হয়েছে ছহীহ বোখারী, ছহীহ মুসলিম, মুসনাদে ইমাম আহমদ এবং সীরাতে ইবনে হিশাম থেকে. ১৭. আবূ দাউদ, ছহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইলা, ১৮. তবকাতে ইবনে সাআদ ৮ম খন্ড, ১৯. ছহী মুসলিম বাবুল ইলা, ২০. আবূ দাউদ বাবুল কাসমে বাইনায যাওজাত. ২১. তবকাতে ইবনে সাআদ ৮ম খন্ড, ২২. সুনানে নাসাঈ, বাবুল গায়রাত, বাবুদ দোয়ায়ে ফিস সুজুদে, ২৩. আবূ দাউদ কিতাবুল লেবাস, ২৪. আবূ দাউদ কিতাবুত তাহারাত, ২৫. আবূ দাউদ কিতাবুত তাহারাতে মিনান্নাজাসাতে. ২৬. ঐ আদাবুল ফারদে লা ইউযী জারাহু, ২৭. ছহীহ বোখারী অধ্যায় ওফাতুন নবী, ২৮. মুসতাদারাকে হাকেম, ২৯. ছহীহ বোখারী কিতাবুল জানায়েয. ৩০. ছহীহ বোখারী অপবাদ আরোপের ঘটনা, ৩১. আবূ দাউদ, ৩২. মুসনাদে আহমদ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা ১৩৮, ৩৩. ঐ ইফক ও ঈলার ঘটনা, ৩৪. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৯, ৩৫. ঐ পৃষ্ঠা ৪৮. ৩৬. ঐ, ৩৭. ঐ ছহীহ বোখারী, ৩৮. ছহীহ বোখারী, ৩৯. ছহীহ বোখারী বাবুল ইস্তিআরাহ লিল আরূস, ৪০. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫০. ৪১. মুসনাদে ইমাম আহমদ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৭৯৬. ৪২. ঐ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা ১১. ৪৩. ছহী বোখারী, মানাকিবু কুরাইশ. ৪৪. ছহীহ বোখারী বাবুল এতেছাম বিস্‌সুন্নাহ, ৪৫. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৯, ৪৬. ঐ, ৪৭. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, কসম ও মান্নত অধ্যায়, ৪৮. আবূ দাউদ কিতাবুত তাহারাত, ৪৯.মুয়াত্তা ইমাম মালেক অধ্যায় ছদকার জন্য উৎসাহ দান, ৫০. ছহীহ মুসলিম সালাত অধ্যায়, ৫১. মুসনাদে আমাম আহমদ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৯২. ৫২. উসুদল গাবাহ মুয়াবিয়া ইবনে খাদীজ প্রসঙ্গ. ৫৩. তিরমিযি কিতাবুল জানায়েয, ৫৪. মুয়াত্তা ইমাম মালেক কিতাবুযযাকাত, ৫৫. আবূ দাউদ কিতাবুল আদব, ৫৬. আল এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৬৬. ৫৭. ছহীহ বোখারী তাফসীরে সূরা নূর, ৫৮. ঐ মানাকেবে হাসসান, ৫৯. তবকাতে ইবনে সাআদ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৬, ৬০. ঐ মুনকাদের ইবনে আবদুল্লাহ্ প্রসঙ্গ. ৬১. মুস্তাদরাকে হাকেম, ৬২. ইযালাতুল খাফা ইবনে আবী শায়বার উদ্ধৃতি. ৬৩. আল এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৬৭, ৬৪. ছহীহ বোখারী তায়াম্মুম অধ্যায়, ৬৫. ঐ মানাকেবে আয়েশা. ৬৬. আল এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৬৭. ৬৭. ঐ, ৬৮. ঐ, ৬৯. তবকাতে ইবনে সাআদ পৃষ্ঠা ৭৬৬, ৭০. উসুদুল গাবাহ্ পৃষ্ঠা ৫০২, ৭১. এক প্রকার উপাদেয় খাদ্য, ৭২. আল-এস্তীআব পৃষ্টা ৭৬৬. ৭৩. তবকাতে ইবনে সাআদ ৮ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৫. ৭৪. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৬. ৭৬. তিরমিযী মানাকেবে আয়েশা. ৭৭. আল এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৬৫, ৭৮. মুসতাদরাকে হাকেম. ৭৯. আল এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৬৫, ৮০. আইনুল এছাবাহ, ৮১. বোখারী, অধ্যায় বদর যুদ্ধ, ৮২. মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৮৩. উসওয়ায়ে সাহাবা ২য় খন্ড. ৮৪. সুনানে নাসাই. কিতাবুল খামর, ৮৫. শিশু যাতে ভূত-পেতের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে , সে জন্য এটা করা হতো. ৮৬. উসওয়ায়ে ছাহাবা ২য় খন্ড, ৮৭. ছহীহ মুসলিম কিতাবুল জিহাদ. ৮৮. উসওয়ায়ে ছাহাবা ২য় খন্ড, ৮৯. তবাকাতে ইবনে সাআদ ৮ম খন্ড. পৃষ্ঠা৫২. ৯০. ঐ পৃষ্ঠা ৫৪. ৯১. ঐ পৃষ্ঠা ৫৩. ৯২. ঐ. ৯৩. ঐ পৃষ্ঠা৫৪, ৯৪. ঐ পৃষ্ঠা ৫৩।

৪

উম্মুল মু'মেনীন হযরত হাফ্সা (রাঃ)

হযরত হাফসা ছিলেন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের কন্যা।[১] তার পিতৃকূল-নুফাইল ইবনে আবদুল ওয্যা ইবনে রাবাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কোরত ইবনে আদী ইবনে কা'ব।[২] আর তাঁর মাতা ছিলেন যয়নব ইবনেতে মাযউন। নবুওয়্যাতের পাঁচ বছর আগে কোরাইশগণ যখন কা'ব শরীফ পুনঃনির্মাণে ব্যস্ত, তখন তাঁর জন্ম হয়।[৩] তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। অবশ্য এটুকু জানা যায় যে, হযরত উমর যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর সাথে গোটা খান্দাও ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁদের মধ্যে হযরত হাফসাও ছিলেন। খুনাইস ইবনে হোযাফা ইবনে কায়েস ইবনে 'আদীর সাথে তার প্রথম বিয়ে হয়।[৪] খুনাইস ইসলামে তার সহযাত্রী ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী একই সঙ্গে মদীনা শরীফ হিজরত করেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধে তিনি মারাত্মকভাবে আহন হন। এ আঘাতে মদীনায় ফিরে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৫] ঘটনাটি ঘটে হিজরতের পর, যখন রাসূলে খোদা বদর যুদ্ধ থেকে মদীনা শরীফ ফিরে আসেন।[৬]

হযরত হাফসা বিধবা হলে হযরত উমর হযরত আবূবকর সিদ্দিক (রাঃ) এর সাথে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি চুপ থাকেন, কোন জবাব দেননি। হযরত উমর (রাঃ) এ কাছে ব্যাপারটি না পছন্দ ঠেকায়। সে সময় হযরত ওসমান (রাঃ) এর স্ত্রী মহানবীর কন্যা হযরত রোকাইয়্যাও ইন্তিকাল করেন। তিনি হযরত ওসমান (রাঃ) এর নিকটও প্রস্তাব করেন। তিনি জবাব দেন যে, এখন বিয়ে করার কোন চিন্তা-ভাবনা আমার নেই। হযরত উমর (রা) হযরতের খেমদতে হাযির হয়ে তাকে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। হযরত উমর এবং নবীজীর বিশেষ সম্পর্ক এমন পর্যায়ের ছিল না,

যাতে আত্মীয়তার সম্পর্ক হতে পারে না। এ দিকে হযরত আবূ বকরের কন্যা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার সাথে নবীজীর বিয়ে হয়েছে। খোদার ইচ্ছা ছিল, এ সৌভাগ্য লাভ করুক। হযরত হাফসা এজন্য নবীজী তাঁকে বলেছিলেন, এমন ব্যক্তির সাথে হাফসাকে বিয়ে দেয়া যাবে না, সে ওসমানের চেয়ে উত্তম আর ওসমানকেও হাফসার থেকে উত্তম পাত্রী বিয়ে করানো হবে না। অতঃপর তিনি হযরত উমরের নিকট প্রস্তাব করে হাফসাকে নিজে বিয়ে করেন।

পরে হযরত আবূ বকর হযরত উমরের সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন যে, আপনি রাগ করবেন না। রাসূলে খোদা হাফসার কথা বলেছিলেন। আমি এটা প্রকাশ করতে চাইনি, তাই চুপ ছিলাম। নবীজীর বিয়ে করার ইচ্ছা না থাকলে আমি নিজেই তাঁকে বিয়ে করতাম।[৭] রাসূলে খোদার সাথে হযরত হাফসার এ বিয়ে সম্পন্ন হয় হিজরী তৃতীয় সালে।[৮]

তাহরীম

আবূ ওসামা হাম্মাদ হযরত আয়েশার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন যে, হালুয়া এবং মধু ছিল নবীজীর নিকট অতিপ্রিয়। তিনি আসরের নামাযের পর স্ত্রীদের কাছে গমন করতেন। এক দিন হযরত হাফসার কাছে একটু বেশি সময় কাটন। স্বভাবের দাবী অনুযায়ী এতে হযরত আয়েশার ঈর্ষা হয়। তিনি খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারেন যে, কোনও এক মহিলা হযরত হাফসার নিকট হাদীয়া স্বরূপ কিছু মধু পাঠান। নবীজী সে মধু পান করেন। হযরত আয়েশা হযরত সাওদার নিকট এটা ব্যক্ত করেন এবং তাকে শিখিয়ে দেন যে, নবীজী আপনার কাছে এলে আপনি বলবেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি "মাগাফীর" খেয়েছেন। (মাগাফীর হচ্ছে এক ধরনের ফুল, মৌমাছি যা থেকে মধু আহরণ করে। এতে এক ধরনের গন্ধ থাকে।) আর গন্ধ নবীজীর নিকট অত্যন্ত না-পছন্দ ছিল। তিনি বলবেন, হাফসা আমাকে মধু পান করিয়েছে। আপনি বলবেন, খুব সম্ভব এ মধু ওরফাত মৌমাছির। একথা তিনি হযরত ছফীয়াকেও শিখিয়ে দেন। নবীজী সাওদার নিকট গমন করলে তিনি কথা অনুযায়ী কাজ করেন। হযরত আয়েশা এবং হযরত ছফীয়াও এ নিয়ে আলোচনা করেন। অতঃপর একদিন নবীজী ছফীয়ার কাছে এলে তিনি অভ্যাস অনুযায়ী মধু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।

নবীজী জবাব দেন, আমার মধুর দরকার নেই । তিনি ভবিষ্যতে মধু না খাওয়ারও প্রতিজ্ঞা করেন।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ এ বর্ণনার উল্লেখ করেন। কিন্তু সহীহ্ বোখারী শরীফ মধু পরিবেশনকারী হিসেবে হযরত যয়নবের উল্লেখ রয়েছে। এতে আরও বলা হয় যে, হযরত আয়েশার পরামর্শে কেবল হাফসা ইবনেতে উমর শরীক ছিলেন। এ ঘটনার পর কুরাআন মজীদে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়:[৯]

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاأَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ. (التحريم : ١)

– হে নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যে জিনিস হালাল করেছেন, আপনি কেন তা হারাম করেন? আপনি স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনা করেন। (সূরা তাহরিম, আয়াত-১)

ইবনে সা'আদ এ বর্ণনায় ভুল করেছেন। কারণ কোন গ্রন্থে এ ঘটনার সাথে হয়রত হাফসার নাম উল্লেখ নেই। বোখারী শরীফের বর্ণনাকে ছহীহ্ বলে মেনে নিতে ইতস্তত: করার কোন অবকাশ নেই। কারণ তাতে রেওয়ায়াত দেরায়াত কোন দিক থেকেই দুর্বলতা নেই।

তাহরিম ঘটনার কিছু দিন পর নবীজী গোপন কোন একটা কথা হযরত হাফসাকে বলেন এবং তাকীদ করেন যে, এটা কারো কাছে প্রকাশ করবে না। কিন্তু তিনি হযরত আয়েশার কাছে তা গোপন রাখতে পারেননি। এতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়:[১০]

وَاذْ اسَرَّ النَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَاَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ– فَلَمَّا نَبَّاهَابِهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هذَا، قَالَ نَبَّاَنِيْ اَلْعَلِيْمَ الْخَبِيْرُ.

–আর রাসূল যখন তার এক স্ত্রীর কাছে একটি গোপন কথা বলেন, আর তিনি তা ফাঁস করে দেন, আল্লাহ্ তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি কিছু প্রকাশ করেন আর কিছু বাদ দেন। তিনি তার স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করলে তিনি বলেন, কে আপনাকে এটা বলে দিয়েছে? তিনি বললেন, যিনি

মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ, তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেণ। (সূরা তাহরীম, আয়াত–৩)

যেহেতু বিষয়টি ছিল রাসূলুল্লাহ্র গোশশার, তাই হযরত আয়েশা এবং হযরত হাফসা একমত হয়ে বিষয়টি মিটমাট করার উদ্যোগ নিলে নিচের আয়াতটি নাযিল হয়:

اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ– وَالْمَلٰئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ. (التحريم : ٣)

–তোমরা উভয়ে আল্লাহ্র নিকট তওবা করলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা তোমাদের দিল সঠিক-নির্ভুল পথ থেকে সরে গিয়েছে। আর তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে আল্লাহ্ই তো তার প্রভু, জিবরাঈল এবং নেক্কার ঈমানদারা তো আছেই, এসবের পর আল্লাহ্র ফেরেস্তারা তাঁর সহায়ক রয়েছেন। (সূরা তাহরীম, আয়াত–৪)

এ আয়াতে মুনাফিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তাদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, হাফসা আর আয়েশা যদি বিরোধ চায় আর মোনাফিকরা যদি ষড়যন্ত্র করে তা দ্বারা ফায়দা হাছিল করতে চায়, তাহলে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে সাহায্য করবেন। আর আল্লাহ্র সাথে রয়েছেন জিবরাঈল ফেরেস্তা এবং দুনিয়ার নেককার মোমেনরা।

গুণ, বৈশিষ্ট্য

হযরত হাফসা ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারণী। শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তাঁর ছিল বড় আগ্রহ। পুরুষদের মধ্যে আবূদল্লাহ ইবনে উমর, হামযা ইবনে আবদুল্লাহ, হারেসা ইবনে ওয়াহাব, আব্দুর রহমান ইবনে হারেস প্রমুখ এবং স্ত্রীদের মধ্যে ছফীয়া বিনতে আবূ ওবায়দা এবং উম্মে মোবশশের আনছায়ি ছিলেন তার ছাত্রদের পর্যায়ভুক্ত। হযরত হাফসা থেকে ৬০টি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি নিজে এ হাদীসগুলো শুনেছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ এবং হযরত উমরের কাছ থেকে।[১১]

মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হযরত হাফসা সম্পর্কে একটা ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বীনের জ্ঞানের প্রতি তার কতটা আগ্রহ-উৎসাহ ছিল,

এ ঘটনা থেকে তা অনুমান করা যায়। একবার নবীজী বলেছিলেন, আমি আশা করি বদর যুদ্ধ এবং হোদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারীরা জাহান্নামে যাবে না। হযরত হাফসা আপত্তি করে বলেন, আল্লাহ্ বলছেন:[১২]

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا . (مريم : ٧١-٧٢)

তোমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই তা অতিক্রম করতে হবে। এটা তোমার রবের উপর কর্তব্য। এটা অবশ্য ঘটে থাকবে। অতঃপর আমরা পরহেযগারদের মুক্ত করবো আর যালেমদেরকে হাঁটু গেড়ে তাতে নিক্ষেপ করবো। (সূরা মারইয়াম : ৭১-৭২)

চরিত্র মাধুর্য

হযরত হাফসা ছিলেন অত্যন্ত ইবাদাত গুজার এবং ধর্মপরায়ণা রমণী। তিনি রাত্রে নামায আদায় করতেন আর দিনে রোজা রাখতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি রোজা ত্যাগ করেননি।[১৩]

হযরত আয়েশার সাথে তার সম্পর্ক ছিল বোনের মতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একে অন্যের শরীক থাকতেন! মাঝে মধ্যে তিক্ততাও দেখা দিতো। হযরত আয়েশা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তার সম্পর্কে হযরত আয়েশা বলতেন, হাফসা ছিলেন বাপের বেটি। সব বিষয়ে তিনি ছিলেন পিতার মতোই কঠোর নীতির রমণী।[১৪]

মেজাজ কিছুটা গরম ছিল। কোন কোন সময় নবীজীকে সমান সমান জবাব দিয়ে দিতেন। সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত উমর (রা:) থেকে বর্ণিত আছে, জাহেলী যুগে নারীদেরকে খুব কমই মূল্য দেয়া হতো। একদিন কোন এক ব্যাপারে আমার স্ত্রী আমাকে পরামর্শ দেয়। আমি তাঁকে শাসিয়ে বলি, এসব ব্যাপারের সাথে তোমার কি সম্পর্ক। স্ত্রী বললেন, আমার কথা আপনার ভালো লাগে না। অথচ আপনার কন্যা রাসূলে খোদাকে সমানে সমান জবাব দেয়। আমি এটা শুনে হাফসার কাছে জিজ্ঞেস করি, কি ব্যাপার? সে জানায় যে, সন্দেহ নেই, আমি এরূপ করি। আমি বললাম, সাবধান! এমনটি করবে না। আমি তোমাকে খোদার আয়াতের ভয় দেখাচ্ছি।[১৫]

৬

ওফাত

কোন সালে তার ওফাত হয়েছে এ সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। ঐতিহাসিক ইবনে আসীর এর মতে যে হযরত হাসান ইবনে আলী আমীর মু'য়াবিয়ার হাতে বায়আত করেন, সে সময় তিনি ওফাত পান অর্থাৎ হিজরী ৪১ সালে।[১৬] ইবনে সা'আদের মতে হযরত হাফসা হিজরী ৪৫ সালের শা'বান মাসে ইন্তিকাল করেন। এটাই সঠিক। কারণ অধিকাংশ জীবন চরিতকার এ মত প্রকাশ করেন। মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান জানাযার নামায পড়ান। হযরত আবূ হোরায়রা মুগীরার গৃহ থেকে কবরস্থান পর্যন্ত তার লাশ বহন করেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর, আছেম ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে উমরের পুত্র সালেম আবদুল্লাহ্ এবং হামযা কবরে অবতরণ করেন। জান্নাতুল বাকীতে তার লাশ দাফন করা হয়।[১৭]

১. আল এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭২৪, ২. ঐ পৃষ্ঠা ৪২৮. ৩. তবকাতে ইবনে সাআদ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা৫৬. ৪. ঐ, ৫. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৪২৫, ৬. তবাকতে ইবনে সাআদ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৬, ৭. ঐ পৃষ্ঠা ৫৯, ৮. ছহীহ বোখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭২৯, ৯. ছহীহ বোখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭২৯, ১০. ঐ, ১১. যরকানী ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭২১. ১২. মুসনাদ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ২৮৫. ১৩. তবকাতে ইবনে সাআদ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৯, ১৪. সুনানে আবূ দাউদ. হাফসা প্রসঙ্গ, ১৫. সহীহ বোখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৬৮. ১৬. উসুদুন গাবাহ পৃষ্ঠা ৪২১. ১৭. তবকাতে ইবনে সাআদ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৬০।

৫

উম্মুল মুমেনীন হযরত যয়নব বিনতে খোযায়মা (রাঃ)

হযরত যয়নবের ডাক নাম উম্মুল মাসাকীন। বংশধারা-যয়নব ইবনেতে খোযায়মা ইবনে হারেস ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আবদে মানাফ ইবনে আমের ইবনে হেলাল ইবনে চা'লা আহ।[১]

তাঁর প্রথম বিয়ে হয় আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের সাথে। তৃতীয় হিজরীতে ওহোদ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। একই বছর নবীজী তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু মাত্র ২/৩ মাস পরই তিনি ইন্তিকাল করেন।[২] হযরত খাদীজার পর তিনি মহানবীর প্রথমা স্ত্রী, যিনি নবীজীর জীবদ্দশায় জান্নাতাবাসী হন। ইন্তি কালের সময় তার বয়স ছিল প্রায় ৩০ বছর।[৩] রবিউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে তার ইন্তিকাল হয়। মহানবী নিজে তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং জান্নাতুল বাকীতে লাশ দাফন করেন।[৪]

তাঁর প্রথম বিয়ে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইবনে সা'আদের মতে তোফায়েল ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মোত্তালেবের সাথে তার প্রথম বিয়ে হয়। তিনি তালাক দিলে ওবায়দা ইবনে হারেসের সাথে বিয়ে হয়। তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হন।[৫] কিন্তু আমাদের মতে নবীজীর পূর্বে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার এবং ঐতিহাসিক ইবনে আসীর এ মত পোষণ করেন।[৬] হযরতের সাথে তার বিয়ে হয় তৃতীয় হিজরীর রমযান মাসের প্রথম দিকে।[৭] বিয়েতে ১২ উকীয়া মোহর ধার্য হয়।

কারো কারো মতে– اَوَّلُكُنَّ لَحُوْقًا بِىْ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا

-তোমাদের মধ্যে যাদের হাত দরায, তারা আমার সাথে প্রথমে মিলিত হবে।

এ হাদীস হযরত যয়নব ইবনেতে খোযায়মাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ তিনি খুব বেশি দান-ছদকা করতেন। মিসকীনদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুব দয়ালু। কিন্তু এটা ঠিক নয়। আসলে এ হাদীস হযরত যয়নব ইবনেতে জাহাশকে বুঝানো হয়েছে। নবীজীর পর স্ত্রীদের মধ্যে প্রথম তাঁর ইন্তিকাল হয়। সমস্ত মুহাদ্দিস এ ব্যাপারে একমত যে, যয়নব বিনতে খোযায়মা নবীজীর জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল করেছেন।

১. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৫৩, ২. ঐ, ৩. ঐ. ৪. তবকাতে ইবনে সাআদ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮২. ৫. ঐ. ৬. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮২. ৭. ঐ, ৮. সহীহ আল বুখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭২৯।

৬

উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালমা

তার আসল নাম ছিল হিন্দ, কিন্তু উম্মুল মাসাকীন ডাক নামে তিনি পরিচিত হন। কোরাইশের বনী মখযুম কবীলার সাথে তার সম্পর্ক। বংশ ধারা-হিন্দ ইবনে আবূ উমাইয়া ইবনে মুগীরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে মখযুম। আর মাতৃকুল-হিন্দ ইবনেতে আতেকা ইবনেতে 'আমের ইবনে রাবী' আহ ইবনে মারেক কেনানিয়াহ। কেউ কেউ বলেন, তার আসল নাম ছিল রামলা। কিন্তু এর কোন ভিত্তি নেই। মোহাদ্দেসীনরা এ রেওয়াতকে 'লাইসা বিশাইইন' বা অর্থহীন বলে অভিহিত করেন।[১]

আবূ উমাইয়ার নাম ছিল হোযাইফা, তাঁর পদবী ছিল যাদুর রাকেব। এ পদবীতে তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ। মক্কার দানশীল ব্যক্তিদের মধ্যে তার বিশেষ স্থান ছিল। মাঝে মধ্যে সফরে গমন করলে গোটা কাফেলার দায়িত্ব তিনি একাই গ্রহণ করতেন। এ দানশীলতা ও বদান্যতার কারণে আবূ উমাইয়া আরবদের নিকট যাদুর রাকেব উপাধীতে সমধিক পরিচিত হন।[২] তাঁর চাচাত ভাই আবূ সালমা ইবনে আবদুল আসাদের সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়।[৩] প্রথমে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তিনি এবং তাঁর স্বামী ছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত।[৪] অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করবে কি করবেন না, এ বিষয়ে মানুষ যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত ছিল, ইসলাম সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া ছিল যখন ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কাজ, তখনই তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই ইসলামের অইবনেশ্বর দৌলতে ধন্য হন।

হিজরত

ইসলাম গ্রহণের মতো হিজরতেও উভয়েই ছিলেন সহযাত্রী। প্রথমে হাবশা বা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরে উভয়ে মদীনায় হিজরত করেন।

মদীনা শরীফ হিজরতকালে উম্মে সালমা যে মর্মন্তুদ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, ঐতিহাসিক ইবনে আসীর তার জবানীতে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'আবূ সালমা যখন মদীনা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার কাছে একটি মাত্র উট ছিল। আমি এবং আমার পুত্র সালমাকে তার পিঠে সওয়ার করান। তিনি নিজে উটের লাগাম ধরে রওয়ানা করেন। বনু মুগীরা ছিল আমার সমগোত্রীয়। এ গোত্রের লোকেরা আমাদেরকে দেখে ফেলে এবং আবূ সালমাকে বাধা দিয়ে বলে যে, আমরা আমাদের কন্যাকে এত খারাপ অবস্থায় যেতে দেবো না। তারা আবূ সালমার হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে নেয় এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। ইতোমধ্যে আবূ সালমার খান্দনের লোক বনু আব্দুল আসার এসে পৌঁছে। তারা পুত্র সালমাকে ছিনিয়ে নেয় এবং বনু মুগীরাকে জানিয়ে দেয় যে, তোমরা তোমাদের কন্যাকে স্বামীর সাথে যেতে না দিলে আমরাও আমাদের শিশুকে তোমাদের কন্যার সাথে যেতে কিছুতেই দেবোনা। এখন আমি আমার স্বামী এবং পুত্র সন্তান-তিনজনই একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন। শোকে-দুঃখে আমার অবস্থা কাহিল। যেহেতু হিজরতের হুকুম হয়েছিল, তাই আবূ সালমা মদীনায় চলে যান। আমি একা রয়ে যাই প্রতিদিন বনু মুগীরার এক ব্যক্তি, যিনি ছিলেন আমার বন্ধু, আমার এ অস্থিরতা দেখে দয়া পরবশ হয়ে তার বংশের লোকদেরকে একত্রিত করে বললেন, আপনারা এ অসহায়াকে কেন ছেড়ে দিচ্ছেন না? একে তো আপনারা স্বামী এবং সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। তার একথাগুলো বেশ কাজ করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের মনে দয়ার উদ্রেক হয়। তারা আমাকে অনুমতি দিয়ে বলে যে, তোমার ইচ্ছে হলে স্বামীর কাছে যেতে পার। এটা শুনে বনু আবদুল আসাদের লোকেরাও সন্তান আমার কাছে ফেরত দেয়। এবার আমি উটের পৃষ্ঠে হাওদা বেঁধে পুত্র সালমাকে বুকে নিয়ে সওয়ার হই। আমি ছিলাম সম্পূর্ণ একা। এ অবস্থায় পয়গম পৌঁছি। সেখানে ওসমান ইবনে তালহা ইবনে আবূ তালহার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার অবস্থা জানতে পেরে জিজ্ঞেস করেন, তোমার সাথে কেউ আছে? আমি বললাম, না আমি একা আর আমার এ শিশু সন্তান। তিনি আমার উটের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যান। খোদা সাক্ষী, তালহার চেয়ে শরীফ লোক আরবে আমি পাইনি। মনযিল এলে আমার অবরতণ দরকার হলে তিনি গাছের আড়ালে চলে যেতেন। রওয়ানা

করার সময় হলে তিনি উট নিয়ে আসতেন। আমি ভালোভাবে বসলে তিনি উটের লাগাম ধরে আগে আগে গমন করতেন। গোটা পথ এভাবে কাটে। মদীনা পৌঁছে বনু আমর ইবনে আওফ এর জনপদ কোবা অতিক্রমকালে ওসমান ইবনে আবূ তালহা আমাকে জানান যে, তোমার স্বামী এ গ্রামে আছেন। আবূ সালমা এখানে অবস্থান করেছিলেন। আমি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে এ মহল্লায় অবতরণ করি। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে স্বামীর সাক্ষাৎ হয়। আমাকে আবূ সালমার সন্ধান দিয়ে ওসমান ইবনে আবূ তালহা মক্কা ফিরে যান।[৫]

হযরত উম্মে সালমা এ মহানুভবতার কথা কখনো বিস্মৃত হননি। তিনি প্রায়ই বলতেন ঃ

مَارَأَيْتُ صَاحِبَاقَةً اَكْرَمَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ.

আমি কখনো ওসমান ইবনে তালহার চেয়ে শরীফ সাথী কাউকে দেখিনি। নির্যাতনের যুগে মুসলমানরা যখন চতুর্দিক থেকে লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন, তখন তাদের অস্থিরতার কোন কূল-কিনারা ছিল না। হিজরতকারে তাঁকে যে বিপদাপদ সইতে হয়েছে, তা কেবল তার পক্ষেই সম্ভব ছিল। তার মন থেকে সে অনুভূতি বিদূরিত হয়নি। হিজরত সম্পর্কে আলোচনাকালে তিনি গর্ব করে বলতেন, ইসলামের জন্য আবূ সালমার খান্দানকে যে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, তা আহলে বায়তের আর কাউকে সইতে হয়েছে বলে আমার জানা নেই।[৬]

আঁ-হযরতের স্ত্রীদের মধ্যে উম্মে সালমা ছিলেন, কোন কোন গুণে অনন্যা। হিজরতেও একটি বিষয়ে তিনি ছিলেন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী। তিনি ছিলেন প্রথম পর্দানশীল স্ত্রী, যিনি শুরুতে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন।[৭]

হযরত উম্মে সালমা ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান স্ত্রী। তার পিতা আবূ উমাইয়া ছিলেন কোরাইশের অত্যন্ত মর্যাদাবান এবং পরিচিত ব্যক্তিত্ব। হিজরতকালে তিনি যখন কোবা পৌছেন, তখন লোকেরা তার সম্পর্কে জানতে চায়। পিতার নাম শুনে অনেকের বিশ্বাসই হয়নি। কারণ, শরীফ নারীরা সে যমানায়ও এমনিভাবে একা বেরুতেন না। হযরত উম্মে সালমার

অন্তরে ছিল ইসলামের জন্য প্রগাঢ় দরদ। খোদার নির্দেশ মেনে চলা তিনি কর্তব্য মনে করতেন। তাই তিনি অন্য কিছুর কথা ভাবতেন না। তিনি চুপচাপ থাকতেন। কিছু লোক যখন হজ্জ করার জন্য মক্কা রওয়ানা হন এবং তিনি তার পরিবারে একখানা চিঠি পাঠান, তখন তাঁর শরাফত এবং পারিবারিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সকলের বিশ্বাস জন্মে।[৮]

হিজরতকালে বিপদাপদের কথা তখনো তার অন্তর থেকে মুছে যায়নি, আর স্বামীকে নিয়ে বেশি দিন কাটাবার সুযোগও তিনি লাভ করেননি। আবূ সালমাকে এমন সময় জিহাদ ব্যপদেশ ওহোদ যুদ্ধে অংশ নিতে হয়।[৯] জিহাদের ময়দানে আবূ সালমা হাতমীর তীর তার বাহুতে বিদ্ধ হয়।[১০] এক মাস চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হন। এর দু'বৎসর ১১ মাস পর নবীজীর নির্দেশে তাকে কতন এলাকায় প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি ২৯ দিন কাটান।[১১] হিজরী ৪ সালের ছফর মাসের ৮/৯ তারিখে মদীনা ফিরে আসেন। এবারের আঘাত ছিল তীব্র। এ আঘাতে আর সেরে উঠতে পারেননি। একই বছর জুমাদাল ওখরার ৯ তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১২]

হযরত উম্মে সালমা নবীজীকে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ জানাতে আসেন। মৃত্যু সংবাদ শুনে নবীজী নিজে তার গৃহে গমন করেন। গোটা গৃহে ছিল শোকের কালো ছায়া। হযরত উম্মে সালমা বার বার বলতেন, অসহায় অবস্থায় কেমন মৃত্যু হয়েছে হায়! নবীজী তাকে ধৈর্য ধারণের দীক্ষা দেন এবং বলেন, তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করো এবং বলো ঃ اللّٰهُمَّ اخْلُفْنِي خَيْرًا مِنْهَا

হে খোদা! আমাকে তার চেয়ে উত্তম উত্তরাধিকারী দাও! এরপর নবীজী আবূ সালমার মৃতদেহ দেখতে যান এবং অতি গুরুত্বের সাথে তাঁর জানাযায় নামায পড়ান। এ জানাযায় নামাযে তিনি ৯টি তাকবীর বলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ভুল হয়নি তো? হযরত বললেন, ইনি হাজার তাকবীরের যোগ্য ছিলেন। ইন্তিকালের পর তার চোখ খোলা ছিল। নবীজী নিজ হাতে তার চোখ মুছে দেন এবং তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেন।[১৩]

দ্বিতীয় বিবাহ

হযরত আবূ সালমার ইন্তিকালের সময় উম্মে সালমা অন্তস্বত্বা ছিলেন।[১৪] ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর তাঁর দারিদ্র ও অসহায়তার বিষয় বিবেচনা করে হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি এতে সম্মত হননি। এক বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত ওমর (রাঃ) তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু আল-এছহাব গ্রন্থের রচয়িতা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীর মতে হযরত উমর নিজের জন্য এ প্রস্তাব দেননি, বরং তার মাধ্যমে নবীজী (সঃ) তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান। আবূ সালমার আত্মত্যাগ ও কুরবানী এবং উম্মে সালমার অসহায়ত্ব রাসূলে খোদার অন্তরে দাগ কেটে ছিল, তাঁকে করেছিল বিচলিত। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী হযরত উমরের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠান। হযরত উম্মে সালমার পক্ষে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল না। প্রথমে তিনি নানা অজুহাত দেখিয়ে টাল-বাহানা করেন। কিন্তু নবীজী সব শর্ত মেনে নিলে তিনি সম্মতি দেন।[১৫] স্বীয় পুত্র উমরকে বলেন, চলো রাসূলে খোদার সাথে আমাকে বিবাহ দাও। হিজরী চতুর্থসালে শাওয়াল মাসের শেষের দিকে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এমনি করে হযরত আবূ সালমার মৃত্যুর হৃদয় বিদারক ঘটনারই পরিসমাপ্তি হয়নি, বরং তার জীবন চিরন্তন শান্তিতে ভরে উঠে।

আহমদ ইবনে ইসহাক হাযরামী যিয়াদ ইবনে মারইয়ামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, একদা উম্মে সালমা স্বামী আবূ সালমাকে বলেন, আমি জানি কোন নারীর স্বামী জান্নাতবাসী হলে তার স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিবাহ না করে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা স্বামীর সাথে স্ত্রীকেও জান্নাত নছীব করান। পুরুষেরও ঠিক একই অবস্থা। তাহলে এসো, আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, আমার পর তুমি বিয়ে করবে না, আর তোমার পর আমিও বিয়ে করবো না। আবূ সালমা জবানে বললেন, তুমি কি আমার আনুগত্য করবে? উম্মে সালমা বললেন, তোমার আনুগত্য ছাড়া আমি আর কিসে আনন্দ লাভ করবো? আবূ সালমা বলেন, তাহলে আমার মৃত্যুর পর তুমি বিয়ে করবে। এরপর তিনি দোয়া করেন, হে খোদা! আমার মৃত্যুর পর উম্মে সালমাকে উত্তম উত্তরাধিকারী দান কর। হযরত উম্মে সালমা বলেন, আবূ সালমার মৃত্যুর পর আমি বলি, কে হবে আবূ সালমার চেয়ে উত্তম। এর কিছুদিন পর নবীজীর সাথে আমার বিয়ে হয়।[১৬]

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্কের সাথে সাথে এ কথাও জানা যায় যে, সে সময়ে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী, কত গভীর ছিল। একজন স্বামী তার সকল আবেগ-অনুভূতি দমন করে স্ত্রীকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দিচ্ছে– এটা কি সে সত্য যুগের পুত-পবিত্র দৃষ্টান্ত নয়?

নবীজী উম্মে সালমাকে দু'টি আটা পেষার চাককী, পানি রাখার জন্য দু'টি মশক এবং একটা চামড়ার বালিশ (খোরমার ছাল ভর্তি) দান করেন। এসব জিনিষই দেয়া হয়েছে অন্যান্য স্ত্রীদেরকেও।[১৩]

ঈর্ষা স্বভাবের দাবি, পরশ্রীকাতরতার পর্যায়ে না পৌছলে এটা নিন্দনীয় নয়। হযরত উম্মে সালমা যখন নবীজীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন হযরত আয়েশা তার রূপ-সৌন্দর্যের কথা শুনে ঈর্ষান্বিতা হন এবং তাকে দেখতে আসেন। যেহেতু তার মনে সুন্দর ধারণা জাগলো যে, যতটুকু বলা হয়, উম্মে সালমা তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী। এ সম্পর্কে তিনি হযরত হাফসার সাথেও আলোচনা করেন। তিনি বুঝালেন যে, মানুষ অতিরঞ্জিত করে। ঈর্ষার কারণে এটা ঘটেছে। অতঃপর হযরত হাফসাও তাকে দেখতে যান এবং দেখে তারও একই প্রতিক্রিয়া হয়। এবার হযরত আয়েশা গভীরভাবে দেখে স্বীকার করেন যে, সত্যিই হাফসা ঠিক বলেছে। যাই হোক, এ বর্ণনা দ্বারা হযরত উম্মে সালমার সৌন্দর্য প্রমাণিত হয়। এ জন্য হযরত আয়েশাকে নৈতিক দিক থেকে দায়ী করা যায় না।[১৮]

তাঁর লজ্জাশীলতা এবং আত্মমর্যাদার কথা ইতিপূর্বে আলাচিত হয়েছে। বিয়ের পর পথম প্রথম এ অবস্থা ছিল যে, নবীজী আগমন করলে তিনি কোলের শিশুকে দুধ খাওয়াতেন। নবীজী এটা দেখে ফিরে যেতেন। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের ছিলেন তার দুধ-ভাই। তিনি এটা শুনে অসন্তুষ্ট হন এবং দুধের শিশুকে তার গৃহে নিয়ে যান।[১৯] ধীরে ধীরে এ অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং অন্যান্য স্ত্রীদের মতো তিনিও স্বাভাবিক জীবন যাপন শুরু করেন। পরে আন্তরিকতার সম্পর্ক এত বৃদ্ধি পায় যে, হযরত আয়েশার পরই তার স্থান হয়েছে এ কথা বলা চলে।

সাধারণ অবস্থা

হযরত উম্মে সালমার বিয়ের ঘটনার মধ্যে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিয়ের দিনই তিনি নিজ হাতে খানা তৈরী করেন। ইতিপূর্বে উম্মুল মু'মেনীন হযরত যয়নব ইবনেতে খোযায়মার ইন্তিকাল হয়েছে। ঘরে তুলে নেয়ার পর তাকে সে গৃহে অবস্থান করতে দেয়া হয়। ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র আগে থেকেই বর্তমান ছিল। হযরত উম্মে সালমা একটি পাত্র থেকে কিছু চর্বী বের করে খাদ্য তৈয়ার করেন। নবীজী এবং তার নব পরিণীতা স্ত্রী বাসর রাত্রে এ খাদ্যই গ্রহণ করেন।[২০]

হোদায়বিয়ার সন্ধি উপলক্ষে নবীজীকে তার যথার্থ পরামর্শ দান অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা। বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে যে, সন্ধির পর রাসূলে খোদা হোদায়বিয়ার কোরবানী করার জন্য বলেন। সন্ধির শর্তাবলী যেহেতু বাহ্যত: মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিল তাই সাধারণত: হতাশা বিস্তার করেছিল। নবীজী তিনবার নির্দেশ দেয়ার পাও কেউ নির্দেশ মানতে এগিয়ে আসেননি। ঘরে ফিরে এসে তিনি উম্মে সালমার নিকট খুলে বলেন। তিনি বললেন আপনি কাউকে কিছু না বলে বাইরে গিয়ে নিজেই কোরবানী করুন এবং এহরাম ভাঙ্গার জন্য মাথা মোড়ান। তিনি তাই করলেন। যখন সকলে কোরবানী করলেন এবং এহরাম খুলে ফেললেন।[২১] হযরত উম্মে সালমার এ অভিমত যথার্থ বলে সকলে স্বীকার করেন।

বিদায় হজ্জের সময় হযরত উম্মে সালমা অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তাই বলে দ্বীনি ফরয আদায় থেকে বিরত থাকা তাঁর পছন্দ ছিল না। তাই যথার্থ ওজর থাকা সত্ত্বেও তিনি নবীজীর সাথে আগমন করেন। তাওয়াফ সম্পর্কে নবীজী বললেন, উম্মে সালমা, ফজরের নামায চলাকালে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে তুমি তাওয়াফ করবে।[২২]

নবীজীর অসুস্থতা বেড়ে গেলে তিনি যখন হযরত আয়েশার গৃহে স্থানান্তরিত হন, তখন অধিকাংশ সময় উম্মে সালমা তাকে দেখতে আসতেন। একদিন তার অসুস্থতা দেখে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে তিনি চিৎকার করে উঠেন। নবীজী তাকে বারণ করে বললেন, এটা মুসলমানদের সাজে না।[২৩]

পঞ্চম হিজরীতে বনু কোরায়যায় অবরোধকালে ইয়াহুদীদের সাথে আলোচনা করার জন্য দরবারে রেসালাত থেকে যখন হযরত আবূ

লোবাবাকে প্রেরণ করা হয়, তখন হযরত আবূ লোবাবা পরামর্শ চলাকালে হাতের ইঙ্গিতে তাদেরকে বলে দেন যে, তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। কিন্তু এটাকে গোপন তথ্য ফাঁস মনে করে পরে এতটা লজ্জিত হন যে, মসজিদের খাম্বার সাথে নিজেকে বেঁধে রাখেন এবং এ অবস্থায় অনেক দিন কাটান।

একদিন সকালে মহানবী (সঃ) হেসে হেসে হযরত উম্মে সালমার গৃহে প্রবেশ করলে তিনি বলেন, আল্লাহ্ আপনাকে সদা হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। এখন হাসার কি কারণ দেখা দিয়েছে? বললেন, আবূ লোবাবার তাওবা কবুল হয়েছে। হযরত উম্মে সালমা অনুমতি চাইলেন তার এ সুসংবাদ পৌঁছে দেওয়ার। তিনি বললেন, ইচ্ছে হলে তা করতে পার। তার গৃহ মসজিদে নববীর এত কাছে ছিল যে, ঘর থেকে আওয়াজ দিলে মসজিদে থেকে শুনা যেত। অনুমতি পেয়ে হুজরায় দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে বললেন, আবূ লোবাবা! তোমায় মোবারকবাদ। তোমার তাওবা কবুল হয়েছে। এ আওয়াজ কানে পৌঁছতেই সারা মদীনায় আনন্দ বয়ে যায়।[২৪]

ঈলা'র ঘটনায় হযরত আবূবকর এবং হযরত উমর যখন স্ব-স্ব কন্যাদের বুঝান, আর হযরত উমর হযরত উম্মে সালমার কাছেও আসেন এবং এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তখন হযরত উম্মে সালমা একটা কড়া সুরে বলেন ঃ

عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، دَخَلْتَ فِيْ كُل شَيْءٍ حَتَّى تَبْغِيْ اَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ وَاَزْوَاجِه.

- হে খাত্তাবের পুত্র, অবাক কান্ড! তুমি সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ কর। এমনকি এখন নবীজী এবং তার স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছ।[২৫]

হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাত সম্পর্কে রাসূলে খোদা (সঃ) আগেই হযরত উম্মে সালমার নিকট ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন। হযরত ইমাম হোসাইন যখন সিরীয় বাহিনীর কবলে পড়ে বীরবিক্রমে জীবনের শেষ মুহূর্তে অতিক্রান্ত করছিলেন, আর সর্বশক্তি দিয়ে লড়ছিলেন, ঠিক সে সময় হযরত উম্মে সালমা স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলে খোদা আগমন করেছেন।

তিনি অত্যন্ত পেরেশান, চুল দাড়ি ধূলা-বালি মাখা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কি অবস্থা? বললেন, হোসাইনের হত্যাস্থান থেকে ফিরে আসছি। চোখ খুলে কেঁদে ফেলেন। এ অবস্থায় মুখ থেকে নির্গত হয়, ইরাকবাসীরা হোসাইনকে হত্যা করেছে। আল্লাহ্ তাদেরকে হত্যা করুন। তারা হোসাইনকে অপমান করেছে। আল্লাহ্ তাদেরকে লানত করুন।[২৬]

সন্তানাদী

হযরত উম্মে সালমার সব সন্তানই ছিল প্রথম পক্ষের। নবীজীর ঔরসে তার কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেনি। এদের সম্পর্কে আল-এছাবাহ, উসুদুল গাবাহ্ এবং তাবাকাত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, সালমা এবং উমর নামে তার দু'পুত্র এবং যয়নব নামে এক কন্যা ছিল। সহীহ বোখারী শরীফে দোররা নামেও এক কন্যা সন্তানের উল্লেখ দেখা যায়। এ হিসেবে তার সন্ত ানের সংখ্যা চার। এদের সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

হাবশা বা আবিসিনিয়ায় সালমার জন্ম। হিজরত কালে সালমা কোলে ছিল। নবীজী হযরত হামযার কন্যা উসামার সাথে তার বিয়ে দেন।

নবীজীর সাথে উম্মে সালমার বিয়ে হয় তার পুত্র উমরের উদ্যোগে। হযরত আলীর শাসনামলে তিনি ফারেস এবং বাহরাইনের শাসনকর্তা ছিলেন।

হযরত আবূ উমাইয়্যা ছিলেন নবীজীর দুধ ভাই। একবার হযরত উম্মে হাবীবা নবীজীকে বললেন, আমি শুনেছি, আপনি দোররাকে বিয়ে করতে চান। হযরত বললেন, এটা কি করে হতে পারে। তিনি আমার পালক কন্যা না হলেও এটা কিছুতেই আমার জন্য হালাল হতো না। কারণ সে তো আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা।[২৭]

যয়নব সম্পর্কে যরকানী লেখেন যে, আগে তার নাম ছিল বাররা। নবীজী তার নাম রাখেন যয়নব।

চরিত্র মাধুর্য

হযরত উম্মে সালমার গোটা জীবনটাই ছিল একজন দুনিয়াত্যাগীর জীবন। দুনিয়ার ধন-দৌলতের প্রতি তার কোন মোহ ছিল না। একবার তিনি একটি হার গলায় দেন। এতে কিছু স্বর্ণও ছিল। নবীজী আপত্তি করলে খুলে ফেলেন।[২৮] প্রত্যেক মাসে সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার রোযা

রাখতেন।[২৯] প্রথম পক্ষের সন্তান সাথে ছিল। অতি আদর-যত্নের সাথে তাদের লালন-পালন করতেন। একদা তিনি হযরতকে জিজ্ঞেস করেন, এজন্য আমি কি কোন সওয়াব পাবো? তিনি বললেন, অবশ্যই পাবে।[৩০] আদেশ-নিষেধের প্রতি তিনি খুব লক্ষ্য রাখতেন। কিছু লোক নামাযের মোস্তাহাব সময় ত্যাগ করতেন হযরত উম্মে সালমা তাদেরকে তাকীদ করে বলেন, নবীজী যোহরের নামায জলদী পড়তেন, আর তোমরা আছরের নামায জলদী পড়।[৩১]

তিনি নিজেও অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন, আর অন্যদেরকেও এ জন্য উৎসাহিত করতেন। একবার কয়েকজন ফকীর তার দরজায় হাজির হয়ে অতিশয় কাতর কণ্ঠে সাওয়াল করতে থাকে। তার কাছেই বসা ছিল উম্মুল হোসাইন। তিনি বাধা দিলেন। কিন্তু উম্মে সালমা তাকে বারণ করে বললেন, এমনটি করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর দাসীকে বললেন, এদেরকে কিছু দিয়ে বিদায় করো। কিছু না থাকলে একটা করে খেজুর হলেও তাদের হাতে দাও।[৩২]

একদা হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তাঁকে বললেন, আম্মা! আমার কাছে এতটা সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে যে, এখন ধ্বংসের আশংকা দেখা দিয়েছে। তিনি বললেন, বৎস! ব্যায় করো। হযরত বলেছেন, এমন অনেক সাহাবা আছে যারা আমাকে কখনো দেখবে না।[৩৩]

অন্যদের আরাম-আয়েশের প্রতি তিনি খুব লক্ষ্য রাখতেন। যতদূর সম্ভব, ভালো কাজে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। ভালোবাসার দাবী অনুযায়ী নবীজীর চুল মোবারক নিজের কাছে সংরক্ষরণ করে রাখতেন বরকত স্বরূপ। সহীহ বোখারী শরীফে আছে, একটা রূপার কৌটায় তিনি ইহা হেফাযত করে রাখেন। সাহাবীদের মধ্যে কারো কোন অসুবিধা দেখা দিলে তিনি তা একটি পাত্রে নিয়ে তাদের কাছে আনতেন। তিনি তা বের করে পানির পাত্রে নাড়াতেন। এর বরকতে সে অসুবিধা সেরে যেতো।

নবীজীর আরাম-আয়েশের প্রতি তিনি এতটা লক্ষ্য রাখতেন যে, হযরত সকীনা, যিনি ছিলেন নবীজীর খাদেম কিন্তু মূলত: গোলাম, তিনি এ শর্তে তাকে আযাদ করেছেন, যে, যতদিন নবীজী বেঁচে থাকবেন, তাঁর খেদমতে হাযির থাকবে।[৩৪]

তাঁর মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধ ছিল। নবীজী ইন্তিকালের পূর্বে হযরত ফাতিমার কানে কানে যে কথা বলেন, হযরত আয়েশার মতো বহুগুনের অধিকারীণী স্ত্রী অস্থির হয়ে তখনই হযরত ফাতিমাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। অবশ্য জবাব না পেয়ে তাঁকে লজ্জিত হতে হয়েছে। কিন্তু হযরত উম্মে সালমা অস্থির হয়ে তখনই এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করে বরং অপেক্ষা করেন এবং নবীজীর ওফাতের পর জিজ্ঞেস করেন।[৩৫]

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا–
(الاحزاب : ٣٣)

–আহলে বাইত, আল্লাহ্ তা'আলা অপপবিত্রতা দূর করে ভালোভাবে তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান, এ আয়াতটি তার গৃহেই নাযিল হয়। অর্থাৎ আয়াতে তাত্হীর বা পরিচ্ছন্নতার আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন নবীজী তাঁর গৃহে ছিলেন। আয়াতটি নাযিল হলে নবীজী হযরত ফাতিমা, হযরত আলী, হযরত হাসান এবং হযরত হোসাইন (রা:) কে ডেকে পাঠান এবং বলেন, এরাই আমার আহলে বাইত। হযরত উম্মে সালমা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি কি আহলে বাইত নই? তিনি জবাব দিলেন ঃ –بَلٰى اِنْشَاءَ اللهُ –অবশ্যই, যদি আল্লাহ্ চাহেন।[৩৬]

তিরমিযী শরীফের কিছুটা পরিবর্তনসহ এ হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে। এতে বলা হয় যে, নবীজী এদেরকে ডেকে একটা কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে বলেন, পরওয়াদেগার, এরাই আমার আহলে বাইত। এদেরকে মাফ কর। এ দোয়া শুনে হযরত উম্মে সালমা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিও কি তাদের অন্ত র্ভূক্ত? বললেন, তুমি তোমার স্থানে আছ এবং ভালো আছ।[৩৭]

এখানে বর্ণনা দুটির উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য, যাতে ভালো কাজে হযরত উম্মে সালমার আকাঙ্খী হওয়া সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

গুণ-বৈশিষ্ট্য

নবীজীর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে মর্যাদা ও পরিপূর্ণতার বিচারে হযরত আয়েশার পরই তাঁর স্থান ছিল। আল-এছাবাহ্ গ্রন্থের রচয়িতা হাফেযা ইবনে হাজার আকালানী তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন:

كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مَوْصُوْفَةً بِالْجَمَالِ الْبَارِعِ وَالْعَقْلِ الْبَالِغِ وَالرَّاى الصَّائِبِ.

–উম্মে সালমা রূপ-সৌন্দর্য, জ্ঞান-প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা এবং সুস্থ চিন্তার গুণে বিভূষিতা ছিলেন।

হযরত উম্মে সালমা, আবূ সালমা, হযরত ফাতিমা এবং স্বয়ং নবীজী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যারা হযরত উম্মে সালমার উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের নাম এই:

উমর এবং যয়নব। এরা উভয়েই তাঁর সন্তান। তাঁর ভাই 'আমের' ভ্রাতুষ্পুত্র মুছআব ইবনে আবূদল্লাহ, তাঁর আযাদকৃত গোলাম বানান, আবদুল্লাহ ইবনে রাফে, নাফে, সকীনা, ইবনে সকীনা, আবূ কাসীর, হাসানের মাতা খায়রা (ইনিও ছিলেন আযাদকৃত দাসী) ছফীয়া ইবনেতে শায়বা, হিন্দ ইবনেতে হারেস ফরাসিয়া, কোবায়ছা ইবনেতে যুরাইব, আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম, আবূ ওসমান আব্দী, আবূ ওয়ায়েল, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের পুত্র আবূ হামিদ ওরওয়া, আবূ বকর ইবনে আব্দুর রহমান এবং সুলাইমান ইবনে ইয়াসার প্রমুখ তাবেঈন।[৩৮] তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৭৮।[৩৯]

তার মধ্যে হাদীস শুনার খুব আগ্রহ ছিল। একদিন তিনি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় নবীজী খোতবা দানের জন্য মিম্বরে আরোহণ করেন। যবান মুবারক থেকে সবেমাত্র, আয়্যুহান্নাস (হে লোক সকল) বেরিয়েছে, এমন সময় মশাতকে বলেন, চুল বেধে দাও। তিনি বললেন, এত তাড়াহুড়া কিসের? সবেমাত্র আয়্যুহান্নাসু উচ্চারিত হয়েছে। উম্মে সালমা বললেন, আমরা কি লোকদের মধ্যে শামিল নই? এরপর তিনি নিজে চুল বেঁধে উঠে দাঁড়ান এবং গোটা খোতবা শুনেন।[৪০]

ফিকাহ সম্পর্কে তার কতটুকু প্রজ্ঞা ছিল, নিচের ঘটনাবলী থেকে তা আঁচ করা যায় ঃ

হযরত আবূ হোরায়রা মনে করতেন, রমযানে নাপাক হলে রোযা ভেঙ্গে যায়। এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা এবং হযরত উম্মে সালমার নিকট এ ধারণার অনুমোদন চাইলে তারা উভয়ে এটা রদ করে বলেন, স্বয়ং নবীজীকে রমযানে নাপাক অবস্থায় পাওয়া গেছে। হযরত আবূ হোরায়রা

জানতে পেরে অত্যন্ত লজ্জিত হন এবং বলেন, আমি কি করবো, ইবনে আব্বাস আমাকে এটা বলেছেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, উম্মে সালমা এবং আয়েশার জ্ঞান বেশি।[৪১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের আসরের দু'রাকাত নামায পড়তেন। মারওয়ান জিজ্ঞেস করেন, আপনি এ নামায কেন পড়েন? তিনি বললেন, নবীজীও পড়তেন। যেহেতু হযরত আবদুল্লাহ এ হাদীসটি হযরত আয়েশার সিলসিলায় শুনেছেন, তাই মারওয়ান অনুমোদনের জন্য তার নিকট লোক পাঠান। তিনি বললেন, উম্মে সালমার মাধ্যমে এ হাদীসটি আমার কাছে পৌঁছেছে। হযরত উম্মে সালমার কাছে লোক গিয়ে একথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ

يَغْفِرُ اللّٰهُ لِعَائِشَةَ لَقَدْ وَضَعَتْ اَمْرِىْ عَلٰى غَيْرِ مَوْضِعِهٖ اَوَلَمْ. اُخْبِرُهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلْعَمْ قَدْ نَهٰى عَنْهَا.

–আল্লাহ্ আয়েশাকে ক্ষমা করুন। তিনি আমার কথা ভুল বুঝেছেন। আমি তাকে এটা বলিনি যে, নবীজী তা বারণ করেছেন।[৪২]

একবার কোন এক লোককে কিছু একটা মাসআলা বলেন, এতে লোকটি তৃপ্ত হয়নি। তিনি তাঁর কাছ থেকে অন্য স্ত্রীদের কাছে যান। সকলে একই জবাব দেন। ফিরে এসে হযরত উম্মে সালমাকে এটা জানালে তিনি বলেন, দাঁড়াও আমি তোমাকে তৃপ্ত করার ব্যবস্থা করছি। এ সম্পর্কে আমি নবীজীর কাছে হাদীস শুনেছি।[৪৩]

এবার তাঁর সম্পর্কে উম্মতের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত শুনুন। মাহমুদ ইবনে লবীদ বলেন ঃ

كَانَ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ صَلْعَمَ يَحْفِظْنَ مِنْ حَدِيْثِ النَّبِىِّ صَلْعَمَ كَثِيْرًا وَلَامَثَلاً بِعَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ.

নবীজীর স্ত্রীদের সকলেরই বেশি পরিমাণ হাদীস স্মরণ ছিল। কিন্তু আয়েশা এবং উম্মে সালমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।[৪৪]

আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম বলেন, হযরত উম্মে সালমার ফতোয়াগুলো সংকলিত হলে একটা ছোট বই হতে পারে।[৪৫]

ইমামুল হারামাইন বলেন, নারীদের মধ্যে হযরত উম্মে সালমার চেয়ে বেশি সুস্থ মতের আর কাউকে দেখিনি।[৪৬]

ওফাত

তার ওফাত সালের ব্যাপারে দ্বিমত দেখা যায়। ওয়াকেদীর মতে হিজরী ৫৯ সালের শাওয়াল মাসে তার ওফাত হয়েছে। হযরত আবূ হোরায়রা জানাযার নামায পড়ান। ইবনে হাব্বান বলেন, হিজরী ৬১ সালে হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের পর তিনি ইন্তিকাল করেন। আর আবূ খায়সামা বলেন, ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার খেলাফতকালে অর্থাৎ হিজরী ৬০ সালের শেষ দিকে তার ওফাত হয়েছে।[৪৭] কিন্তু আসলে তার ওফাতকাল হচ্ছে হিজরী ৬৩ সাল। এ বছরই হাররার ঘটনা সংঘটিত হয়। অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের অবরোধের জন্য সিরীয় বাহিনী মক্কা শরীফে হামলা চালায়।

ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বৎসর। হযরত আবূ হোরায়রা তার জানাযার নামায পড়ান। নিয়ম অনুযায়ী শাসনকর্তা জানাযার নামায পড়াবার কথা। তখন ওলীদ ইবনে ওতবা ছিলেন মদীনার শাসনকর্তা। কিন্তু হযরত উম্মে সালমার ওছিয়তের কারণে তিনি আসতে পারেননি। তার পরিবর্তে হযরত আবূ হোরায়রা এ দায়িত্ব পালন করেন। কারণ, ফযীলত-মর্যাদার বিবেচনায় তখন তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বড় সাহাবী।[৪৯]

১.২. আল-এছাবা ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮৫, ৩. ঐ. পৃষ্ঠা ৮৮৬, ৫. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫৮৮-৫৮৯, ৬. ঐ, ৮. আল এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৮৮৮, ৯. ১০. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৬০, ১১. আল এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৮৮৮, ১২. যুরকানী ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ২৭৫ ও মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ২৮৯, ১৩. সুনানে নাসাঈ পৃষ্ঠা ৫১১, ১৪. তবকাত ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৬২, ১৫. ঐ, ১৬. তবকাত ইবনে সাআদ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৬১, ১৭. ঐ পৃষ্ঠা ৬৩, ১৮. ঐ, ১৯. ঐ, ২০. তবকাত ৮ম খন্ড, ২১. ছহীহ বোখারী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৮০, ২২. ছহীহ বোখারী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২১৯, ২৩. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২১৩, ২৪. যুরকানী ২য় পৃষ্ঠা ১৫৩, তবকাত ইবনে সাআদ পৃষ্ঠা ৫৪, ২৫. ছহীহ মুসলিম ঈলা অধ্যায়. ২৬. মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৯৮, ২৭. ছহীহ বোখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭২৪. ২৮. মুসনাদ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৩১৫, ২৯. ঐ, ৩০. ছহীহ বোখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ১৯৮, ৩১. মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ২৮৯, ৩২. আল-এস্তীআব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৮০৩, ৩৩. মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ২৯০, ৩৪. ঐ পৃষ্ঠা ৩১৯, ৩৫. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪০, ৩৬. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৮৯, ৩৭. তিরমিযী পৃষ্ঠা ১৫২, ৪০. মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ২৯৯ ও ৩০৩, ৪৩. ঐ পৃষ্ঠা ২৯৭, ৪৪. তবকাত ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ১২২, ৪৫. আ'লামুল মুয়াক্কেঈন ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৩, ৪৬. যুরকানী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ২০২, ৪৭. আল এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৮৮৯, ৪৮. সহীহ মুসলিম ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৪৯৩, ৪৯. তারিখে তাবারী ১৩ খন্ড পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪।

৭.

উম্মুল মু'মেনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা:)

নাম যয়নব, উপনাম উম্মে হাকাম। তিনি ছিলেন আসাদিয়া গোত্রের। আসাদ ইবনে খোযায়মানর নামে এ গোত্রটি পরিচিত।[১] তার বংশধারা এই:

যয়নব ইবনেতে জাহাশ ইবনে রুবাব ইবনে ইয়া'মার ইবনে ছোবরা ইবনে মত্থরা ইবনে কাসীর ইবনে গানাম ইবনে দুদরান ইবনে আসাদ খোযায়মা। মাতা ইমাইয়্যা ছিলেন নবীজীর দাদা আব্দুল মুত্তালেবের কন্যা এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল মুত্তালেবের সৎ বোন। এ রিশতায় হযরত যয়নব ছিলেন মহানবীর আপন ফুফাতো বোন।[২]

ইসলামের দিক থেকে তিনি সাবেকুনে আউয়ালূনদের পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ প্রথম যুগে তিনি ঈমান আনেন। ইবনে কাসীর বলেন ঃ كَانَتْ قَدِيْمَةَ الاِسْلَامِ

প্রাচীনকালে অর্থাৎ গোড়ার দিকে যারা ঈমান এনেছেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। হিজরতে রাসূলে খোদার সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন যেসব স্ত্রী তিনি ছিলেন তাদের একজন।[৩]

হযরত যায়েদ ইবনে হারো ছিলেন নবীজীর আযাদকত্ গোলাম। আর তিনি তার পালক পুত্রও ছিলেন। রাসূলে খোদার নির্দেশে হযরত যয়নবকে তার সাথে বিয়ে দেয়া হয়। বাহ্যত: এ বিয়েটা ছিল একটা মামুলী ব্যাপার। কিন্তু আসলে এটা ছিল ইসলামী সাম্যের নিখাদ শিক্ষার বাস্তব ভিত্তিপ্রস্তর।

গোলামী এমন একটা ব্যাপার ছিল, সেকালের অন্ধ চিন্তাধারণা প্রতি নযর দিয়ে কোরায়েশ এবং বিশেষ করে বনু হাশেম বংশ নিজেদের আভিজাত্যের অহমিকায় তা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। কিন্তু যেহেতু এহেন অর্থহীন বিভেদ মুছে ফেলার জন্যই ইসলামের আগমন হয়েছে, আর হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার দ্বীনী খেদমত এমন ছিল না যে, তার মর্যাদা আযাদ

বক্তিদের চেয়ে কম মনে করা যেতে পারে; তাই নবীজী হ্যরত যয়নবকে তার কাছে বিয়ে দেন। দ্বিতীয় এটাও উদ্দেশ্য ছিল যে, হযরত যায়েদ যয়নবকে কিতাব-সুন্নাহ্র তালীম দেবেন।[৪]

বিবাহ হয়েছে সত্য, কিন্তু হযরত যয়নব এ রিশ্তা পছন্দ করেননি। তিনি বিয়ের আগেও রাসূলে খোদার খেদমতে আরয করেছিলেন, আমি তাকে আমার জন্য পছন্দ করি না।[৫] কেবল রাসূলের নির্দেশ মেনে নেয়ার জন্যই তিনি এ বিয়েতে রাজী হয়েছেন। প্রায় এক বৎসর পর্যন্ত খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসন্তোষ বাড়তে থাকলে হযরত যায়েদ নবীজীর নিকট অভিযোগ করেন ঃ

যয়নব আমার প্রতি যবান দরায় করছে। আমি তাকে তালাক দিতে চাই।[৬]

নবীজী তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললেন, যে তালাক দেবে না। কুরআন মজীদে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ. (الاحزاب : ٣٧)

হে নবী সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তুমি সে ব্যক্তিকে, যার প্রতি আল্লাহ্ এবং তুমি অনুগ্রহ করেছিলে-বলেছিলে যে, তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করো না এবং আল্লাহ্কে ভয় কর।[৭] (সূরা আহযাব, আয়াত–৩৭)

কিন্তু মিল-মিশ হলো না। শেষ পর্যন্ত হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা হযরত যয়নবকে তালাক দেন।[৮]

হ্যরত যয়নবের তালাকের উদ্দত পূর্ণ হলে নবীজী চিন্তা করেন যে, তিনি তারই ফুফাতো বোন এবং তারই হাতে লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়েছেন আর তারই নির্দেশে হযরত যায়েদের নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজী হয়েছেন, তাই তার মনস্তুষ্টির জন্য নবীজী তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেন। তখন পর্যন্ত জাহেলী রসমের চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল এবং পালক পুত্রকে আপন পুত্র বলে মনে করা হতো। নবীজীর পালক পুত্র বলে তিনি যায়েদ ইবনে মোহাম্মদ নামে পরিচিত ছিলেন। এ কারণে মোনাফেকদের আপত্তির কথা চিন্তা করে কিছুটা ইতস্তত: এবং বিলম্ব করলে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ[৯]

وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ.
(الاحزاب : ٣٨)

তুমি অন্তরে তা গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ্ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, তুমি মানুষকে ভয় করছ, অথচ আল্লাহ্ই তো বেশি ভয় পাওয়ার যোগ্য।[১০] (সূরা আহযাব, আয়াত–৩৮)

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকে এ আশংকা দূর করেন এবং মোনাফেকদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেন ঃ

তোমাদের পুরুষদের মধ্যে মোহাম্মদ (সঃ) কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।[১১]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ. (الاحزاب : ٥)

তাদেরকে তাদের পিতার নামে ডাক। এটাই আল্লাহ্র নিকট অধিক সংগত।[১২] (সূরা আহযাব, আয়াত–৫)

এখন আর কোন বাধা ছিল না। তাই তিনি হযরত যায়েদকে বললেন, তুমি যাও এবং যয়নবকে আমার বিয়ের পয়গাম পৌছাও। হযরত যায়েদ হযরত যয়নবের গৃহে গিয়ে বললেন যে, রাসূলাল্লাহ্ তোমাকে বিয়ে করতে চান। তিনি বললেন, যেহেতু আল্লাহ্র নির্দেশ, তাই আমার কিছু বলার নেই। এ জবাবের পর তিনি মসজিদের পথে রওয়ানা হন। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُمْ وَطَرًا وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا.
(الاحزاب : ٣٨)

অতঃপর যায়েদ যখন তার কাছ থেকে হিস্যা পূর্ণ করে তখন আমি তাকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম, যাতে হিস্যা পুরা করার পর মুখ ডাকা পুত্রদের

স্ত্রীদের ব্যাপারে মোমেনদের উপর কোন দোষারোপ না চলে। আল্লাহ্র ইচ্ছা তো পূরণ হবেই।[১৩] (সূরা আহ্যাব, আয়াত–৩৮)

এখন খোদার হুকুম নাযিল হয়েছে। তাই বিবাহ সম্পন্ন হতে আর কোন বাধা ছিল না। নবীজী হযরত যয়নবের অনুমতির অপেক্ষা না করেই তার কাছে যাতায়াত শুরু করেন।[১৪] ওলীমার গোশত-রুটীর ব্যবস্থা করা হয়। মুসলমানরা তৃপ্ত হয়ে তা খান। ওলীমার পরই পর্দার আয়াত নাযিল হয়। এর কারণ দাঁড়ায় এই যে, খাওয়ার পর লোকেরা বসে কথা-বার্তায় মশগুল ছিল। নবীজী তখন হযরত যয়নবের গৃহে অবস্থান করেন। এদের কারণে তাকে বারবার আসতে যেতে হয়, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে মুখে কিছু বলছিলেন না। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنٰهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ. اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لاَيَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ. ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ. وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ اَبَدًا. اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا. (الاحزاب : ٥٣)

–হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে কোন খানার জন্য ডাকা ছাড়া নবীর ঘরে প্রবেশ করবে না। (আর ডাকা হলেও) বরতনের দিকে তাকিয়ে থাকবে না। এজন্য তোমাদেরকে ডাকা হলে তখন প্রবেশ করবে আর খাওয়া শেষ হলে চলে যাবে, কথায় মত্ত হয়ে থাকবে না। কারণ, তোমাদের এ কর্ম নবীকে কষ্ট দেয় আরি তিনি তোমাদেরকে লজ্জা করেন (তাই কিছু বলেন না), আর আল্লাহ্ সত্য বলতে লজ্জা করেন না। আর তোমরা তার কাছে কোন কিছু চাইলে তা চাইবে পর্দার আড়াল থেকে। তোমাদের এমন কাজ তোমাদের নিজেদের এবং স্ত্রীদের অন্তরের জন্য অতি পবিত্র। রাসূলকে কষ্ট দেয়া তোমাদের জন্য সাজেনা আর অতঃপর তার স্ত্রীদেরকে কখনো বিয়ে করা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট এটা বিরাট গুনাহের কাজ। (সূরা আহযাব, আয়াত–৫৩)

অতঃপর নবীজী দরজায় পর্দা ঝুলিয়ে দেন। লোকদের ভিতরে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনা হিজরী ৫ম সালের যিলকদ মাসের।

ইবনে আসীর লিখেছেন যে, অন্যান্য স্ত্রীর তুলনায় হযরত যয়নব তার বিয়ের জন্য গর্ব করতেন এই বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানে আমার আকদ সম্পন্ন করেছেন আর আমার বিয়েতেই নবীজী গোশ্ত-রুটি দ্বারা ওলীমার ব্যবস্থা করেছেন।[১৫]

ইবনে সা'আদ এ ওলীমার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন,

নবীজী তার কোন স্ত্রীর ওলীমা হযরত যয়নবের মতো এতো শান-শওকতের সাথে করেননি। বকরীর গোশ্ত দিয়ে তিনি এ ওলীমা করেন।[১৬]

মুহাম্মদ ইবনে উমর বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত যয়নব নবীজীকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার অন্য স্ত্রীদের মতো নই। তাদের মধ্যে একজনও এমন নেই, যার বিয়ে পিতা-ভাই বা বংশের অন্য কারো অভিভাবকত্বে সম্পন্ন হয়নি। একমাত্র আমিই ব্যতিক্রম। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আসমান থেকে আপনার স্ত্রী করেছেন।[১৭]

উপরের বর্ণনায় হযরত যয়নবের বিয়ের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এতে অন্য কেউ তার শরীক নেই। এ কারণে হযরত আয়েশা হযরত যয়নব সম্পর্কে বলতেন ঃ

আর সত্য কথা এই যে, এ দাবি করার তার অধিকারও ছিল। কারণ তার এ বিয়ে দ্বারা জাহেলী যুগের একটি প্রথার বিলোপ ঘটেছে। যেমন আগে ধারণা করা হতো যে, পালক পুত্রও আসল পুত্রের মতই। আল্লাহ্ তা'আলা তার শেষ নবীর মাধ্যমে এ ধারণার বাস্তব সংস্কার সাধন করেছেন। আযাদ আর গোলামের পার্থক্য তিরোহিত হয়েছে। আর হযরত যায়েদকে বনু হাশেম বংশের মধ্যে সাম্যের প্রতীক করা হয়েছে। পর্দাহীনতার ঘৃণ্য প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে এবং মুসলমনদেরকে পর্দার সাধরণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

চরিত্র-মাধুর্য

হযরত যয়নবের মধ্যে যেসব নৈতিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, খুব কম স্ত্রীই এ ব্যাপারে তাঁর শরীক ছিলেন। এ কারণে হযরত আয়েশার সাথে সব সময়

প্রতিযোগিতামূলক দ্বন্দ্ব চলতো। মানব প্রকৃতির দাবি অনুযায়ী অনেকাংশে ঈর্ষা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্পর্কও ছিল। কিন্তু ইফ্ক (অপবাদের) ঘটনায় হযরত আয়েশা সম্পর্কে তার অভিমত চাওয়া হলে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, আমি তার মধ্যে ভালো ছাড়া অন্য কিছু দেখি না। চিন্তা করলে দেখা যায়, নারীর মতো দুর্বল প্রকৃতির লোকের জন্য এটা ছিল একট নাযুক সময়, বলা চলে এক দুলর্ভ মুহূর্ত। এ ছাড়াও হযরত যয়নবের এক বোন 'হামনা'ও এ ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রায় ছিল হযরত আয়েশার কলুষমুক্তার সাথে সাথে হযরত যয়নবের নিরপেক্ষ সত্যবাদিতা প্রকাশ করে দেয়া। হাফেজ ইবনে হাজার তার বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ্ আল-এছাবা'য় লিখেন ঃ

وَقَدْ وَصَفَتْ عَائِشَةٌ زَيْنَبَ بِالْوَصْفِ الْجَمِيْلِ فِىْ قِصَّةِ الافْكِ.

–ইফকের ঘটনায় হযরত যয়নব হযরত আয়েশার ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১৯] তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার, দরায হস্ত, দানশীলা, খোদার উপর নির্ভরশীলা এবং অল্পে তুষ্ট। এতীম, মিসকীন এর অভিভাবক এবং ফকীরদের সহায়। ইবনে সা'আদ বলেন,

যয়নব ইবনেতে জাহাশ দীনার-দিরহাম কিছুই রেখে যাননি, যা কিছু সম্ভব, ছদকা করে দেন। তিনি ছিলেন মিসকীন তথা নিঃস্ব জনের আশ্রয়স্থ্।[২০]

হযরত আয়েশা (রাঃ) অধিকন্তু তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন,

নবীজীর স্ত্রীদের মধ্যে সৌন্দর্যের বিচারে তাঁর কাছে যয়নব বিনতে জাহাশ ছাড়া কেউ আমার প্রতিপক্ষ ছিল না।[২১]

তিনি হস্ত শিল্পে নিপুণ ছিলেন। চামড়া পাকাতেন আর এ কর্মে লব্ধ সুমদয় অর্থ আল্লাহ্র রাস্তায় বিলিয়ে দিতেন।[২২] উদারতা-দানশীলতায় তিনি ছিলেন নযীরবিহীন। হযরত উমর (রাঃ) তার জন্য বার্ষিক ১২ হাজার দিরহাম বৃত্তি মঞ্জুর করলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। একবার মাত্র গ্রহণ করে বলেছিলেন,

হে খোদা, এ অর্থ আগামী বৎসর যেন আমাকে না পায়। কারণ, এতে ফেৎনা! অতঃপর এ অর্থ নিকটাত্মীয় এবং অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। হযরত উমর (রাঃ) জানতে পেরে বলেন ঃ

ইনি এমন এক নারী, যার কাছে কল্যাণেরই আশা করা যায়। খলীফা ওমর তার গৃহের দরজায় হাযির হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। সালাম জানিয়ে বলেন, আপনি যা কিছু করেছেন, আমি তা জানতে পেরেছি। অতঃপর তার নিজের খরচের জন্য এক হাজার দিরহাম প্রেরণ করেন। তিনি তাও দান করে দেন।[২৩]

তিনি ছিলেন অতি বিনয়ী এবং এবাদাতগুযার মহিলা। একদা নবীজী মুহাজিরদের মধ্যে গনীমতের মাল বণ্টন করছিলেন। তিনি মাঝখানে একটা কিছু বললেন, তখন হযরত উমর (রাঃ) তাকে শাসিয়ে বিরত থাকতে বলেন। নবীজী বাধা দিয়ে বললেন, ওমর, তাকে কিছু বলো না। সে হচ্ছে আউওয়াহ– অতি আবেদ-যাহেদ।[২৪]

গুণ-বৈশিষ্ট্য

হযরত আয়েশার (রাঃ) মতে হযরত যয়নব (রাঃ) ছিলেন বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ এবং মহান মর্যাদার অধিকারিণী। হযরত যয়নবের গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এ থেকেই অনুমান করা যায়। হযরত আয়েশা (রাঃ) তার জীবন ধারা যত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, হাদীস গ্রন্থ সমূহই তার প্রমাণ। আমরা এখানে হযরত আয়েশার কতিপয় উক্তি উল্লেখ করছি।

মূসা ইবনে তারেক তার রেওয়ায়াতে লিখেন যে, হযরত আয়েশা হযরত যয়নবের উল্লেখ করে বলেন,

দ্বীনদারী, তাকওয়া, সত্যবাদিতা, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি, দানশীলতা এবং আত্মত্যাগে তার চেয়ে উত্তম মহিলা আর কেউ ছিল না।[২৫]

আল্লামা ইবনে আবদুল বার অন্য এক প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেন,

আমি দ্বীন সদারীতে হযরত যয়নবের চেয়ে উত্তম মহিলা কখনো দেখিনি।[২৬]

মুহাম্মদ ইবনে উমর মূসা ইবনে মুহাম্মদের উদ্ধৃতিতে হযরত আয়েশার এ উক্তি বিবৃত করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যয়নব ইবনেতে জাহাশের প্রতি রহম করুন। সত্যি দুনিয়ায় তিনি অনন্য মর্যাদা লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীর সাথে তাকে বিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে।[২৭]

হযরত উম্মে সালমা বলেন, তিনি ছিলেন নেক্‌কার, অতি রোযাদার এবং অতি ইবাদাতগুজার স্ত্রী।[২৮]

ওফাত

হযরত উমরের (রা:) খেলাফতকালে হিজরী ২০ সালে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তার ইন্তিকালের বছর মিশর জয় হয়েছে।[২৯] মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৫৩ বৎসর। এটা হাফেয ইবনে হাজার এর বর্ণনা। সাধারণ ঐতিহাসিকদেরও এই মত। ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর মতে হযরত যয়নবের জীবনকাল ছিল ৫০ বছর। অবশ্য অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ মত সমর্থন করেন না।[৩০]

হযরত যয়নবের দানশীলতার অভ্যাস শেষ জীবন পর্যন্ত বহাল ছিল। ইন্তি কালের সময় কাছে কিছুই ছিল না। তিনি একটি মাত্র গৃহ স্মৃতি হিসেবে রেখে যান। উমাইয়্যা খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক তা তার আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ৫০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত করেন।[৩১]

মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাকীদ দিয়ে বলে যান যে, আমি আমার কাফন তৈয়ার করে রেখেছি। উমর আমার জন্য কাপড় পাঠাতে পারে। এমন হলে এক প্রস্থ কাফন ছদকা করে দেবে।[৩২] তিনি এ ওছিয়তও করে যান যে, রাসূলে খোদার খাটিয়ায় আমাকে দাফন করতে নিয়ে যাবে। হযরত আবূ বকরের পর নবীর খাটিয়ায় যাদেরকে তোলা হয়েছে, তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা।[৩৩]

হযরত উমর জানাযার নামায পড়ান। জান্নাতুল বাকী'তে তাকে দাফন করা হয়। আকীল এবং ইবনে হানফিয়ার কবরের মধ্যস্থলে তার কবর ছিল। সে দিন খুব গরম ছিল। কবর খননের স্থানে হযরত উমর তাঁবুর ব্যবস্থা করেন। বলা হয়ে থাকে যে, জান্নাতুল বাকীতে কবর খননের জন্য এটা ছিল প্রথম তাঁবু।[৩৪]

দাফনের সময় হযরত উমর (রা:) আযওয়াজে মুতাহহারাতের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নেন যে, যয়নবের কবরে কে কে নামবে। জবাবে বলা হয়, তার জীবদ্দশায় যারা তার নিকট যাতায়াত করতো।[৩৫] তাই হযরত

উমরের নির্দেশে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, উসামা ইবনে যায়েদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ আহমদ ইবনে জাহাশ এবং মুহাম্মদ ইবনে তাল্‌হা কবরে নামেন। এরা সকলেই ছিলেন হযরত যয়নবের নিকটাত্মীয়।[৩৬]

তার মৃত্যুতে হযরত আয়েশা সবচেয়ে বেশি শোকাহত হন। হযরত যয়নবের ইন্তিকালে তিনি বলেন, ভাগ্যবতী অনন্যা মহিলা বিদায় নিয়েছেন। এতীমরা হয়ে পড়েছে অস্থির-ব্যাকুল। তিনি ছিলেন এতীমদের আশ্রয়স্থল।[৩৭]

নবীজীর নিম্নোক্তি হযরত যয়নব প্রসঙ্গে বলে খ্যাত আছে। ওফাতের পূর্বে নবীজী স্ত্রীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ اَسْرَعُكُنَّ لُحُوْقًابِىْ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا.

তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে দরায, সে সকলের আগে আমার সাথে মিলিত হবে। হাত দরাযের অর্থ দানশীলতা। স্ত্রীরা এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেন। সকলে একত্র হলে একে অন্যের হাত মাপতেন। হযরত যয়নবের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এমনটি চলে। এরপর তারা নবীজীর কথার আসল অর্থ বুঝতে সক্ষম হন। তাই হযরত আয়েশা এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, আমাদের মধ্যে হযরত যয়নব ছিলেন সবচেয়ে দরায হাত। কারণ তিনি নিজ হাতের উপার্জন থেকে ছদকা করতেন।[৩৮]

১. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৬৩, ২. তবকাতে ইবনে সা'আদ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৭১, ৩. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৬৩, ৪. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৬৩, ৫. তবকাত ৮ম পৃষ্টা ৭১, ৬. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৬৩, ৭. সূরা আহযাব : ৩৭, ৮. তবকাত ৮ম খন্ড ৭১, ৯. ফতহুল বারী, তাফসীরে সূরায়ে আহযাব ও তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৭৩, ১০. সূরা আহযাব : ৩৭, ১১. সূরা আহযাব : ৪০, ১২. সূরা আহযাব ; ৪০ম, ১৩. সূরা আহযাব ; ৩৭, ১৩. সূরা আহযাব : ৩৭, ১৪. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৬৪, ১৫. তবকাতে ইবনেস সাআদ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫, ১৬. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫, ১৭. ঐ পৃষ্ঠা ৭৬, ১৮. আল-এছাবাহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬০, ১৯. ঐ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫, ২০. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮১, ২১. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৬৪, ২২. আল-এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬০২, ২৩. ঐ, ২৪. ঐ, ২৫. আল এস্তীআব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৫৪, ২৬. ঐ, ২৭. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৭৬, ২৮. আল এছাবাহা ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬০১, ২৯. আল এস্তীআব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭০৫, ৩০. এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬০৩, ৩১. তবাকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮৭, ৩২. ঐ, ৩৩. ঐ, ৩৪. ঐ পৃষ্ঠা ৭৭ ও ৮০, ৩৫. ঐ পৃষ্ঠা ৭৭, ৩৬. ঐ পৃষ্ঠা ৮১, ৩৭. ঐ পৃষ্ঠা, ৩৮. আল-এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬০১।

৮.

উম্মুল মু'মেনীন হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস (রাঃ)

নাম জুয়াইরিয়া। তিনি বনু খোযায়ার মুছতালেক গোত্রের ছিলেন। বংশধারা জুয়াইরিয়া ইবনেতে হারেস ইবনে আবূ যিরার ইবনে হাবীব ইবনে আয়েয ইবনে মালেক ইবনে খোযায়মা মুছতালেক।[১] মুসাফে' ইবনে ছফওয়ান মুছতালেকীর সাথে তার প্রথম বিয়ে হয়।[২] মুসাফে' ছিলেন তার চাচাতো ভাই। তিনি ইবনে যিশ-শিয়্যির নামে পরিচিত ছিলেন।[৩]

মিরিসী এর যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী ৫ সালে, মতান্তরে হিজরী ৬ সালে। এ যুদ্ধ বনু মুছতালেক যুদ্ধ বলেও পরিচিত। এ যুদ্ধের পর গনীমতের মাল হিসেবে তিনি মুসলমানদের হস্তগত হন। তিনি নেতা গোত্রের মেয়ে। চেহারা ছিল সুন্দর এবং মেযাজ ছিল নাজুক। তাই দাসী হয়ে থাকা তিনি মেনে নিতে পারেননি। সাবেত এর নিকট টাকার বিনিময়ে মুক্ত হওয়ার আবেদন জানা। তিনি মুক্ত করতে রাযী হলে নবীজীর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বিপদে পড়েছি। নিজেকে মুক্ত করতে চাই। আপনি আমার সাহায্য করুন। নবীজী এরশাদ করেন, আমি তোমার মুক্তিপণ পরিশোধ করে তোমাকে বিয়ে করলে তা উত্তম হবে না? তিনি বললেন, ভালোই হয়। তাই হলো। নবীজী টাকা দিয়ে তাকে মুক্ত করে বিয়ে করলেন। নবীজীর সাথে তার বিয়ের কথা জানতে পেরে মুসলমান বনু মুছতালেকের সমস্ত বন্দীকে মুক্ত করে দেন। কারণ, এখন নবীজীর নৈকট্য তাদেরকে অধীন করে রাখার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইবনুল আসীর বলেন, এর সব কৃতিত্বই হযরত জুয়াইরিয়ার প্রাপ্য। হযরত আয়েশা এ উপলক্ষ্যে হযরত জুয়াইরিয়ার প্রশংসা করে বলেন, আমি কোন নারীকে নিজ জাতির প্রতি জুয়াইরিয়ার চেয়ে বেশি বরকতের কারণ হতে দেখিনি।[৪]

নবীজীর সাথে তার বিয়ে সম্পন্ন হবার খবর তার অভিভাবকরা তখনও জানতেন না। বিয়ের কিছু দিন পর হারেস ইবনে আবূ যিরার উষ্ট্রের পিঠে মাল-সামাল বোজাই করে তাকে মুক্ত করার জন্য মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথে আকীক নামক স্থানে উট ছেড়ে দেন চরাবার জন্য। এগুলোর মধ্যে দুটি উট তার বেশ পছন্দ ছিল্ তাই উট দুটি পাহাড়ে লুকিয়ে রাখেন। মদীনায় উপস্থিত হয়ে মহানবীর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, তুমি আমার কন্যাকে বন্দী করে এনেছ। এই নাও তার ফিদিয়া, আর মুক্ত করে আমার নিকট ফিরিয়ে দাও আমার কন্যাকে। এ বলে ফিদিয়ার মাল উট ইত্যাদি নবীজীর খেদমতে পেশ করলেন। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, আকীক পাহাড়ে যে উটগুলো লুকিয়ে রেখেছ, সেগুলো কোথায়?

উট লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটি রাসূলে খোদা জানেন– একথা বুঝতে পেরে হারেস প্রভাবিত হয়ে তখনই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি জানতে পারলেন যে, কন্যাকে মুক্ত করার জন্য তিনি কষ্ট স্বীকার করে সুদূর মদীনা হাযির হয়েছেন, সে তার আগেই নবীজীর হেরেমের রওনক সেজে বসে আছে। তার কন্যার ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। সকলে জুয়াইরিয়ার সাথে দেখা করে বাড়ি ফিরে যান।[৫]

হযরত জুয়াইরিয়ার পূর্ব নাম ছিল বাররা। নবীজী তার নাম পরিবর্তন করে জুয়াইরিয়া রাখেন। কারণ তার পূর্ব নামে এক ধরনের কুলক্ষণ ছিল। এতে আত্ম প্রশংসার একটা দিকও ছিল। ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় আছে, বাররার কাছ থেকে চলে এসো, একথা নবীজী পছন্দ করতেন না। কিন্তু আমাদের মতে এ ব্যাখ্যার জবাবে– لَاتُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ. তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র ধারণা করবে না, এ আয়াতের ব্যাখ্যা অধিক যুক্তিযুক্ত।[৬]

হযরত জুয়াইরিয়ার মহর সম্পর্কে ইবনে সাআদ বলেন, বনু মুছতালেকের সকল বন্দীকে মুক্ত করা তার মহর সাব্যস্ত হয়।[৭]

মহানবীর সাথে তার বিয়ে হয়, তখন তিনি যুবতী মাত্র। চেহারা সূরতও ছিল চমৎকার। তার বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত আয়েশা বলেন ঃ

জুরাইরিয়ার মধ্যে মিষ্টতা-কমনীয়তা উভয় গুণই বিদ্যমান ছিল। কেউ তাকে দেখে অন্তরে স্থান না দিয়ে পারতো না।[৮]

চরিত্র-মাধুর্য

তিনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্না ছিলেন। আত্ম-মর্যাদার প্রতি খুব বেশি লক্ষ্য রাখতেন। নিজেকে বন্দী জীবন থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা-সাধনাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইবাদতের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই যত্নবান। অনেক বর্ণনায়ই দেখা যায়, নবীজী গৃহে ফিরে তাকে তাসবীহ-তাহলীলে মগ্ন দেখতেন।[৯]

উসদুল গাবাহ্ গ্রন্থের রচয়িতা বলেন, একবার নবীজী জুয়াইরিয়ার গৃহে গিয়ে তাকে তাসবীহ-তাহলীলে দেখে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখাবো না, যা উচ্চারণ করা তোমার নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম? অতঃপর তিনি এ কথাগুলো তালীম দেন ঃ[১০]

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللهِ رِضَى نَفْسِهِ
سُبْحَانَ اللهِ رِضَى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ.

ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ বর্ণনা করেন যে, জুমার দিন নবীজী হযরত জুয়াইরিয়ার কাছে যান। সেদিন তিনি রোযা রেখেছিলেন। নবীজী যেহেতু একটা রোযা রাখাকে মাকরূহ মনে করতেন, তাই জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলেন? বললেন, না। আগামীকাল রাখবে? বললেন, না। নবীজী বললেন, তাহলে রোযা ভেঙ্গে ফেল।[১১]

মহানবী তাকে খুব ভালোবাসতেন। একবার তিনি ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, খাওয়ার কিছু আছে কি? বললেন, আমার এক দাসী ছদকার কিছু গোশত দিয়েছে, তাই আছে। এছাড়া আর কিছু নেই। নবীজী বললেন, তাই নিয়ে এসো। কারণ, যাকে ছদকা দেয়া হয়েছে, তার কাছে তা পৌঁছেছে।[১২]

ওফাত

৬৫ বৎসর বয়সে হিজরী ৫০ সালে হযরত জুয়াইরিয়া ইন্তিকাল করেন। মুহাম্মদ ইবনে ওমরের বর্ণনা মতে হিজরী ৫৬ সালে আমীর মুয়াবিয়ার

শাসনকালে তিনি ইন্তিকাল করেন। তখন ছিল রবিউল আউয়াল মাস। মদীনার তদানীন্তন গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকাম তার জানাযার নামায পড়ান। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়।[১৩]

তিনি ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদা ও পূর্ণতার অধিকারী মহিলা। নবীজী থেকে কয়েকটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। নিম্নোক্ত বুযুর্গরা তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাস, জাবের, ইবনে ওমর, ওবাইদ ইবনুস সাবাক, তোফাইল, আবূ আইউব মারাগী, মুজাহিদ, কোরাইব, কুলসুম ইবনে মুছতালেক এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ ইবনুল হাদ।

১. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮৩, ২. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৩১, ৩. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪২০, ৪. ঐ, ৫. ঐ, ৬. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮৪, ৭. ঐ, ৮. আল এস্তীআব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৩১, ৯. আল-এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৫১, ১০. সুদুল গাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৪২১, ১১. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৮৫, ১২. ছহীহ মুসরিম ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৪, ১৩. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮৫।

৯

উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)

তার নাম ছিল রামলা। এ নামই প্রসিদ্ধ। কারো কারো মতে তার নাম ছিল হিন্দ। কিন্তু নামের তুলনায় কুন্ইয়াত বা ডাক নাম উম্মে হাবীবা বেশি পরিচিত। তার মাতা ছিলেন ছফিয়া ইবনেতে আবিল আছ। ইনি ছিলেন হযরত ওসমান (রা:) এর ফুফী। তার পিতার নাম ছিল আবূ সুফিয়ান ছখর ইবনে হারব ইবনে উমাইয়্যা ইবনে আবদে শামস।[১]

নবীজীর নবুয়্যাত লাভের ১৭ বৎসর পূর্বে তার জন্ম হয়।[২] ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ ইবনে রুবাবের সাথে তার প্রথম বিয়ে হয়। তিনি ছিলেন বনু আসাদ ইবনে খোযায়মার খান্দানের লোক এবং হারব ইবনে উমাইয়্যার বন্ধু।

হিজরত ও ইসলাম গ্রহণ

স্বামীর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হাবশায় হিজরত করেন। এখানে পৌঁছলে ওবায়দুল্লাহ্র ঔরসে তার কন্যা সন্তান হাবীবার জন্ম হয়। এ কন্যার নামেই তিনি উম্মে হাবীবা বলে খ্যাত হন।[৩] কিছুদিন পর স্বামী ওবায়দুল্লাহ্ ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন।তার ধর্ম ত্যাগের পূর্বে হযরত উম্মে হাবীবা তাকে অত্যন্ত বীভৎস আকৃতিতে স্বপ্নে দেখেন। এ স্বপ্নের ফলে তিনি খুব ঘাবড়ে যান এবং মনে মনে বলেন, সত্যিই তার অবস্থা খারাপ বলে মনে হচ্ছে। ভোরে ওবায়দুল্লাহ তাকে বললেন, উম্মে হাবীবা! ধর্মের ব্যাপারে চিন্তা করে বুঝলাম খৃষ্টবাদের চেয়ে উত্তম ধর্ম নেই। আমি ইতিপূর্বে মুসলমান হলেও এখন পুনরায় খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করছি। হযরত উম্মে হাবীবা খুব তিরস্কার করলেন, স্বপ্নের কথাও বললেন। কিন্তু তার ওপর কোন প্রভাব পড়লোনা কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। শেষ পর্যন্ত তিনি

খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মত্যাগীর জীবন যাপন করে মদ্যপান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।[৪]

দ্বিতীয় বিয়ে

স্বামীর ধর্ম ত্যাগের পর উম্মে হাবীবা হাবশায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছিলেন। ইদ্দত পূর্ণ হলে মহানবী বিয়ের পয়গাম নিয়ে আমর ইবনে উমাইয়া যামরীকে হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করেন। তার পৌঁছা মাত্রই নাজ্জাশী স্বীয় দাসী আবরারার মাধ্যমে উম্মে হাবীবার নিকট রাসূলে খোদার পয়গাম পৌঁছান। তিনি একথাও মুখে বলে দেন যে, মহানবী তোমার বিয়ের জন্য আমার কাছে লিখেছেন। বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য তুমি কাউকে উকীল নিযুক্ত কর। নবীজীর পক্ষ থেকে বিয়ের পয়গামের কথা শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আবরাহাকে দু'টি রূপার চুড়ি, পায়ের দুটি মল এবং দু'টি রূপার আংটি দান করেন। খালেদ ইবনে সাঈদকে এ সম্পর্কে অবহিত করে তাকে উকীল নিযুক্ত করেন। সন্ধ্যা হলে নাজ্জাশী স্থানীয় মুসলমান এবং জাফর ইবনে আবূ তালেবকে ডেকে নিজে বিবাহ পড়ান। মোহরানার চারশ' দীনারও নিজের পক্ষ থেকে খালেদ ইবনে সাঈদকে দেন। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে সকলে খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে খালেদ ইবনে সাঈদ দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশ্য বলেন, বিবাহ উপলক্ষ্যে খাওয়ার আয়োজন করা আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নত। অতঃপর সকলকে ভোজে আপ্যায়িত করে বিদায় দেন।[৫]

এ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে হিজরী ৬ বা ৭ সালে। তখন উম্মে হাবীবার বয়স ৩৬/৩৭ হবে। বিয়ের পর হাবশা থেকে জাহাজ যোগে রওয়ানা হন। জাহাজ এসে মদীনার বন্দরে ভিড়ে। নবীজী তখন খায়বরে অবস্থান করছিলেন।[৬]

তবকাত এবং মুসনাদ ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য জীবন চরিত গ্রন্থ থেকে বিয়ের বর্ণনা গৃহিত হয়েছে। বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু এ বিবাহে মোহরানার পরিমাণ সম্পর্কে রেওয়াত ঠিক বলে মনে হয় না। আল্লামা ইবনে আবদুল বার, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এসব বিশেষজ্ঞরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে লিখেছেন যে, আয়ওয়াজে মুতাহহারাত এবং নবী দুলালীদের মোহর ছিল চারশ' দিরহাম। এ ব্যাপারে তেমন মতবিরোধ নেই। এ কারণে মোহরের পরিমাণ নির্ভরযোগ্য নয় বলে মনে হয়।

চরিত্র মাধুর্য

হযরত উম্মে হাবীবা ছিলেন বড় মযবুত ঈমানের অধিকারী মহিলা। এ ব্যাপারে তিনি কারো কোন পরোওয়া করতেন না, তা সে যতবড় বন্ধু এবং আত্মীয়ই হোকনা কেন। তার পিতা আবূ সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণের আগে মহানবীর দরবারে মদীনায় হাযির হন সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য। এ সময় তিনি স্বীয় কন্যা উম্মে হাবীবাকেও দেখতে পান এবং হযরতের বিছানা মোবারকে বসতে উদ্যত হলে হযরত উম্মে হাবীবা তা গুটিয়ে দেন। নবীজীর বিছানায় পিতার বসাও তিনি বরদাশ্‌ত করতে পারেননি। এতে আবূ সুফিয়ান অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, কন্যা, তোমার কাছে বিছানাটাই প্রিয় যে, তুমি আমার মুখের দিকেও তাকালে না? জবাবে তিনি বললেন, পিতা! এটা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর বিছানা। আপনি যেহেতু মুশরেক, তাই নাপাক। আবূ সুফিয়ান বললেন, আমার পর তুমি অনেক অকল্যাণে জড়িয়ে পড়লে।[৭]

হাদীসের ওপর আমল করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন কঠোর। এ জন্য অন্যদেরকেও তাকীদ করতেন। একবার তার ভাগ্নে আবূ সুফিয়ান ইবনে সাঈদ আসেন। তিনি ছাতু খেয়ে কুলী না করলে বললেন, তোমার কুলী করা উচিত ছিল। কারণ নবীজী বলেছেন, আগুনে পাকানো জিনিস খেলে অযু করতে হয়।[৮] তিনি মহানবীর নিকট শুনেছিলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক ১২ রাকাত নফল নামায পড়ে, তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরী করা হবে। হুজুরের এ বাণী তিনি নিষ্ঠার সাথে নিয়মিত পালন করতেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, অতঃপর আমি নিয়মিত ১২ রাকায়াত নামায পড়তাম।[৯]

তার পিতা আবূ সুফিয়ানের ইন্তিকাল হলে খোশবু চেয়ে নিয়ে চেহারা এবং বাহুতে মাখেন এবং বলেন, ঈমানদার নারীর জন্য তিন দিনের বেশি শোক করা জায়েয নেই, অবশ্য স্বামী ছাড়া। স্বামীর জন্য স্ত্রীর শোক করার মেয়াদ হচ্ছে চার মাস দশ দিন। নবীজীকে একথা বলতে না শুনলে এ ব্যাপারে আমার কোন খবরই ছিল না।[১০]

ওফাত

হিজরী ৪৪ সালে আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন এবং মদীনা শরীফে তাকে দাফন করা হয়। ইনতিকালের

পূর্বে হযরত আয়েশাকে ডেকে বললেন, আমার এবং আপনার মধ্যে সতীনের মতো সম্পর্ক ছিল। কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে মাফ করে দেবেন এবং আমার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করবেন। হযরত আয়েশা দোয়া করলে বললেন, আপনি আমাকে খুশি করেছেন, আল্লাহ্ আপনাকে খুশি করুন।[১১]

তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিজ্ঞ এবং বহুগুণের অধিকারীণী। হাদীস শাস্ত্রে তার কয়েকজন শাগরেদ ছিলেন এবং বলা হয়ে থাকে, তার কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬৫। নবীজী এবং উম্মুল মুমেনীন হযরত যয়নব ইবনেতে জাহাশ থেকে তিনি এ হাদীসগুলো বর্ণনা করেন। যারা তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

হাবীবা ইবনেতে ওবায়দুল্লাহ, মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান, আকীলা ইবনেতে আবূ সুফিয়ান, আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে সুফিয়ান, আবূ সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ইবনুল মুগীরা, সালেম ইবনে সেওয়ার ইবনুল জারারহ্, ছফিয়াহ ইবনেতে শায়বা, যয়নব ইবনেতে উম্মে সালমা, ওরওয়া ইবনে যুবাইর, আবূ ছালেহ সাম্মান প্রমুখ।[১২]

তার কবর সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর বর্ণনা রয়েছে। আল-এস্তীআব গ্রন্থ রচয়িতা লিখেছেন যে, যয়নুল আবেদীন (রাঃ) তার গৃহের একাংশ খনন করলে একটা শিলালিপি পাওয়া যায়। এতে লেখা ছিল ঃ هذا قَبْرَ رَمْلَةَ بِنْتِ صَخْرٍ.

এটা রামলা ইবনেতে ছাখর এর কবর। তিনি এটা দেখে শিলালিপিটি যথাস্থানে রেখে দেন।[১৩] এ থেকে জানা যায় যে, তার কবর ছিল হযরত আলীর (রাঃ) ঘরে। তার দাফন সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায়নি।

১. আল এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৫৮৪, ২. ঐ, ৩. ঐ, ৪. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৬৮, ৫. মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৪২৭, তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৬৯, ৬. মুসনাদ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৪২৭, ৭. আল এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৫৮৬, ৮. মুসনাদ ৬ষ্ট খণ্ড পৃষ্ঠা ৩২৬, ৯. সহীহ বোখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩২৭, ১০. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৭০, ছহীহ বোখারী, ১১. আল এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৫৮৭, ১২. ঐ, ১৩. আল-এস্তীয়াব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৫।

১০

উম্মুল মু'মেনীন হযরত ছফিয়্যা বিনতে হুইয়াই (রাঃ)

তার নাম ছফিয়্যা। তার পিতা ছিলেন হযরত হারূন ইবনে ইমরান আলাইহিস সালামের অধস্তন পুরুষ। এজন্যই তাকে বলা হয় ছফিয়্যা ইবনেতে হুইয়াই ইসরাঈলিয়া। তার বংশধারা এই: ছফিয়্যা ইবনেতে হুইয়াই ইবনে আখতাব ইবনে সাঈদ ইবনে আমের ইবনে ওবাইদ ইবনে কাআব ইবনুল খাযরাজ ইবনে আবু হাবীব ইবনে নুছাইর ইবনে নাহহাম ইবনে মাইখুম। তার মাতা ছিলেন বাররা ইবনেতে সামওয়ান। তার বংশধারা ইহুদীদের মশহুর খান্দান কুরাইযার সাথে মিলিত হয়েছে। এ হিসেবে হযরত ছফিয়্যার পিতৃকুল বনু নযীর এবং মাতৃকুল বনু কুরাইযার ইহুদীদের এক বংশে গিয়ে মিলিত।[১]

তার পিতা এবং দাদা উভয়ই ছিলেন জাতির সম্ভ্রান্ত এবং সম্মানিত নেতা। আর এ কারণে বনী ইসরাঈলের সকল আরবীয় গোত্রের মধ্যে তাকে বিশিষ্ট মর্যাদা দেয়া হতো। তার পিতা হুইয়াই ইবনে আখতাবকে অসীম সম্মান করা হতো। জাতির সব লোক ইবনো দ্বিধায় তার নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব মেনে নেয়। তার মাতা বাররা ছিলেন সামওয়ান এর কন্যা, শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বের জন্য তিনি গোটা জাযিরাতুল আরবে বহু খ্যাত ছিলেন। মোট কথা, হযরত ছফিয়্যার বংশধারা এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল।

বিবাহ

তার প্রথম বিয়ে হয় সালাম ইবনে মিশকাম আল-কারাযীর সাথে। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ কবি এবং সর্দার। তিনি তালাক দেওয়ার পর কেনানা ইবনে আবূল আফীফ এর সাথে তার বিয়ে হয়। মর্যাদার দিক থেকে তিনিও সালাম ইবনে মিশকামের চেয়ে কম ছিলেন না। তিনি ছিলেন খায়বরের

নামকরা দুর্গ আলকামুদ এর সর্দার। পরিবার পরিজন নিয়ে তিনি এখানেই বসবাস করতেন। খায়বরে মুসলমানদের বিস্ময়কর বিজয় সূচিত হলে আলকামুদ এর মতো সুরক্ষিত দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়। এ সময় কেনানা ইবনে আবূল আফীফ দুর্গের অভ্যন্তরে নিহত হয় এবং হযরত ছফিয়্যাসহ তার পরিবার-পরিজন বন্দী হয়।

ইহুদীদের জন্য খায়বর যুদ্ধ ধ্বংসকর প্রমাণিত হয়। এ যুদ্ধের ফলে তাদের সকল আশা-আকাঙ্খা দুলিসাৎ হয়ে যায়। এ যুদ্ধে তাদের নামকরা সর্দাররা মারা যায়। হযরত ছফিয়্যার পিতা এবং ভাইও এদের মধ্যে ছিলেন। এ কারণে যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে হযরত ছফিয়্যা বিশেষ মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন।

গণীমতের মালামাল বণ্টনের সময় সকল বন্দীকেও হাযির করা হয়। এ সময় দেহ্ইয়া কাল্বী নবীজীর খেদমতে নিবেদন করেন যে, আমার একজন দাসী প্রয়োজন। নবীজী বেছে নেয়ার অনুমতি দেন। দেহইয়া হযরত ছফিয়্যাকে পছন্দ করেন। মান-মর্যাদা বিচারে তিনি ছিলেন অনেক উর্ধ্বে। তাই দেহইয়ার দাসী হিসেবে তাকে দেওয়া ঠিক হয় না। তদুপরি তার সাথে সাধারণ বন্দীদের মতো আচরণ করাও সাজে না। এ কারণে কোন কোন সাহাবী আরয করেন যে, ছফিয়্যা বনু এবং নযীর বনু কুরাইযার রইস মহিলা। সে তো আপনার জন্যই শোভা পায়। নবীজী এ পরামর্শ কবুল করেন। তিনি দেহ্ইয়াকে অন্য দাস দিয়ে ছফিয়্যাকে মুক্ত করে বিয়ে করেন।[২] এটা হিজরী ৭ম সালের ঘটনা। বিয়ের পর খায়বর রওয়ানা হলে ছহ্বা নামক স্থানে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। এখানে ওয়ালিমা ভোজ সম্পন্ন হয়। ছহ্বা থেকে আগমনকালে নবীজী তাকে নিজ উটের পিঠে বসান আর নিজের জুব্বা দিয়ে তাঁকে ছায়া দেন, যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, হযরত ছফিয়্যাও আয্ওয়াজে মুতাহ্হারাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।[৩]

নবীজী মদীনায় পৌছে হযরত ছফিয়্যাকে নিয়ে হযরত হারেস ইবনে নু'মান এর বাসায় গমন করেন। তিনি ছিলেন মহানবীর অত্যন্ত প্রিয় সাহাবী। আল্লাহ্ তাঁকে সম্পদও দিয়েছিলেন অনেক। তিনি হযরতের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এ সময় তাঁর আত্মত্যাগ অনেক কাজে এসেছে।

উম্মে সেনান সালামিয়ার বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ছফিয়্যার রূপ-সৌন্দর্যের কথা শুনে আনসারদের অন্যান্য নারীদের সাথে হযরত যয়নব ইবনেতে জাহাশ, হযরত হাফসা, হযরত আয়েশা এবং হযরত জুয়াইরিয়া তাঁকে দেখার জন্য সকলে বোরকা পরে ঘরে যান। আতা ইবনে ইয়াসার এর বর্ণনা মতে দেখা যায়, হযরত ছফিয়্যার রূপ-সৌন্দর্যের বিষয় শুনে আনসারদের নারীরাও তাঁকে দেখতে যান। হযরত আয়েশাও নেকাব পরে এদের সঙ্গী হন।এরা চলে যাওয়ার সময় নবীজী পেছনে আসেন এবং হযরত আয়েশাকে বলেন ঃ كَيْفَ رَايْتِهَا يَا عَائِشَةُ. – আয়েশা, তাকে কেমন দেখলে? তিনি বললেন, সেতো ইহুদী নারী। হযরত বললেন, এমন কথা বলবে না। সে তো মুসলমান হয়েছে। এখন ইসলামে সে উত্তম।[৪]

চরিত্র-মাধুর্য

তিনি ছিলেন অতি ঠান্ডা মেজাজের মহিলা। নিজেকে সংবরণ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার মধ্যে। আল-কামুদ দুর্গ বিজয়ের পর যখন খায়বরে ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয় তখন হযরত বেলাল, হযরত ছফিয়্যা এবং তার চাচাতো বোনকে নবীজীর দরবারে নিয়ে গমন করেন। পথে তারা ইহুদীদের লাশ দেখতে পান। এমন নাযুক পরিস্থিতিতে নিজেকে সংরবণ করা খুবই কঠিন কাজ। এ সময় অনেক পাষাণ হৃদয়ও কেঁপে ওঠে, ভেঙ্গে পড়ে। সাথের অন্যান্য মহিলারা এ দৃশ্য দেখে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু হযরত ছফিয়্যা এ সময়ও ছিলেন ধীর-শান্ত। প্রিয় স্বামীর লাশ দেখে তার চেহারায় শোকের রেখা পড়েনি।[৫]

তার জনৈক দাসী হযরত উমরের নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, এর মধ্যে এখনও ইহুদীদের গন্ধ পাওয়া যায়। কারণ সে এখনও শনিবারকে ভালোবাসে। ইহুদীদের সাথে এখনও তার সম্পর্ক রয়েছে। হযরত উমর এ অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য লোক মারফত তার কাছ থেকে জেনে নেন। জবাবে তিনি বলে, শনিবারকে ভালোবাসার কোন প্রয়োজন নেই। ইহুদীদের সঙ্গে তো আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তার প্রতি আমাকে লক্ষ্য রাখতে হয়। অতঃপর দাসীকে জিজ্ঞেস করেন, কে তোমাকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে বললো, শয়তান। এটা শুনে হযরত ছফিয়্যা চুপ থাকেন এবং দাসীকে মুক্ত করে দেন।[৬]

তিনি রাসূলে খোদাকে অতি ভালোবাসতেন। নবীজী অসুস্থ হলে সমস্ত স্ত্রীরা যখন তাকে দেখতে আসেন, তখন হযরত ছফিয়্যা দুঃখ করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সব দুঃখ যদি আমি পেতাম। তার মুখে একথা শুনে অন্যান্য স্ত্রীরা একে অপরের মুখ পানে তাকান। হযরত বললেন, খোদার কসম, সে সত্যবাদী নারী।[৭]

তার প্রতি নবীজীর ভালোবাসাও প্রায় এমনই ছিল। তিনিও হযরত ছফিয়্যাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তার মন জয় করার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। একবার সফরে ছিলেন। অন্যান্য স্ত্রীরাও সঙ্গে ছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত ছফিয়্যার উট অসুখে পড়ে। তিনি ঘাবড়ে গেলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। নবীজী জানতে পেরে নিজেও তার নিকট গমন করেন এবং আপন হস্ত মোবারক দ্বারা তার চোখের পানি মুছে দেন। কিন্তু এর ফলে তার কান্না আরও বেড়ে যায়। অবশেষে সকলকে নিয়ে নবীজী নেমে পড়েন। সন্ধ্যা হলে যয়নব ইবনেতে জাহাশকে বললেন, যয়নব তুমি ছফিয়্যাকে একটা উট দাও। যয়নব বললেন, আমি কি ঐ ইহুদী নারীকে আমার উট দেবো? তার এ উক্তি হযরতের নিকট অত্যন্ত অসহ্য লাগে। এতে তিনি এতটা অসন্তুষ্ট হন যে, ২/৩ মাস হযরত যয়নবের সাথে কথা পর্যন্ত বলেননি। এর পর হযরত আয়েশা বড় কষ্টে মাফ করিয়ে নেন।[৮]

ইসলাম গ্রহণ করার পর ইহুদীপনার অভিযোগ তার জন্য ছিল অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তার প্রতি এ ধরনের টিপ্পনী কাটা হলে মাঝে মাঝে তিনি রীতিমতো মর্মাহত হতেন। একবার নবীজী ঘরে এসে দেখেন, হযরত ছফিয়্যা কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, আয়েশা ও যয়নব বলছে, সমস্ত নারীদের মধ্যে তারা উত্তম। কারণ, তারা স্ত্রী ছাড়াও আপনার চাচাতো বোন। নবীজী তার মন জয় করার জন্য বললেন, তুমি কেন বললে না যে, আমার পিতা হারূন, চাচা মূসা এবং আমার স্বামী হচ্ছে মুহাম্মদ (সঃ)। সুতরাং তোমরা কি করে উত্তম হবে?[৯]

দেরায়াতের বিচারে এ হাদীস সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠেনা। হয়তো নবীজী এমনটি বলেছেন। ইবনে সা'আদ, হাফেয ইবনে হাজার ইত্যাকার সকল জীবন চরিতকার নিজ নিজ গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অবশ্য রেওয়ায়েতের বিচারে এ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযীর অভিমত এই,

هذا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ الاَّ مِنْ حَدِيْثِ هَاشِمِ الْكُوْفِيْ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِذَلِكَ.

এ হচ্ছে গরীব হাদীস। হাশেম সূফী ব্যতীত অন্য কারো কাছে আমরা এটা শুনিনি। আর তার সনদ এমন নয়।

এ হাশেম কুফী সম্পর্কে মুহাদ্দেসীনদের অভিমত ভালো নয়। তিনি ছিলেন সীমাহীন অল্পে তুষ্ট এবং দানশীলা। ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ বলেন, তার কেবল একখানা ব্যক্তিগত গৃহ ছিল আর তাও তার জীবদ্দশায় ছদকা করে দিয়েছেন।[১০] যুরকানীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি যখন উম্মুল মু'মেনীন হিসেবে মদীনা আগমন করেন তখন ফতিমা যাহ্‌রা ও আযওয়াজে মুতাহারাতের মধ্যে তিনি স্বেচ্ছায় তার স্বর্ণের চুড়ি বন্টন করে দেন।[১১]

অপরের প্রতি সহানুভূতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল তার মধ্যে। হিজরী ৩৫ সালে উসমান গনী (রা:) আপন গৃহে আবদ্ধ হয়ে পড়েন এবং তার গৃহে পাহারাদার বসানো হয়, তখন হযরত ছফিয়্যা একজন খাদেমকে সাথে নিয়ে খচ্চরে আরোহণ করে তার গৃহাভিমুখে রওয়ানা করেন। আশ্‌তার নাখ্‌য়ী দেখতে পেয়ে খচ্চরের ওপর হামলা করে বসে। আশ্‌তার নাখয়ীর বিরুদ্ধে সফল হতে পারবেন না। তাই তিনি ফিরে আসেন এবং নিজের স্থানে হযরত হাসানকে এ খেদমতে নিয়োগ করেন।[১২]

সকল জীবন চরিতকার তার চরিত্র-মাধুর্যের প্রশংসায় উচ্চকিত। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার লিখেন, ছফিয়্যা বুদ্ধিমতি, মর্যাদাশীলা এবং ধৈর্যের অধিকারীণী।[১৩]

ইবনে কাসীরের অভিমত হচ্ছে, স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি।[১৪]

গুণ-বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য স্ত্রীদের মতো হযরত ছফিয়্যাও ছিলেন জ্ঞানের খনি। অধিকন্তু লোকেরা তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হতো। ছহীরা ইবনেতে হায়ফার হজ্জ সম্পন্ন করে হযরত ছফিয়্যার সাথে সাক্ষাত করার জন্য মদীনা পৌছে দেখেন যে, কুফায় একদল মহিলা মাসআলা জিজ্ঞেস

করার জন্য তার কাছে উপস্থিত হয়েছেন, আর তিনি সুন্দরভাবে সকলের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন।[১৫]

হযরত ছফিয়্যা থেকে কয়েকটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম যয়নুল আবেদীন, ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হারেস, মুসলিম ইবনে ছাফওয়ান, কেনানা এবং ইয়াযীদ ইবনে ম'তাব প্রমুখ এসব বর্ণনা করেছেন।[১৬]

ওফাত

হিজরী ৫০ সালে ৬০ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর আগে ওছিয়ত করেন যে, আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ আমার ভাগ্নেকে দেবে।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ লিখেন যে, তিনি এক লক্ষ দিরহাম রেখে যান। ধর্মীয় বিরোধের কারণে তার ওছিয়ত পালনে ইতস্তত করা হয়। কারণ তার ভাগ্নে ছিল ইহুদী। কিন্তু হযরত আয়েশা যখন এ মর্মে লোক পাঠিয়ে জানান যে, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং হযরত ছফিয়্যার ওছিয়ত পুরা কর, তখন তার ওছিয়ত কার্যকর করা হয়।[১৭]

১. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮৬, ২. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৯০, ছহীহ মুসলিম ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৪৬, ৩. ঐ তবকাত ৮ম খন্ড ছফিয়্যা প্রসঙ্গ, ৪. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৯০, ৫. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৯০, ৬. আল এস্তীআব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৬৩, ৬. আল এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬৬৯, ৮. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৯২, ৯. আল-এস্তীআব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৬৩, ১০. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৯২, ১১. যুরকানী ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ২৯৬, ১২. আল এছাবাহ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৩৭, ১৩. আল এস্তীআব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৬৩, ১৪. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৯০, ১৫. মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৩৭, ১৬. আল এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬৬৯, ১৭. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৯২।

১১

উম্মুল মু'মেনীন হযরত রায়হানা বিনতে শাম্ঊন (রাঃ)

ইহুদীদের মশহুর গোত্র বনু নযীর এর সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তার বংশধারা এই বায়হানা ইবনেতে শাম্ঊন ইবনে যায়েদ, মতান্তরে রায়হানা ইবনেতে যায়েদ ইবনে আমার ইবনে খানাফা ইবনে শাম্ঊন ইবনে যায়েদ।[১]

প্রথমে বনু কুরায়যার হাকাম নামে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয়। মুসলমানরা বনু কুরায়যার উপর বিজয়ী হওয়ার পর তাদের সহায়-সম্পদও মুসলিম অধিকারে আসে। গণীমতের মালের সাথে অন্যান্য যুদ্ধ বন্দীসহ হযরত মানসূর মানসূর রায়হানাও আসেন। কয়েক দিন তাঁকে উম্মে মুনযির বিনতে কায়েস এর গৃহে রাখা হয়। গণীমতের মাল বিলি-বণ্টন এবং বন্দীদের ফয়সালা হওয়ার পর রাসূলাল্লাহ্ (সাঃ) আগমন করে রায়হানাকে বললেন, তুমি আল্লাহ্ এবং রাসূলকে গ্রহণ করলে আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য উপযুক্ত মনে করি। রায়হানা তা মঞ্জুর করেন। অতঃপর আঁ-হযরত তাকে আযাদ করে ১২ উকিয়া এক নিশ মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করেন এবং উম্মুল মুনযিরের গৃহ হতে তুলে আনেন।[২]

নবীজী তাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি তার প্রতি খুব লক্ষ্য রাখতেন। ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদের এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত রায়হানা নবীজীর ভাগে পড়লে তিনি তাকে এখতিয়ার দিয়ে বলেন, ইচ্ছে করলে মুসলমান হতে পার, ইচ্ছে হলে তোমার ধর্মেও অটল থাকতে পার। রায়হানা বললেন, আমি স্ব-ধর্মে অবিচল থাকবো। এতে হযরত বিচলিত হন। পুনরায় বললেন, তুমি মুসলমান হলে আমি তোমাকে নিজের কাছে রাখবো। কিন্তু তিনি তখনও অটল। ইসলাম গ্রহণ করতে রাজী নন তিনি।

বিষয়টি নবীজীর নিকট খুব দুর্বিষহ লাগে। একদিন নবীজী বসা ছিলেন। হঠাৎ কারো পায়ের শব্দ শোনা গেলো। তিনি বললেন, সা'লাবা ইবনে শো'বা আসছে রায়হানার ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ নিয়ে। হয়েছেও তাই। নবীজী তাকে নিজের কাছে রাখেন। বিয়ে করেন নি।[৩]

আসলে তাই। তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে ভিন্নমত রয়েছে। কেবল ইবনে সা'আদ বিভিন্ন উপায়ে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, নবীজী তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছেন। তার ওপর পর্দা আরোপ করেছেন এবং স্ত্রীর মতোই তাকে রেখেছেন। হাফেয ইবনে হাজারও এ মত পোষণ করেন। এ দু'জন ঐতিহাসিক ছাড়া অন্যান্য সব জীবন চরিতকারের মতে হযরত রায়হানার স্থান মারিয়া কিব্‌তিয়ার মতো। অর্থাৎ এরা নবীজীর খাদেমা ছিলেন, স্ত্রী ছিলেন না।

ইবনে সা'আদের বর্ণনা মতে হিজরী ৬ষ্ঠ সালের মুহররম মাসে তিনি নবীজীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[৪] আর ইবনে ইসহাক এর বর্ণনা অনুযায়ী নবীজীর ওফাতের দশ বৎসর পূর্বে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৫]

১. আল-এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৫৯১. ২. তবকাত ৮ম পৃষ্ঠা ৯৩, ৩. ঐ পৃষ্ঠা ৯৪, ৪. তবকাত ৮ম খন্ড, ৫. আল এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৫৯২।

১২

উম্মুল মু'মেনীন হযরত মায়মুনা (রাঃ) বিনতে হারেস

আগে তার নাম ছিল বাররা। হযরতের সাথে বিয়ের পর তার নাম রাখা হয় মায়মুনা। তিনি ছিলেন উম্মুল ফযল লুবাবাতুস সুগরার বোন। তার বংশধারা ছিল এইঃ মায়মুনা ইবনেতে হারেস ইবনে হাযন ইবনে রুয়াইবা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে হেলাল ইবনে আমের ইবনে ছা'ছাআহ। তার মাতার নাম ছিল হিন্দ। মায়ের বংশ ধারা এইঃ হিন্দ ইবনেতে আওফ ইবনে যুহাইর ইবনে হারেস ইবনে হামাতা ইবনে জারাশ।[১]

মাসউদ ইবনে উমাইর সাকাফীর সাথে তার প্রথম বিয়ে হয়। তবকাত, যুরকানী এবং অন্যান্য জীবন চরিত গ্রন্থে এ বর্ণনা দেখা যায়। কিন্তু আল-এছাবাহ গ্রন্থের রচয়িতা তার প্রথম স্বামীর নাম উল্লেখ করেন নি। তিনি সংক্ষেপে কেবল এতটুকু উল্লেখ করেন যে, নবীজীর আগে আবূ রেহেম ইবনে আবদুল উয্যার স্ত্রী ছিলেন। যাই হোক, মাসউদ ইবনে উমরের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর আবূ রেহেম ইবনে আবদুল ওযযার সাথে বিয়ে হয়। হিজরী ৭ম সালে আবূ রেহেম মৃত্যু বরণ করলে রাসূলে খোদার স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তিনি ছিলেন হযরতের শেষ স্ত্রী। অর্থাৎ তারপর হযরত আর কোন বিয়ে করেন নি।[২]

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের অভিভাবকত্বে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। নবীজী যিলকদ মাসে ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে হযরত জাফর ইবনে আবূ তালেবকে হযরত মায়মুনার কাছে বিয়ের পয়গাম দিয়ে পাঠান। তিনি হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে উকীল নিযুক্ত করেন। কেউ কেউ এ মত পোষণ করেন যে, স্বয়ং আব্বাস (রাঃ) আঁ-হযরত (সাঃ) কে এ বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করেন।[৩] যাই হোক, ওমরার নিয়তে নবীজী যে এহরাম বাঁধেন, সে অবস্থায়ই সপ্তম হিজরীর শাওয়াল

মাসে পাঁচশ দিরহামের বিনিময়ে হযরত মায়মুনার সাথে বিয়ে হয়।[৪] ওমরা শেষ করে মদীনা ফেরার পথে মদীনা থেকে দশ মাইল দূরে সরফ নামক স্থানে নবীজী অবস্থান করেন।[৫] এখানে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়। নবীজীর খাদেম আবূ রাফে' হযরত মায়মুনাকে এখানে নিয়ে আসেন।[৬]

চরিত্র মাধুর্য

হযরত আয়েশা (রা:) তার সম্পর্কে বলেন, হযরত মায়মুনা ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খোদাকে ভয়কারীনী এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি সবচেয়ে যত্নবান মহিলা।[৭]

তার আকীদা-বিশ্বাস ছিল বিশুদ্ধ এবং চিন্তাধারা ছিল মযবুত। এক মহিলা অসুস্থ অবস্থায় মানত করেছিল যে, সুস্থ হলে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে নামায পড়বে। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে রোগ মুক্ত করলে মানত পুরা করার উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাদ্দাস গমনের জন্য হযরত মায়মুনার নিকট বিদায় নিতে আসে। হযরত মায়মুনা তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, অন্যান্য মসিজেদ নামায আদায়ের চেয়ে মসজিদে নববীতে নামায আদায়ের সওয়াব হাজার গুণ বেশি। তুমি এখানে থেকেই মসজিদের নববীতে নামায আদায় করো।[৮]

তিনি কোন কোন সময় করয নিতেন। একবার বেশি করয নিলে কেউ জিজ্ঞেস করেন, করয শেষ করার কি ব্যবস্থা হবে? বললেন নবীজী বলেছেন, যে ব্যক্তি তার করয শোধ করার নিয়ত রাখে, আল্লাহ্ নিজে তার করয পরিশোধ করান।[৯]

তিনি আদেশ-নিষেধের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখতেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুব কঠোর। একবার তার এক আত্মীয় আসেন তার কাছে। তার মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছিল। তিনি তাকে কঠোরভাবে শাসিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে আর কখনো আমার কাছে আসবে না।[১০] তার এক দাসী হযরত ইবনে আব্বাসের ঘরে গিয়ে দেখে স্বামী-স্ত্রীর শয্যা দূরে দূরে বিছানো রয়েছে। সে ভাবলো, কোন খিটমিট হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানা যায় যে, ইবনে আব্বাস স্ত্রীর মাসিক কালে পৃথক শয্যায় থাকেন। হযরত মায়মুনা এ সম্পর্কে জানতে পেরে বলেন, তাকে গিয়ে বল যে, রাসূলে খোদার তরীকা থেকে এতটা বিচ্যুতি কেন? আঁ-হযরত সর্বদা আমাদের বিছানায় শুতেন।

গুণ-বৈশিষ্ট্য

তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৮৬ মতান্তরে ৭৬টি। এর মধ্যে ৬টি মুত্তাফাক আলাইহে অর্থাৎ বোখারী-মুসলিম উভয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ১টি বোখারী শরীফে ৫টি মুসলিম শরীফে এবং বাকীগুলো হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোন কোন হাদীস থেকে তার ফিকহী মর্তবার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীসের উল্লেখ করা হচ্ছে–

একবার হযরত ইবনে আব্বাস উসকু-খুসকু চুল-দাড়ি নিয়ে তার কাছে আসেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পুত্র! কারণ কি? জবাবে তিনি বললেন, উম্মে আম্মার (তার স্ত্রী) রোগে ভুগছে। সেই চুল-দাড়ি আচড়ায়। বললেন, কি চমৎকার। নবীজী আমাদের কোলে মাথা রেখে শুতেন। কুরআন তেলাওয়াত করতেন আর আমরা সে অবস্থায় চাটাই তুলে মসজিদে রেখে আসতাম। বৎস! হাতেও কি কোন অসুখ হয়?

যারা হযরত মায়মুনা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের নাম হলো, হযরত ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ, ইবনুল হাদ, আবদুর রহমান ইবনুস সায়েব, ইয়াযীদ ইবনে আছাম (এরা সকলেই তার ভাগ্নে) ওবায়দুল্লাহ আল-খাওলানী (রাবীব), নাহার (দাসী), আতা ইবনে ইয়াসার, সালমান ইবনে ইয়াসার (গোলাম), ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে সাইদ ইবনে আব্বাস, কোরাইব (ইবনে আব্বাসের গোলাম) ওবায়দা ইবনে সাবাক, ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা, আলিয়া বিনতে সাবী' প্রমুখ।

ওফাত

যে স্থানে তার বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল, সে স্থনে তিনি ইন্তিকাল করেন। এটা তার জীবনেতিহাসের একটা স্মরণীয় ঘটনা অর্থাৎ যে সরফ এক দিন তার বিয়ের অনুষ্ঠান স্মরণীয় করে রেখেছিল, তাই হয়েছে তার দাফনের স্থান। হিজরী ৫১ সালে সেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন। হযরত ইবনে আব্বাস জানাযার নামায পড়ান। লাশ উঠাবার সময় হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, তিনি নবীজীর স্ত্রী। লাশকে বেশি নাড়াবেনা, আদরের সাথে ধীরে-সুস্থে চলবে।

১. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৯৪, ২. ঐ, ৩. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৫০, ৫. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৯৪, ৬. তবকাত ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৮৯, ৭. আল এছাবাহ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৩৩, ৮. ঐ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৩২. ৯. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৯৯, ১০. ঐ, ১১. আল-এছাবাহ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৩৩।

বানাতুন্নবী
বা
নবী দুলালী

১৩

হযরত যয়নব (রা:) বিনতে রাসূলুল্লাহ্ (সা:)

শেষ নবীর বড় কন্যা হযরত যয়নব আল্লাহ্র পথে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা:) তার সম্পর্কে নবীজীর উক্তি উল্লেখ করে বলেন, সে ছিল আমার সব চেয়ে ভালো কন্যা, যাকে আমার ভালোবাসায় অতিষ্ঠ করা হয়েছে।[১]

তার মাতা ছিলেন খাদীজা ইবনেতে খুওয়াইলিদ। হযরত খাদীজা (রা:) রাসূলে খোদার প্রতি সর্ব প্রথম ঈমান আনেন। তার ফযীলত মর্তবা অসীম। সংক্ষেপে বলা যায়, বিগত উম্মতের মধ্যে হযরত মারইয়ামের যে মর্তবা ছিল, মুসলিম উম্মার মধ্যে হযরত খাদীজার মর্তবাও ঠিক অনুরূপ।

আবূ আমর বলেন, তিনি ছিলেন নবীজীর কন্যাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, এতে কোন দ্বিমত নেই। কেউ দ্বিমত পোষণ করে থাকলে ভুল করবে এবং তার দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিমত এ ব্যাপারে থাকতে পারে যে, নবীজীর সন্তানদের মধ্যে প্রথমে হযরত যয়নবে জন্ম হয়েছে, না হযরত কাসেমের। মানব বংশধারা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল একটা মহলের মতে প্রথমে হযরত কাসেম জন্ম গ্রহণ করেন, অতঃপর হযরত যয়নব। ইবনে কালবীর মতে প্রথমে যয়নব জন্ম গ্রহণ করেন, এরপর হযরত কাসেম। যা হোক, হযরত যয়নব ছিলেন নবীজীর কন্যা সন্তানদের মধ্যে সবার বড়।[২]

জন্ম

মহানবীর নবুওয়াত লাভের দশ বৎসর পূর্বে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তখন হযরতের বয়স ছিল ৩০ বৎসর। তার শৈশব কালের কথা তেমন জানা যায় না। ইতিহাস গ্রন্থেও এ সম্পর্কে তেমন কিছু উল্লেখ নেই। নবীজীর কন্যাদের মধ্যে হযরত যয়নবের বিয়ে হয় সর্ব প্রথম। তখন তাঁর বয়স

খুবই কম। রাসূলে খোদার নবুওয়াত লাভের আগের ঘটনা। এ বিয়ে হয় তাঁর আপন খালাতো ভাই আবুল আছ এর সাথে।[৩] তাঁর লকব বা উপাধী ছিল লাকীত। স্বামী আবুল আছ এর বংশধারা ছিল-আবুল আছ ইবনে রাবী' ইবনে আবদুল উযযা ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কোছাই। তিনি ছিলেন হযরত খাদীজার আপন বোন হালা ইবনেতে খোওয়াইলিদের পুত্র। তাঁর উপঢৌকনের মধ্যে অন্যান্য জিনিস ছাড়াও ছিল ইয়ামানের প্রসিদ্ধ আকীক পাথরের একটি হার। এটি তাকে হযরত হোযায়ফা দিয়েছিলেন।

নবীজী নবুওয়াত লাভ করলে হযরত যয়নবও ইসলাম গ্রহণ করেন। স্বামী আছ এর ইসলাম গ্রহণ করার আগেই তিনি মদীনায় হিজরত করেন। স্বামী তখনো মুশরিক হিসেবে মক্কায় রয়ে যান। নবীজী যয়নব ও আবুল আছ এর দাম্পত্য সম্পর্ক এবং ভদ্র জনোচিত কর্মধারার প্রশংসা করতেন প্রায় সময়ই।[৪] আবুল আছ যেহেতু শিরকে লিপ্ত আর এ ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ তো এ হওয়াই স্বাভাবিক যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো উচিত। কিন্তু নবীজী তখনো মক্কায় পরাভূত অবস্থায় ছিলেন। একটা শক্তি হিসেবে তখনো ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেনি। মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের অত্যাচার-নির্যাতন ছিল তখন চরমে। তখন ছিল ইসলামের সূচনা পর্ব মাত্র তাই নবীজী পরিণামদর্শীতার পরিচয় দিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটাননি।[৫]

কিন্তু ইসলামের বিকাশ লাভের সাথে সাথে ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধাচরণের তীব্রতাও বৃদ্ধি পায়। নবীজীকে উত্যক্ত উৎপীড়িত করার কোন উপায়ই তারা বাদ রাখেনি। কোরাইশের কিছু লোক আবুল আছকে বাধ্য করতে চেষ্টা করে যয়নবকে তালাক দিয়ে তার পরিবর্তে কোরাইশের কোন মহিলাকে বিয়ে করতে। কিন্তু আবুল আছ তাদের এ প্রচেষ্টায় সম্মত হননি, বরং তিনি তা করতে অস্বীকার করেন। এ কারণে নবীজী তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে ভালো মনে করতেন এবং এর প্রশংসা করতেন।[৬] হযরত যয়নব আবুল আছকে গভীর ভালোবাসতেন। নীচের ঘটনা থেকেই তাদের ভালোবাসার গভীরতা ফুটে ওঠে।

নবুওয়াত লাভের ত্রয়োদশ বর্ষে নবীজী মক্কা মুয়ায্যামা থেকে হিজরত করেন, তখন হযরত যয়নব ছিলেন শ্বশুরালয়ে। স্বামী আবুল আছ মক্কার

মুশরিকদের সঙ্গে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদর যুদ্ধে যোগ দেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবাইর ইবনে নু'মান অন্যান্য বন্দীদের সাথে আবূল আছকেও গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন। এ সম্পর্কে মক্কাবাসীরা জানতে পেরে বন্দীদের মুক্ত করার জন্য ফিদিয়া পাঠায়। হযরত যয়নবও দেবর আমির ইবনে রাবীকে একটা হারসহ প্রেরণ করেন, যেটি বিয়ের সময় মাতা খাদীজা কন্যাকে উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছিলেন। হারটি নবীজীর খেদমতে পেশ করা হলে তিনি শোকাবিভূত হয়ে পড়েন। হযরত খাদীজার কথা তার মনে পড়ে যায়। অতঃপর তিনি সকলকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা ভালো মনে করলে যয়নবের স্বামীকে ছেড়ে দিতে পার। তার হারও ফেরত দিতে পার। হারটি ফেরত দেয়া হয় এবং হযরত যয়নবের স্বামী আবূল আছকেও ছেড়ে দেয়া হয়।

সব কয়েদীকেই যেহেতু ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, আবুল আছ নবীজীর জামাতা বলে তাকে ফিদিয়া ছাড়াই ছেড়ে দেয়া হবে এটা তো শানে নবুওয়াতের বিরোধী। এটা কি করে হতে পারে? তাই আবূল আছ এর ফিদিয়া এই সাব্যস্ত হয় যে, তিনি মক্কায় ফিরে গিয়ে স্ত্রী যয়নবকে মদীনায় প্রেরণ করবেন। হযরত যয়নকে মদীনায় নিয়ে আসার জন্য আবূল আছ এর সাথে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসাকেও দেয়া হয়। তাকে বলে দেয়া হয় যে, তুমি বতনে ইয়াজিজ-এ অপেক্ষা করবে। হযরত যয়নব সেখানে পৌছলে তাকে নিয়ে মদীনায় আসবে। আবূল আছ মক্কায় ফিরে যয়নবকে তার ছোট ভাই কেনানার সাথে যাওয়ার অনুমতি দেন।

হযরত যয়নব যখন সফরের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, তখন হিন্দ ইবনে ওতবা তার কাছে এসে বললেন, হে নবী দুলালী! তুমি কি পিতার কাছে যাচ্ছ? তিনি বললেন, আপাতত তো তেমন ইচ্ছে নেই, ভবিষ্যতে খোদার মর্জী হলে দেখা যাবে। হিন্দ বললেন, বোন আমার কাছে গোপন করার কি প্রয়োজন? তুমি সত্যিই যদি যেতে চাও এবং পথের সম্বলের কিছু প্রয়োজন থাকে তাহলে ইবনো দ্বিধায় বলতে পার, আমি খেদমতের জন্য প্রস্তুত। তখনো নারী সমাজের মধ্যে শত্রুতার বিষ-বাষ্প ছড়ায়নি, যা পুরুষদের মধ্যে ছড়িয়েছিল। এ জন্য হযরত যয়নব বলেন যে, হিন্দ যা কিছু বলছিলেন,

সরল মনেই বলেছিলেন। অর্থাৎ আমার কোন জিনিসের প্রয়োজন হলে তিনি অবশ্যই পুরো করতেন।[১]

মোট কথা, সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে দেবর কেনানা ইবনে রাবী'কে সঙ্গে নিয়ে উটের পিঠে আরোহণ করে তিনি মদীনা শরীফ রওয়ানা হন। তখন চারিদিকে ছিল কাফের। তারা পেছনে পড়তে পারে, এমন আশংকাও ছিল। তাই কেনানা তীর-ধনুক ইত্যাদিও সাথে নেন। তারা রওয়ানা হলে কাফের মহলে হৈ-চৈ পড়ে যায়। কোরাইশের লোকজন তাদেরকে পাকড়াও করার কথাও চিন্তা করতে লাগলো। তাদের সন্ধানে এক দল লোক বেরিয়ে পড়ে। তারা যি-তুয়া নামক স্থানে এদেরকে ঘেরাও করে ফেলে। ঘেরাওকারীদের দলে হাব্বার ইবনে আসওয়াদ এবং অপর এক ব্যক্তিও ছিল। হাব্বার ইবনে আসওয়াদ ছিলেন হযরত খাদীজার চাচাতো ভাইয়ের ছেলে। ইনি সম্পর্কে হযরত যয়নবেরও ভাই হন। তার এ অন্যায় আচরণের জন্য মক্কা বিজয়ের দিন নবীজী তাকে হত্যার অনুমতি দেন। কিন্তু তিনি অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের একজন হযরত যয়নবের প্রতি বল্লম দিয়ে হামলা চালায়। তিনি উটের পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যান। তখন তিনি ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা ফলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। তিনি ভীষণ আঘাত পান। এরপর কেনানা তীর বের করে বলেন, এখন যে কেউ আমার কাছে আসবে, কবর হবে তার ঠিকানা। তার এ ঘোষণার পর সকলে এদিক সেদিক চলে যায়। কোরাইশ সর্দাররদে সাথে আবূ সুফিয়ান সামনে অগ্রসর হয়ে বলে, তুমি ক্ষণেকের জন্য তীর বন্ধ কর। আমরা তোমাদের সাথে একটু কথা বলে নেই। কেনানা তীর কোশবদ্ধ করে জিজ্ঞেস করেন, কি বলতে চাও, বল। আবূ সুফিয়ান বললেন, মুহাম্মদ (সা:) এর হাতে আমাদেরকে যে বিপদ-মুছিবত, পরাজয় এবং লাঞ্ছনা-অবমাননার গ্লানী সইতে হচ্ছে, সে সম্পর্কে তোমরা বেখবর নও। এখন তোমরা যদি প্রকাশ্যে তার কন্যাকে আমাদের সম্মুখ দিয়ে নিয়ে যাও, তাহলে মানুষ এটাকে আমাদের দুর্বলতা, কাপুরুষতা বলে অভিহিত করবে এবং এটাকে আমাদের পশ্চাদপসারণের পূর্বাভাষ বলে মনে করবে। তোমরা নিজেরাইতো এটা বুঝতে পার যে, মুহাম্মদ (সা:) এর কন্যাকে বাধা দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই আমাদের। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এখন তোমরা ফিরে যাও। হৈ-চৈ থেমে গেলে মানুষ যখন বুঝতে পারবে যে, আমরা

মুহাম্মদের (সাঃ) কন্যাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি, তখন তোমরা গোপনে তাকে নিয়ে যাবে। কেনানা এটা মেনে নিয়ে ফেরত আসেন। ঘটনাটি সাধারণ্যে প্রচারিত হলে একদিন গোপনে তাকে নিয়ে রওয়ানা হন। তিনি 'বতনে ইয়াজিজ'-এ যায়েদ ইবনে হারেসার কাছে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যান। তিনি হযরত যয়নবকে নিয়ে মদীনা মুনাওওয়ারা রওয়ানা হন।[১০]

আবূল আছও যয়নবকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করছিলো। তাই হযরত যয়নব চলে গেলে আবূল আছ অত্যন্ত দুঃখ পান। একবার সিরিয়া সফরকালে হযরত যয়নবের কথা মনে পড়লে তিনি দুটি করিতা আবৃত্তি করেন। কবিতা দু'টি হলো[১১]

ذَكَرْتُ زَيْنَبَ لَمَّا دَرَكْتُ ادَمًا–

فَقُلْتُ سَقْيًا تَشْخَصَ يَسْكُنُ الْحَرَمَا.

بِنْتُ الْأَمِيْنِ جَزَاهَا اللّٰهُ صَالِحَةً.

وَكُلُّ بَعْلٍ يُثْنِي مَاالَّذِىْ عَلِمًا–

অর্থঃ আমি যখন আরম স্থান অতিক্রম করি, তখন যয়নবকে স্মরণ হয়। তখন আমি বললাম, যে হেরেম শরীফে বসবাস করছে, আল্লাহ্ তাঁকে সজীব রাখুন।

আল-আমীনের কন্যাকে আল্লাহ্ শুভ প্রতিদান দিন।

প্রত্যেক স্বামী যা ভালো জানে, তারই প্রশংসা করে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা এবং আমনতদারীর জন্য আবূল আছ খ্যাত ছিলেন। কোরাইশরা তাদের পণ্য বিক্রয়ের জন্য আছ এর নিকট প্রেরণ করতো। হিজরী ৬ সালের জমাদিউল আউয়াল মাসে আবূল আছ কোরাইশদের একটি কাফেলার সাথে শাম দেশ অভিমুখে রওয়ানা হন। সেখান থেকে ফেরার পথে নবীজী জানতে পারেন। তিনি ১৭০ জন ঘোড়া সওয়ার সহ হযরত যায়েদ ইবনে হারেসকে প্রেরণ করেন পশ্চাদগমনের

জন্যে। ঈশ নামক স্থানে উভয় কাফেলা মুখোমুখি হয়। নবীজীর প্রেরিত বাহিনী মুশরিক বাহিনীকে গ্রেফতার করে এবং তাদের পণ্যসামগ্রী হস্তগত করে। কিন্তু আবূল আছ এর কোন ক্ষতি করা হয়নি।[১২]

আবূল আছ কাফেলার এ পরিণতি দেখে তখনই মদীনা মুনাওয়ারা চলে যান এবং সেখানে পৌছে হযরত যয়নবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। হযরত যয়নব তাকে আশ্রয় দেন। নবীজী তখন ফজরের নামাযে ছিলেন। হযরত যয়নব বুলুন্দ আওয়াযে বলেন, আমি আবূল আছকে আমার আশ্রয়ে নিয়েছি।

নবীজী নামায শেষ করে বললেন, লোক সকল! তোমরা কিছু শুনলে? সকলে আরয করেন, জি হ্যাঁ, শুনেছি। তিনি বললেন, ইতোপূর্বে এ ঘটনা সম্পর্কে আমার কিছু জানা ছিল না। কি বিস্ময়ের ব্যাপার! মুসলমানদের দুর্বল লোকেরা দুশমনদেরকে আশ্রয় দেয়।

নবীজী ঘরে তাশরীফ আনলে হযরত যয়নব তাঁর খেদমতে হাযির হলেন। তিনি আরয করলেন, আবূল আছ এর আটককৃত পণ্য ফেরত দেয়া হোক। তিনি অভিযাত্রী দলের কাছে খবর পাঠালেন, আবূল আছ এর সাথে আমার কি সম্পর্ক, তোমরা তা জানো। তোমরা তার প্রতি দয়া করে তার মালামাল ফেরত দিলে তা আমার খুশির কারণ হবে। অন্যথায় তোমাদের ইখতিয়ার রয়েছে। তারা সবাই বললো, আমরা সব কিছু ফেরত দিতে প্রস্তুত। তাই হয়েছে। তার সব কিছুই ফেরত দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে কন্যা যয়নবকে বললেন, আবূল আছ এর আদর-যত্ন, সম্মান-মর্যাদায় ত্রুটি করবে না। কিন্তু যতক্ষণ সে মুশরিক থাকে, তার নৈকট্য থেকে দূরে থাকবে। কারণ, ইসলাম ও কুফর একত্র হতে পারে না।

যদিও এ বর্ণনা দ্বারা প্রথম বর্ণনা অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছিন্ন না করার প্রতিবাদ হয়। কিন্তু আসলে যেহেতু এখনি ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, অতি সহজেই দুশমনদের মোকাবিলা করা যায়। তাই এমন নির্দেশ না দেয়ার কোন কারণ থাকে না নবীজীর জন্য। যেহেতু আগের সময়টি ছিল সত্যিকার অর্থেই নাযুক। তাই তখন বিবাহ বিচ্ছেদের নির্দেশ দেয়া হয়নি।

মহিলা সাহাবী

এরপর আবূল আছ তার পণ্যসম্ভার নিয়ে মক্কা মুয়ায্যমা রওয়ানা হন। মক্কা পৌঁছে সকলের দেনা-পাওনা পরিশোধ করেন। একদিন তিনি কোরাইশকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এখন আমার কাছে কারো কোন দাবি তো অবিশিষ্ট নেই? তারা বললো; না, এখন তোমার কাছে আমাদের কোন দাবি নেই। আল্লাহ্ তোমাকে নেক প্রতিদান দিন। তুমি একজন ওফাদার এবং ভদ্র ব্যক্তি। আবূল আছ বললেন, তোমরা শুনে রেখো, এখন আমি ইসলাম গ্রহণ করছি। এই বলে তিনি পাঠ করলেন,

اَشْهَدُ اَنْ لَّاَالٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَشَرِيْكَ لَه وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه.

–আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

এরপর তিনি বললেন, খোদার কসম, মুহাম্মদ (সা:) এর খেদমতে হাযির হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ থেকে একটা মাত্র জিনিস আমাকে নিবৃত্ত রেখেছে। আর তা হচ্ছে এই যে, তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করলে তোমরা বলতে যে, আমি তোমাদের পণ্যসামগ্রী আত্মসাৎ করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন আল্লাহ্ আমাকে এ বিরাট দায়িত্ব থেকে ভালোভাবে মুক্ত করেছেন। তাই এখন আর ইসলাম গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই।

হযরত আবূল আছ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা শরীফ পৌঁছলে হযরত (সা:) নতুন করে বিয়ে না দিয়ে পুরাতন আকদ অনুসারে হযরত যয়নবকে স্বামীর কাছে প্রেরণ করেন।[১৩] তখনও সূরা বাকারা নাযিল হয়নি। মুসলিম স্ত্রীরা স্বামীদের ইসলাম গ্রহণের পর বিয়ে নবায়ন না করেই স্বামীদের নিকট গমন করতো।[১৪]

হযরত যয়নব পিতা এবং স্বামীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি মূল্যবান কাপড় পরিধান করতে বেশ আগ্রহী ছিলেন। হযরত আনাস তাকে রেশমী চাদর পরিধান করা অবস্থায় দেখেছেন, যাতে হলুদ রঙ্গের বুটি ছিল।[১৫]

সন্তানাদী

হযরত আবূল আছ এর ঔরসে হযরত যয়নবের দু'টি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এদের একজন পুত্র সন্তান আলী এবং অপর জন কন্যা সন্তান উমামা।[১৬] আলী হিজরতের পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। নবীজী তার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নবীজীর স্নেহ ছায়ায় প্রতিপালিত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন। মক্কা বিজয়ের দিন নবীজী যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন আলী তার উটে সওয়ার ছিলেন। বালেগ হওয়ার আগে পিতা আবূল আছ এর জীবদ্দশায় তিনি ইন্তিকাল করেন। কিন্তু ইবনে আসাকের-এর এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আলী ইয়ারমুক যুদ্ধ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত লাভ করেন।

হযরত যয়নবের কন্যা উমামা এরপরও বেঁচে ছিলেন। হযরত আলীর (রাঃ) স্ত্রী হযরত ফাতিমার ইন্তিকালের পর তিনি হযরত উমামাকে বিয়ে করেন।[১৭]

ওফাত

হযরত আবূল আছ এর ইসলাম গ্রহণের পর হযরত যয়নব এক বৎসর কি সোয়া বৎসর বেঁচে ছিলেন। নবীজীর জীবদ্দশায় হিজরী ৮ম সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৮] তাঁর ইন্তিকাল সম্পর্কে আল-এস্তীআব গ্রন্থে বলা হয়, হযরত যয়নব যখন মক্কা থেকে পিতার নিকট হাজির হওয়ার জন্য রওয়ানা হন, পথিমধ্যে হোবার এবং অপর এক ব্যক্তি তার ওপর হামলা চালালে তিনি উটের পিঠ থেকে পড়ে যান। এতে তার গর্ভপাত হয় এবং বেশ রক্তক্ষরণ হয়। দীর্ঘ দিন এ অসুখে ভোগার পর হিজরী ৮ম সালে তিনি ইন্তি কাল করেন।[১৯]

হযরত উম্মে আইমান, হযত সাওদা, হযরত উম্মে সালমা, হযরত উম্মে আতিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুন্না সকলেই গোসলে শরীক ছিলেন। নবীজী নিজে কবরে নামেন এবং আপন চক্ষের পুতুলীকে দাফন করেন। তখন তার চেহারায় ছিল শোকের চিহ্ন। নবীজী তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করেন, আয় খোদা! তুমি যয়নবের মুশকিল আসান কর, কষ্ট দূর কর, তার কবরের সংকীর্ণতা প্রশস্ত কর।[২০]

হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা:) বলেন, আমি যয়নব ইবনেতে রাসূলাল্লাহ্‌র গোসলে শরীক ছিলাম। নবীজী নিজে গোসলের নিয়ম বলে দেন। তিনি বলেন, প্রথমে তিন বা পাঁচবার প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করবে এবং কর্পুর লাগাবে।[২১]

এক বর্ণনায় সাতবার ধোয়ার কথাও বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে তিনবার ধুয়ে তাহারাত বা পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হলে বারবার ধোয়ার দরকার নেই। এমতাবস্থায় তিনবার ধোয়াই যথেষ্ট। প্রয়োজনে তিনবারের বেশিও ধোয়া যায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে তাহারাত বা পচ্ছিন্নতা অর্জন করা। পাঁচ দফা বা সাত দফা নয়। নবীজী উম্মে আতিয়্যাকে এও বলেন যে, গোসল শেষ করে আমাকে জানাবে। গোসল শেষে তাকে জানালে তিনি তহবন্ধ দান করে বলেন, এটা কাফনের সাথে পরিধান করাবে। হযরত যয়নবের ইন্তিকালের কিছু দিন পরই হযরত আবূল আছও ইন্তিকাল করেন।[২২]

১. যুরকানী, যয়নব অধ্যায়, ২. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২০, ৩. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২২, যুরকানী দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা ১৮০, সুনানে আবূ দাউদ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২২২, ৪. আদ-দুররুল মানসূর পৃষ্ঠা ২৩১, ৫. তাবারী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৩৬, সীরাতে ইবনে হিশাম পৃষ্ঠা ২০, ৬. তবকাত ৮ম খনড পৃষ্ঠা ২০, ৭. ঐ, ৮. সীরাতে ইবনে হিশাম পৃষ্ঠা ৩১, তাবারী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৭, ৯. যরকানী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ২২৩, সীরাতে ইবনে হিশাম পৃষ্ঠা ৩১, তাবারী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১২৪৭, ১০. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২১, ১১. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২২, তাবারী পৃষ্ঠা১৩৫০, ১২. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২২, ১৩. আল-এছাবাহ, কিতাবুন নেসা; ১৪. আল-এস্তী আব, পৃষ্ঠা ৮৩, আদ্ দুররুল মানসূর, পৃষ্ঠা ২৩১, ১৫. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২২, ১৬. আল-এছাবাহ পৃষ্ঠা ৪০০ তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২১, তাবারী ১৩৫৯, ১৭. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২১, তাবারী ১৩৫১, ১৮. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ১৫৩, ১০. উসুদল গাবাহ পৃষ্ঠা ৪৬৮, ২০. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২২, ২১. আদ দুররুল মানসূর পৃষ্ঠা ২৩১, ২২. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৪৬৮।

১৪

হযরত রোকাইয়্যা (রাঃ) বিনতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)

হযরত রোকাইয়্যা (রা:) ছিলেন নবীজীর দ্বিতীয়া কন্যা। তার মাতা হচ্ছেন হযরত খাদীজা (রা:)। তিনি ছিলেন হযরত যয়নবের আপন বোন। মহানবীর নবুওয়াতের সাত বৎসর পূর্বে তার জন্ম হয়। ইবনে যুবায়ের এবং তার চাচা মুসআব এর ধারণা, হযরত রোকাইয়্যা ছিলেন নবীজীর কন্যাদের মধ্যে সকলের ছোট। বংশধারা বিশেষজ্ঞ জুরজানী এ মতই সঠিক বলে মনে করেন। কিন্তু এ ছাড়া অন্যদের মতে হযরত যয়নব ছিলেন সকলের চেয়ে বড়, আর রোকাইয়্যা ছিলেন মেজ।

আবূল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক সিরাজ আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে সুলাইমান আল-হাশেমীর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, হযরত যয়নবের যখন জন্ম হয়, তখন রাসূলে খোদা (সা:) এর বয়স ৩৩ বৎসর ছিল। যাই হোক জীবন চরিতকারদের মতে হযরত রোকাইয়া ছিলেন রাসূলে খোদার মেজ কন্যা।

বিয়ে

মহানবী নবুওয়াত লাভের পূর্বে হযরত রোকাইয়া প্রথম বিয়ে হয় আবূ লাহাব এর পুত্র ওতবার সাথে।[১] আঁ-হযরত নবীজীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হলে কোরাইশদের বিরুদ্ধাচরণের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়। তারা নবীজীকে নানাভাবে কষ্ট দেওয়া ছাড়াও কিছু নতুন পন্থা খুঁজে নেয়। তারা আবূল আছকে বলে, তুমি যয়নবকে তালাক দাও। কিন্তু সে তা করতে রাযী হয়নি।[২] এরপর ওতবার কাছে গিয়েও তারা অনুরূপ পরামর্শ দেয়। তারা বলে, তুমি রোকাইয়্যা ইবনেতে মুহাম্মদ (সা:) কে তালাক দাও। তুমি কোরাইশের যে কোন রমণীকে বিয়ে করতে চাও, তাকেই তোমার সাথে

বিয়ে দেবো। ওতবা তাদের এ পরামর্শ গ্রহণ করে বললো, সাঈদ ইবনুল আছ্ এর কন্যাকে আমি বিয়ে করতে চাই, তাকে বিয়ে করিয়ে দাও আমাকে। এতে কোরাইশগণ আনন্দের সাথ রাজী হয়। রাজী হবে না কেন? তাদের উদ্দেশ্য তো ছিল, যে কোন উপায়েই হোক না কেন, রাসূলে খোদাকে দৈহিক এবং মানসিক কষ্ট দিতে হবে। তাই হয়েছে। ওতবা তদনুযায়ী হযরত রোকাইয়্যাকে তালাক দেয়। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী নবীজীর প্রতি 'তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব' সূরা নাযিল হলে আবূ লাহাব এবং তার স্ত্রী উম্মে জামীল-কুরআন মজীদ যাকে হাম্মালাতাল হাতাব বা কাঠের ভার বহনকারীণী বলে অভিহিত করেছে বিষাদ ক্লিষ্ট হয়ে পুত্র ওতবাকে বলে, তুমি রোকাইয়্যা ইবনেতে মুহাম্মদ (সাঃ) কে তালাক না দিলে তোমার সাথে আমার উঠা-বসা হারাম। ওতবা মায়ের হুকুম পালন করার জন্য হযরত রোকাইয়্যাকে তালাক দেয়। উল্লেখ্য যে, ওতবার সাথে কেবল আকদ হয়েছিল। তখনো বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়নি, তার আগেই তালাক হয়েছে।[৩]

হযরত ওসমান-এর ইসলাম গ্রহণঃ রোকাইয়্যার দ্বিতীয় বিয়ে

ইসলাম গ্রহণ এবং বিয়ের ঘটনা হযরত ওসমান (রাঃ) নিজে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি কা'বা শরীফের আঙ্গিনায় কয়েকজন বন্ধুকে নিযে বসেছিলাম, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি হঠাৎ উপস্থিত হয়ে জানায় যে, হযরত (সাঃ) তার কন্যা রোকাইয়্যাকে আবূ লাহাবের পুত্র ওতবার নিকট বিয়ে দিয়েছেন। রূপ-সৌন্দর্য এবং ঈর্ষাযোগ্য গুণ-বৈশিষ্ট্যের জন্য হযরত রোকাইয়্যা মশহুর ছিলেন। এ কারণে তার প্রতি আমার মনের টান ছিল। এ খবর শুনে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি এবং সোজা ঘরে চলে যাই। ঘরে ছিলেন আমার খালা সা'দাহ্। তিনি জ্যোতিষ বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। আমাকে দেখেই বলেন, (ওসমান) তোমার জন্য সুসংবাদ। তোমাকে তিনবার সালাম। এরপর তিনবার, আবার তিনবার তোমাকে সালাম। এরপর একবার। এমনিভাবে দশবার সালাম পূর্ণ হোক। তুমি কল্যাণ লাভ কর এবং অকল্যাণ থেকে রক্ষিত হও। খোদার শপথ, তুমি এক সতী রূপসী রমণীকে বিয়ে করবে। তুমিও বিবাহিত আর তোমার স্ত্রীও বিবাহিতা। সে হবে এক মহান মর্যাদাবান ব্যক্তির কন্যা।

তার মুখে এসব কথা শুনে আমি বিস্মিত হই। জিজ্ঞেস করি, খালা এসব কি বলছেন, আপনি? জবাবে তিনি বললেন ঃ

عُثْمَانُ يَا عُثْمَانُ يَا عُثْمَانُ – لَكَ الْجَمَالُ وَلَكَ الشَّانُ.

هذَا نَبِىٌّ مَعَهُ الْبُرْهَانُ – اَرْسَلَهُ بِحَقِّه الدَّيَّانُ.

وَجَائَهُ التَّنْزِيْلُ وَالْفُرْقَانُ– فَاتَّبِعْهُ لاَيَغُرَّ نَّكَ الأَوْثَانُ.

–ওসমান, ওসমান, হে ওসমান
লভিছ তুমি রূপ আর শান।
তিনি যে নবী ধারক বোরহান,
ভেজিছে তায় মহান দাইয়্যান।
পেয়েছেন তিনি তানযীল কুরআন
মানো তায়, ত্যাজ মূর্তি-আওসান।

এবারও আমি কিছু বুঝতে পারিনি। বললাম, একটু খুলে বলুন না। তিনি বললেন ঃ

اِنَّ مُحَمَّدَ بِنَ عَبْدِ اللهِ رَسُوْلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ

جَاءَ بِتَنْزِيْلِ اللهِ يَدْعُوْابه اِلَى اللهِ

مِصْبَاحُه مِصْبَاحٌ وَدِيْنُهُ فَلاَحٌ

مَايَنْفَعُ السِّلاَحُ وَقْعَ الذُّبَاحِ

وَسُلَّتِ السِّلاَحُ وَمُدَّتِ الرِّبَاحُ.

– মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ নিশ্চিত আল্লাহ্ রাসূল! আল্লাহ্র কাছ থেকে এনেছেন তানযীল। তা দিয়ে ডাকেন আল্লাহ্র দিকে। চেরাগ তার আসল চেরাগ। দ্বীন তার কল্যাণ। যখন শুরু হবে যুদ্ধ-বিগ্রহ, টেনে বের করা হবে তরবারী, বল্লম যখন উচিয়ে ধরা হবে, তখন শোরগোল হৈ-চৈ কোন কাজে আসবে না।[৪]

তার এসব কথাবার্তা আমার মনে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমি পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকি। আমি অধিকন্তু হযরত আবূ বকর এর কাছে বসতাম। দু'দিন পর তার কাছে যাই। তখন তিনি একা। কেউ নেই কাছে। আমি বিষণ্ন বদনে বসে থাকলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আজ এত চিন্তিত কেন? যেহেতু তিনি ছিলেন আমার বন্ধু, তাই আমি তার কাছে আমার খালার বক্তব্যের সারকথা বললাম। তিনি বললেন, ওসমান! তুমি তো বুদ্ধিমান লোক। তুমি যদি হক ও বাতিলের পার্থক্য না কর, তা হবে অবাক হওয়ার কথা। তোমার জাতি যে মূর্তির পূজা করে, তা কি পাথরের তৈরী নয়? এগুলো না শুনতে পায়, না দেখতে পায়, না উপকার করতে পারে আর না পারে কোন ক্ষতি করতে।

আমি বললাম, আপনি যা বলছেন, একান্ত ঠিকই বলছেন। তিনি বললেন, তোমার খালা যা বলেছেন, খোদার শপথ করে বলছি, ঠিকই বলেছেন। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ তাকে প্রেরণ করেছেন তার পয়গাম বান্দাদের নিকট পৌঁছাবার জন্য। তার কাছে যাও, তিনি কি বলেন, শুনলে ক্ষতি কি? তার কথা শুনে নবীজী স্বয়ং হাযির হন। তিনি বললেন, ওসমান! আল্লাহ্ তোমাকে জান্নাতের দিকে ডাকছেন। তুমি তা গ্রহণ কর। আমি আল্লাহ্র রাসূল। তোমাদের এবং গোটা মাখলুকের জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

তার কথাগুলোতে কি প্রভাব ছিল। তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। আমি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারিনি। অস্থির হয়ে আমি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হই।[৫]

এ ঘটনার পর মক্কায় হযরত ওমসানের সাথে হযরত রোকাইয়্যার বিয়ে হয়।[৬]

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত

তিনি মাতা হযরত খাদীজার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্যান্য নারী যখন নবীজীর নিকট বায়আত গ্রহণ করেন, তখন তিনিও তাদের সাথে বায়য়াত গ্রহণ করন। নবুওয়াত লাভের পঞ্চম বৎসর হযরত রোকাইয়্যার স্বামীর সাথে হাবশায় হিজরত করেন।[৭]

হযরত আসমা ইবনেতে আবূ বকর (রাঃ) থেকে একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে। এতে তিনি বলেন, হযরত (সাঃ) এবং হযরত আবূবকর (রাঃ) গুহায় অবস্থান করেন এবং আমি সেখানে খাবার নিয়ে যেতাম। একবার হযরত ওসমান (রাঃ) নবীজীর অনুমতি চান। তিনি হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দেন। তাই তিনি হাবশায় হিজরত করে চলে যান। অতঃপর আমি খাবার নিয়ে গেলে নবীজী জানতে চান যে, ওসমান এবং রোকাইয়্যা গিয়েছে কি? আমি বললাম, জি, গিয়েছেন। তিনি আমার আব্বা হযরত আবূ বকরকে বললেন, লূত এবং ইব্রাহীম এর পর ওসমান প্রথম ব্যক্তি, যে কাফেরদের অত্যাচারের কারণে স্ত্রী-পরিজন নিয়ে দেশ ছেড়ে হিজরত করেছে।[৮] এরপর হাবশা থেকে আবার মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু মক্কায় অবস্থান করা ঠিক হবে না মনে করে পুনরায় হাবশায় চলে যান। সেখানে তিনি বেশ কিছু দিন অবস্থান করেন। এ সময় তাদের সম্পর্কে নবীজী কোন খবর পাননি। ঘটনাক্রমে হাবশা থেকে একজন মহিলা আগমন করলে তার কাছ থেকে তিনি তাদের অবস্থা জেনে নেন। উক্ত মহিলা জানায় যে, আমি তাদেরকে দেখে এসেছি। তারা ভালো আছেন। তাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নবীজী বললেন ঃ

صَحِبَهُمَا اللهُ – اِنَّ عُثْمَانُ اَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ بِاَهْلِه.

–আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন। ওসমান হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি, যে পরিবার-পরিজন নিয়ে হিজরত করেছে।[৯]

হযাবশায় দীর্ঘ দিন অবস্থান শেষে হযরত ওসমান (রাঃ) মক্কায় ফিরে আসেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থানের পর পরিবার-পরিজন নিয়ে তিনি মদীনা শরীফ গমন করেন।

হাবশায় অবস্থান কালে হযরত রোকাইয়্যার গর্ভে একটা পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। তার নাম ছিল আবদুল্লাহ্। এ জন্য হযরত ওসমানের (রাঃ) কুনিয়াত হয় আবূ আবদুল্লাহ্।[১০] এর আগে গর্ভপাতের ফলে একটা সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। আবদুল্লাহ্র ৬ বৎসর বয়সে একটা মোরগ তার চোখে ঠোকর মারলে চোখ নষ্ট হয়ে যায়। গোটা চেহারা ফুলে যায়। অবশেষে চতুর্থ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে তার মৃত্যু হয়। নবীজী জানাযার

নামায পড়ান। হযরত ওসমান (রাঃ) তাকে কবরে রাখেন। এরপর হযরত রোকাইয়্যার গর্ভে আর কোন সন্তান হয়নি।[১১]

ওফাত

মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত রোকাইয়্যার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। বসন্ত দেখা দেয়। 'তারীখুল খামীস' গ্রন্থকারের মতে তার বুকে একটা ফোঁড়া দেখা দেয়। ফরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। যাই হোক, তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তখন ছিল বদর যুদ্ধের সময়। নবীজী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাই তিনি হযরত রোকাইয়্যার সেবা-শুশ্রূষার জন্য হযরত ওসমানকে মদীনায় রেখে আসেন এবং নিজে যুদ্ধে গমন করেন।[১২] তখন ছিল রমযান মাস। হিজরতের একবৎসর সাত মাস পরে হযরত রোকইয়্যার ইন্তিকাল হয়। তাকে যখন কবরে রাখা হয়, ঠিক সে সময় হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা যুদ্ধে বিজয় লাভের সুসংবাদ নিয়ে আসেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীজী ফিরে এলে তাকে হযরত রোকাইয়্যার ইন্তিকালের খবর দেয়া হয়। আঁ-হযরত বলেন ঃ

اَلْحِقِىْ بِسَلَفِنَا عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنَ.

ওসমান ইবনে মায্‌উন আগে গিয়েছে, আর এখন তুমিও তার সাথে মিলিত হও। ওসমান ইবনে মায্‌উন ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহাবী। মুহাজিরদের মধ্যে মদীনায় সর্বপ্রথম তার ইন্তিকাল হয়।

নবীজীর কথা শুনে সব নারী কাঁদতে শুরু করে। ইতিমধ্যে হযরত উমরও হাযির হন। নারীদেরকে কাঁদতে দেখে তিনি তাদের কান্না থামাবার চেষ্টা করেন। নবীজী বললেন, তাদেরকে কাঁদতে দাও। কারণ কান্নার সম্পর্ক যখন অন্তর এবং চোখের সাথে থাকে, তখন এটা হয় আল্লাহ্‌র রহমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর যখন এর সম্পর্ক হাত এবং মুখের সাথে থাকে, তখন একে শয়তানী প্ররোচনা মনে করবে।[১৩] হযরত রোকাইয়্যার ওফাতে লোকেরা নবীজীকে সান্ত্বনা দিলে তিনি বলেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ دُفِنَ الْبَنَاتُ الْمُكَرَّمَاتُ.

আল-হামদুলিল্লাহ। সম্মানীতা কন্যার দাফন হয়েছে। এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত ফাতিমা হযরত রোকাইয়্যার কবরের কাছে নবীজীর পাশে বসে কাঁদতে থাকলে তিনি নিজের চাদরের একাংশ দিয়ে তার চোখের পানি মুছে দেন।[১৪]

মুহাম্মাদ ইবনে সাআদ বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে উমরের কাছে এ বর্ণনার কথা বললে তিনি বলেন, আমার মতে অধিক সত্য এই যে, হযরত রোকাইয়্যার ইন্তিকালের সময় নবীজী বদর যুদ্ধে ছিলেন। তিনি দাফনে শরীক ছিলেন না। সঠিক ধারণা এই যে, এ বর্ণনা অন্য কোন কন্যা সম্পর্কে, হযরত রোকাইয়্যা সম্পর্কে নয়। বর্ণনাকারী ভুল করে থাকবেন। বর্ণনাকারীর ভুল মেনে নেয়া হলে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, নবীজী বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তার কবরে গমন করেন এবং সেখানে এ ঘটনা ঘরে থাকতে পারে।

হযরত রোকাইয়্যা ছিলেন খুব সুন্দরী। তার দৈহিক গঠন ছিল সুঠাম। দররুল মানসূর গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন অতি রূপসী রমণী।

হাবশার একটা দল তার রূপ-সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতো। এরা তাকে খুব কষ্ট দেয়। তিনি তাদের জন্য বদদোয়া করলে সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়।[১৫]

হযরত ওসমান, প্রিয় জীবন সঙ্গিনীর ইন্তিকালে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং মনের গভীরে ভালবাসা জীবন্ত করে রাখেন। তবে তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা প্রবাদ হয়ে আছে,[১৬] এ প্রবাদ বাক্য তাদের প্রসঙ্গেই প্রচলিত হয়েছিল আরবে।

১. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৪, ২. সীরাতে ইবনে হিশাম পৃষ্ঠা ২৮ তাবারী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৪৬, ৩. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৪ আল এছাবাহ কিতাবুন নিসা রোকাইয়া প্রসঙ্গ, ৪. আল এছাবাহ পৃষ্ঠা ৬২৮-৬২৯, ৫. আল এছাবাহ পৃষ্ঠা ৬২৯, ৬. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৮, ৭. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৪ আদ দুররুল মানসূর পৃষ্ঠা ২০৭, ৮. আল-এছাবাহ পৃষ্ঠা ৫৮২ তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৪, ৯. আল-এছাবাহ পৃষ্ঠা ৫৮২-৫৮৩, ১০. তবকাত পৃষ্ঠা ২৪, ১১. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৪৫৬ তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা২৪, ১২. আল এছাবাহ পৃষ্ঠা ৫৮৩, ১৩. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৪, আল এছাবাহ পৃষ্ঠা ৫৮২. ১৪. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৪৯ আল এছাবাহ পৃষ্ঠা ২৪-২৫. ১৫. আদ-দুরুল মানসূর পৃষ্ঠা ২০৭, ১৬. আল এছাবাহ পৃষ্ঠা ৬২৯।

১৫

হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) বিনতে রাসূলাল্লাহ্ (সাঃ)

উম্মে কুলসুম হযরত (সাঃ) এর তৃতীয় কন্যা। মাতা খাদীজা ইবনেতে ওয়াইলিদ। হযরত যুবাইর-এর মতে হযরত উম্মে কুলসুম ছিলেন হযরত রোকাইয়্যা ও হযরত ফাতিমার চেয়ে বড়। অবশ্য জীবনী লেখকগণ এ ব্যাপারে তার সাথে একমত নন। আমাদের মতে সত্য এবং নির্ভরযোগ্য কথা এই যে, তিনি ছিলেন হযরত রোকাইয়্যার চেয়ে ছোট। হযরত রোকাইয়্যার ইন্তিকাল হলে নবীজী হযরত ওসমান (রাঃ) এর সাথে হযরত উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দেন।[১] হযরত উম্মে কুলসুম হযরত রোকাইয়্যার চেয়ে বড় হলে আগে তাকেই হযরত ওসমান (রাঃ) এর নিকট বিয়ে দিতেন, হযরত রোকাইয়্যাকে নয়। সভ্যতা ও সামাজিক প্রথার দাবি অনুযায়ী আগে বড় কন্যার বিয়ে দেয়া হয়। সম্ভবতঃ এ কারণেই জীবনী লেখকগণ বয়সের ব্যাপারে হযরত যুবাইর এর সাথে একমত হতে পারেন নি।

কোন্ সালে তার জন্ম হয়েছে, এ ব্যাপারে ইতিহাস এবং জীবন চরিত গ্রন্থে কিছু উল্লেখ নেই। অনুমান করা যায় যে, হযরতের নবুওয়াতে লাভের ৬ বৎসর পূর্বে জন্ম হয়ে থাকবে। কারণ নবুওয়্যাতের ৭ বৎসর আগে হযরত রোকাইয়্যার এবং ৫ বৎসর আগে হযরত ফাতিমার জন্ম হয়। হযরত উম্মে কুলসুম হযরত রোকাইয়্যার চেয়ে ছোট এবং হযরত ফাতিমার চেয়ে বড় ছিলেন, এ কথা মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে, তার জন্ম নবুওয়্যাতের ৬ বৎসর আগে হয়েছে।

বিবাহ

তার শৈশব কাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। কারণ, তা ছিল এক বিপদসংকুল সময়। এ সময়ের জীবনেতিহাস সংরক্ষণ ছিল এক কঠিন কাজ্ এ কারণে বিবাহ থেকেই তার অবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

হযরত (সা:) নবুওয়াত লাভের পূর্বে আবূ লাহাবের পুত্র ওতবার সাথে কন্যা রোকাইয়্যাকে এবং আবূ লাহাবের অপর এক পুত্র ওতাইবার সাথে উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দেন। কিন্তু তিনি নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলে আবূ লাহাব পুত্রদ্বয়কে ডেকে বলে,

তোমরা তার [মুহাম্মদ (সা:) এর] কন্যাদেরকে তালাক না দিলে তোমাদের সাথে আমার উঠা-বসা হারাম।[২] হযরত রোকাইয়্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওতবা তাকে তালাক দিয়েছিল। এমনিভাবে ওতাইবাও পিতার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত উম্মে কুলসুমকে তালাক দেয়। এ উভয় তালাকের সময় এবং কারণ প্রায় এক। এ ব্যাপারে আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলও স্বামীকে সহায়তা করে। উভয় তালাকই দেয়া হয়েছে আক্দ-এর পর স্বামীর ঘরে তুলে নেয়ার আগে।

দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত রোকাইয়্যার ইন্তিকাল হলে হযরত ওসমান বিষণ্ন হয়ে পড়েন। নবীজী তার এ অবস্থা দেখে বলেন, তোমাকে দুঃখিত ও বিষণ্ন দেখতে পাচ্ছি। এর কারণ কি? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমার ওপর এমন বিপদ এসেছে, যা হয়তো আর কারো উপর আসেনি। হযরতের কন্যার ইন্তিকালে আমার আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে। রাসূলে খোদার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছুটে গেছে। এখন আমি কি করি? হযরত ওসমান (রা:) কথা শেষ না করার কথাটাই নবীজী বললেন, হযরত জিবরাঈল (আ:) আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা দরবার থেকে খবর দিয়েছেন আমার কন্যা উম্মে কুলসুমকে রোকইয়্যার মহরানারয় তোমার কাছে বিয়ে দেয়ার জন্য।[৩] তদনুযায়ী হযরত (সা:) তৃতীয় হিজরীর রউিল মাসে হযরত উম্মে কুলসুমকে হযরত ওসমান (রা:) এর নিকট বিয়ে দেন।[৪] বিয়ের দু'মাস পর তাকে ঘরে তুলে নেয়া হয়। এ পক্ষে তাদের কোন সন্তানাদী হয়নি।[৫]

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত

হযরত উম্মে কুলসুম মাতা হযরত খাদীজার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি অন্যান্য নারীদের সাথে নবীজীর হাতে বায়আত নেন। মহানবী মদীনায় হিজরত করার সময় পরিবার-পরিজন মক্কায় রেখে যান। মক্কায় অবস্থান আরও নাযুক হয়ে পড়লে হযরত সাওদা ও হযরত ফাতিমার সাথে তিনিও মদীনায় হিজরত করেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত আছে, হযরত (সাঃ) উম্মে কুলসুম এর ইন্তিকালে অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি কন্যার কবরে বসে থাকতেন আর তার চক্ষু থেকে পানি গড়িয়ে পড়তো।

এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত রোকাইয়্যার ইন্তিকালে পর হযরত উমর (রাঃ) হযরত ওসমানের নিকট স্বীয় কন্যা হাফছাকে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু হযরত ওসমান কোন জবাব না দিয়ে চুপ থাকেন। কারণ, তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে, হযরত (সাঃ) হযরত উমরকে বলেন, তুমি হাফছার জন্য ওসমান এর চেয়ে উত্তম স্বামী আর ওসমানের জন্য হাফছার চেয়ে উত্তম স্ত্রী খুজে আন। অতঃপর তিনি হাফছাকে নিজে বিয়ে করেন এবং উম্মে কুলসুমকে ওসমানের নিকট বিয়ে দেন। হযরত উম্মে কুলসুমের ইন্তি কালের পর নবীজী বলেন, আমার দশটা কন্যা থাকলে আমি একের পর এক করে ওসমানের কাছে বিয়ে দিতাম।[৬] অন্য বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত বলেছিলেন, আমার একশত কন্যা থাকলে আমি এক এক করে ওসমানের সাথে বিয়ে দিতাম।

ওফাত

বিয়ের পাঁচ বছর পর নবম হিজরীর শাওয়াল মাসে মদীনা শরীফে হযরত উম্মে কুলসুমের ইন্তিকাল হয়। আনসারদের নারীরা তাকে গোসল করান। এদের মধ্যে উম্মে আতিয়্যাও ছিলেন। নবীজী জানাযার নামায পড়ান। হযরত আবূ তাল্হা, হযরত আলী, হযরত, ফযল ইবনে আব্বাস এবং হযরত উসামা ইবনে যায়েদ তাকে কবরে রাখেন।[৫]

১. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৫, ২. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৬১২, ৩. ঐ পৃষ্ঠা ৬১২-৬১৩, ৪. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৫-২৬ আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৯৩, ৫. তারীখুল খামীস পৃষ্ঠা ৩১৩ উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৬১২ তবকাত পৃষ্ঠা ২৬।

হযরত ফাতিমা (রা:) বিনতে রাসূলাল্লাহ্ (সা:)

খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা:) ছিলেন রাসূলাল্লাহ্ (সা:) এর কনিষ্ঠা কন্যা। তার উপনাম ছিল উম্মে মুহাম্মদ। তার মধ্যে চরিত্র মাধুর্যের সব রকম গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। তার মাতাও ছিলেন হযরত খাদীজা ইবনেতে খুওয়াইলিদ। তিনি সারা জাহানের নারীদের সর্দার এবং জান্নাতেও তিনি হবেন নারীকূলের সর্দার। উপাধী হচ্ছে তাহেরা, মুতাহহারা, যাকিয়া, রাযিয়া, মারযিয়া এবং বতুল।[১] শাইখ ইবনে হাজার ফাতিমা, বতুল এবং যাহরা নাম করণের কারণ সম্পর্কে বলেন, তার নাম ফাতিমা রাখার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এবং যারা তাকে ভালোবাসে তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপদ রেখেছেন।[২] বতুল তার উপাধী হয়েছে এজন্য যে, ফযীলত-মর্যাদা, দ্বীনদারী এবং বংশ-মর্যাদায় তিনি ছিলেন তার সময়ের নারীদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। 'আখবারুদদুয়াল' গ্রন্থের রচয়িতা যাহরা নাম করণের কারণ হিসেবে বলেন, হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রা:) যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন ছিল আছর-মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়। এই সময়ই তিনি নেফাস থেকে পাক হন এবং গোসল করে নামায আদায় করেন। এ জন্য তার লকব হয়েছে যাহরা। মাওলানা শাহ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী বলেন, হযরত ফাতিমা (রা:) এর মধ্যে রূপ-সৌন্দর্য পূর্ণ মাত্রায় ছিল বলে তার লকব হয়েছে যাহ্রা। আর এটাই সঠিক কথা। আল্লামা কাসতালানী 'মাওয়াহেবে লাদুনিয়া' (খোদায়ী দান) গ্রন্থে লিখেন, অভিধানে ফাতম (فطم) অর্থ হচ্ছে শিশুকে দুধ পান করা থেকে বিরত রাখা। হযরত ফাতিমা যেন মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বিরত রাখবেন। বতুল শব্দটি বতুল

(بطل) থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ কাটা। মুনতাহাল আরব (منتهى الارب) অভিধান গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বতুল বলা হয় কুমারী নারীকে, যে কুমারী নারী দুনিয়া এবং আল্লাহ্ সব কিছু থেকে দূরে থাকে। হযরত ঈসা (আ:) এর মাতা হযরত মারইয়ামের লকবও ছিল বতুল।

শিশুকাল থেকেই তার প্রকৃতিতে ছিল দৃঢ়তা, স্থিরতা, গাম্ভীর্য ও সরলতা তার অন্যান্য বোনেরা খেলা-ধুলায় মগ্ন থাকতো, কিন্তু এ সবে তার মন বসতো না। কোথাও যাতায়াত করাও তার পছন্দ ছিল না। মাতার কাছে বসে থেকেই তিনি সময় কাটাতেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই সরলতা এবং দুনিয়া বিমুখতা খুব পছন্দ করতেন। এ কারণে তাকে বতুল বা দুনিয়াত্যাগী বলা হতো। চেহারা-সূরত এবং স্বভাব-চরিত্রে তিনি যেহেতু নবীজীর সাথে অনেকাংশে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন, তাই তার লকব হয়েছে যাকিয়া এবং রাযিয়া।

হযরতের নবুওয়্যাতে লাভের পাঁচ বৎসর পূর্বে তার জন্ম হয়েছে। এটা ছিল এক মোবারক সময়। এ সময় কোরাইশগণ কাবা শরীফ পুন; নির্মাণে ব্যস্ত ছিল।[৩] ইবনে সিরাজ আবূদল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আল হাশেমীর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করে বলেন, নবুওয়াতের প্রথম বর্ষে হযরত ফাতিমার জন্ম হয়েছে। হযরত আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন কা'বা শরীফ পুন: নির্মাণ কাজ চলছিল, সে সময় হযরত ফাতিমার জন্ম হয়েছে।[৪] তখন নবীজীর বয়স ছিল ৩৫ বৎসর।[৫] আবূ ওমর আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, নবীজীর জন্মের ৪১ তম বর্ষে নবুওয়াত লাভের এক বৎসর বা কিছু বেশি সময় আগে হযরত ফাতিমার জন্ম হয়েছে। তিনি হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বাঁচ বৎসর বড় ছিলেন।

বিবাহ

নবীজী যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন ফাতিমার বিয়ের বয়স হয়েছে। নানা দিক থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে। সর্ব প্রথম হযরত আবূবকর (রা:) হযরত ফাতিমার সাথে বিয়ের প্রস্তাব করেন। নবীজী বলেন, আল্লাহ্র হুকুমের জন্য অপেক্ষা কর।[৭] হযরত আবূবকর এ সম্পর্কে উমরকে জানান এবং বলেন, তুমিও নিজের জন্য প্রস্তাব কর। সে মতে হযরত উমরও প্রস্তাব

করেন। তাকেও একই জবাব দেয়া হয়। হযরত উমর এ জবাব সম্পর্কে হযরত আবূবকরকে অবহিত করেন। এরপর অনেকেই হযরত আলী (রাঃ) কে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু নিজের অভাব-অনটনের কথা চিন্তা করে তিনি ইতস্তত করেন। তিনি এটাও চিন্তা করেন যে, হযরত আবূ বকর এবং হযরত উমরের পর আমার আর স্থান কোথায়।[৮] কিন্তু এর পরও লোকেরা পীড়াপীড়ি করলে তিনি হযরতের নিকট ফাতিমার সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব করেন। নবীজী তার এ প্রস্তাব কবুল করেন। হযরত (সাঃ) ফাতিমাকে বলেন, আলী তোমার প্রতি আগ্রহী। তিনি চুপ থাকেন। এ চুপ থাকাও ছিল এক ধরনের সম্মতি। অবশেষে হযরত (সাঃ) হযরত আয়েশার বিয়ের চার মাস পর দ্বিতীয় হিজরীর মুহররম মাসের প্রথম দিকে হযরত ফাতিমাকে হযরত আলীর সাথে বিয়ে দেন।[৯] অন্যান্য জীবনী লেখকদের বর্ণনা অনুযায়ী এ বিয়ে হয় ওহোদ যুদ্ধের পর। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হযরত আয়েশাকে ঘরে তুলে আনার সাড়ে চার মাস পর এ বিয়ে হয় এবং সাড়ে সাত মাস পরে হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতিমাকে ঘরে তুলে নেন। কারো কারো ধারণা, হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকে ঘরে তুলে আনার সাড়ে পাঁচ বৎসর পরে এ বিয়ে হয় এবং বিয়ের সাড়ে ন'মাস পরে হযরত আলী তাকে ঘরে তুলে নেন।[১০] তখন হযরত ফাতিমার বয়স হয়েছিল ১৫ বছর সাড়ে চার মাস। আর হযরত আলীর বয়স ছিল ২১ বছর সাড়ে পাঁচ মাস[১১] অর্থাৎ হযরত আলী বয়সে হযরত ফাতিমার চেয়ে ৬ বছর বড় ছিলেন। বিয়ের জন্য হযরত আলী তার উট এবং অন্যান্য আসবাবপত্র বিক্রয় করেন। এসব বিক্রি করে ৪'শ ৮০ দিরহাম সংগৃহীত হয়। নবীজী বলেন, দুই তৃতীয়াংশ খোসবু ইত্যাদির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ অন্যান্য কাজে ব্যয় কর।[১২]

মওলানা সাঈদ আনসারী সিয়ারুস সাহাবিয়্যাত (মহিলা সাহাবীদের জীবন চরিত) গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৯৪) হযরত ফাতিমা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, ইবনে সা'আদ বর্ণনা করেন যে, সর্ব প্রথম হযরত আবূ বকর (রাঃ) নবীজীর নিকট আবেদন জানান। তিনি বলেন, আল্লাহ্র যদি হুকুম হয়। এরপর হযরত উমরও সাহস করেন। তাকেও কোন জবাব দেননি বরং আল্লাহ্র হুকুমের কথা বলেন। এরপর মাওলানা লিখেন, বাহ্যত এ বর্ণনা ঠিক বলে মনে হয় না। হাফেজ ইবনে হাজার 'এছাবা' গ্রন্থে হযরত

ফাতিমা সম্পর্কে অধিকাংশ বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি এ বর্ণনাটি বাদ দিয়েছেন।

মাওলানা ইবনে সা'আদের বিশেষ এ বর্ণনাটির সাথে কেন এমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, তা বুঝা মুশকিল। ইবনে হাজার কোন বর্ণনার উল্লেখ না করলেই তা অসত্য অভিহিত করার কি কারণ থাকতে পারে? মাওলানা নিছক নিজের মত কাজে লাগিয়েছেন, কোন বিচার-বিশ্লেষণ করেননি। কোন হাদীসও উপস্থাপন করেননি। আমার মতে এ বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। হযরত আবূ বকর এবং হযরত উমরের পয়গামের ফলে চরিত্রে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। নবীজীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে কে আকাঙ্খী ছিল না? হযরত আবূবকর তো ছিলেন নবীজীর গুহার সাথী, আর হযরত উমর ছিলেন ইসলামের বিরাট সহায়ক। হাফেয ইবনে হাজার তার গ্রন্থে কোন বর্ণনা উল্লেখ না করায় তা সত্য না হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

হযরত আলীর যবানীতে বিয়ের বর্ণনা

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু নিজ যবানীতে বিয়ের বর্ণনা দেন এভাবে : আমার এক দাসী ছিল, যাকে আমি আযাদ করে দেই। সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, হযরত ফাতিমার জন্য কেউ কি বিয়ের প্রস্তাব করেছে? আমি বললাম জানিনা না। এরপর সে বললো, আপনি পয়গাম দিন, এতে বাধা কিসের? আমি বললাম, কিসের ভিত্তিতে? আমার তো কিছুই নেই। সে আবার বলে, না, আপনি নবীজীর খেদমতে হাজির হোন। বারবার দাসী বলায় আমি হযরতের দরবারে হাজির হই। কিন্তু তার প্রভাব ও ভীতি আমার ওপর এমন ক্রিয়া করে যে, কিছুই বলার সাহস আমার হয়নি। আমি চুপচাপ বসেছিলাম। কিছু বলার ক্ষমতাই ছিল না আমার। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরে নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, ফাতিমার জন্য পয়গাম নিয়ে এসেছ? আমি বললাম, জি জনাব। হযরত বললেন, মহরানা আদায় করার মতো তোমার কিছু আছে? আমি আরয করলাম, নাই। হুজুর বললেন আমি তোমাকে যে লৌহ বর্ম দিয়েছিলাম তা কোথায়? তাই মহরানা হিসেবে দাও। তার মূল্য চারশ দিরহামের বেশি ছিল না। বিয়ে হয়ে যায় এবং সেটাই মহরানা হিসেবে দেওয়া হয়।[১৩]

অপর এক বর্ণনা মতে একদল আনছার হযরত আলীকে (রা:) কে উৎসাহিত করলে তিনি হযরতের নিকট গমন করেন। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই? তিনি আরয করলেন, আমি হযরত ফাতিমাকে বিয়ে করতে আগ্রহী। তিনি বললেন, আহলান মারহাবান-খোশ আমদেদ। এ দু'টি শব্দ ছাড়া তিনি আর কিছুই বলেননি। হযরত আলী বাইরে এলে অপেক্ষমান আনছার দল জানতে চাইলেন, হযরত কি জবাব দিয়েছেন? তিনি বলেন, আহলান মারহাবান ছাড়া কিছুই বলেন নি। তারা বললেন, হযরতের এটুকু বলাই যথেষ্ট।

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত বলেন, বিয়ের জন্য ওলীমাও জরুরী। হযরত সাআদ বললেন, আমার কাছে একটা ভেড়া আছে, তা দিয়ে ওলীমা করা যায়। আনছারদের একটা কবীলাও সাধ্য অনুযায়ী ওলীমার ব্যবস্থা করে। তদনুযায়ী খাদ্য পরিবেশন করা হয়।[১৪]

হযরত আলী (রা:) রাসূলে খোদার ঘর থেকে কিছুটা দূরে একটা ছোট ঘর ভাড়া নেন। হযরত (সা:) দাসী উম্মে আইমানসহ হযরত ফাতিমাকে হযরত আলীর ঘরে বিদায় দেন। বিদায়ের সময় তিনি বলেন, তুমি আমার সাথে দেখা করবে। এরপর তিনি হযরত আলীর (রা:) ঘরে যান। পানি চেয়ে নিয়ে ওযু করেন এবং তার গায়ে ওযুর পানি ছিটিয়ে এ দোয়া পড়েন ঃ[১৫]

اللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِىْ نَسْلِهِمَا.

–হে খোদা! তাদেরকে বরকত দাও, তাদের ওপর বরকত নাযিল কর এবং তাদের বংশে বরকত দাও। অপর এক বর্ণনায় যায় যে, রাসূলে খোদার আদরের দুলালী বিদায় নিয়ে শ্বশুরালয়ে গমনকালে হযরত (সা:) হযরত আলী (রা:) এবং হযরত ফাতিমা (রা:) উভয়ের ঘরের এক কোণে বসেন। এরপর হযরত (সা:) আগমন করে দরজায় করাঘাত করলে উম্মে আইমান দরজা খুলতে আসেন। এ সময় তাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তা এরূপ ঃ

আঁ-হযরত: আমার ভাই কি ঘরে আছে?

উম্মে আইমান: তিনি আপনার ভাই হবেন কিভাবে? আপনি তো তার কাছে আপনার কন্যাকে বিয়ে দিয়েছেন।

আঁ হযরত: হ্যাঁ, তাই হয়। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এখানে কি আসমা ইবনেতে আমীস আছে? তুমি কি আমার কন্যার সেবা-যত্নের জন্যে এসেছ?

উম্ম আইমানঃ- জি, আসমা আমীস আছে। আমি রাসূলে খোদার কন্যার সেবা-যত্নের জন্যে এসেছি।

তিনি উম্মে আইমানকে দোয়া করেন। এরপর ভেতরে গিয়ে পানি চাইলে তাকে একটা পাত্রে করে পানি দেয়া হয়। তিনি পানি ব্যবহার করে অপর এক বর্ণনা মতে সে পানিতে হাত ধুয়ে হযরত আলী (রাঃ) কে ডেকে তার দু'বাহু এবং বুকে ছিটিয়ে দেন। এরপর হযরত ফাতিমাকে ডাকলেন তিনি অবনত হয়ে নবীজীর কাছে এলেন। তিনি তার গায়েও পানি ছিটিয়ে দিয়ে বলেন, ফাতিমা! তোমার বংশের উত্তম ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিয়ে দিয়েছি।

মহরানা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি যখন বিয়ের পয়গাম নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে করি, তখন মহরানা আদায় করার মতো কিছুই ছিল না আমার কাছে। আমি যখন এ নিয়ে চিন্তিত, তখন হযরত (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মহরানা কি দেবে? আমি বললাম, আমার কাছেতো কিছুই নেই। তিনি বললেন, সেদিন আমি তোমাকে যে লৌহবর্মটি দিয়েছিলাম, তা কোথায়? আমি আরয করলাম, তা আমার কাছে আছে। হযরত বললেন, তবে তাই মহরানা হিসাবে দাও। মহরানা হিসাবে আমি তারই হযরত ফাতিমাকে দেই। ইকরামা বলেন, লৌহ বর্মটির মূল্য ছিল মাত্র চার দিরহাম।[১৫] রাসূলের এ বর্ণনায় লৌহবর্মের মূল্য চার দিরহাম বলে উল্লেখ করা বর্ণনাকারীর ভুল। আসলে তা হবে চার'শ দিরহাম। অন্যান্য বর্ণনায় চারশত আশি দিরহাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, হযরত ফাতিমার মহরানা চার'শ আশি দিরহামের কম ছিল না।

জীবন চরিতকারদের এ ব্যাপারে নানা মত দেখা যায়। কেউ বলেন, তখন হযরত আলীর কাছে একটা লৌহবর্ম ছাড়া কিছুই ছিল না। তাই মহরানা হিসেবে দেয়া হয়েছে। কেউ বলেন, মহরানা নির্ধারণ করা হয়েছে চার'শ আশি দিরহাম। এর এক তৃতীয়াংশ খোশবু কেনার কাজে ব্যয় করার জন্য

আঁ-হযরত হুকুম দেন। কারো কারো ধারণা, হযরত আলী (রাঃ) রাসূলে খোদার নির্দেশে হযরত ফাতিমাকে ঘরে তুলে নেয়ার আগে মহরানার বিনিময়ে উক্ত লৌহ বর্মটিই তার হাতে তুলে দেন।[১৬]

জহীব বা যৌতুক (উপঢৌকন)

ইকরামার বর্ণনা অনুযায়ী শাহানশাহে আলম তার কন্যা সাইয়্যেদায়ে আলম-(দুনিয়া জাহানের নেত্রী) হযরত ফাতিমাকে নিম্নোক্ত যৌতুক (উপঢৌকন) দেন, নকশা করা খাট ১টি, বালিশ ১টি, যার ভেতরে ছিল খেজুরের ছাল, পেয়ালা ১টি মশক ২টি এবং কলসী ২টি।[১৭]

সন্তানাদী

হযরত ফাতিমার গর্ভে ২টি পুত্র সন্তান হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন এবং ২টি কন্যা সন্তান হযরত উম্মে কুলসুম ও হযরত যয়নব জন্ম গ্রহণ করেন।[১৮] গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিচারে এরা সকলেই ইসলামের ইতিহাসে মশহুর হয়ে আছেন। হযরত (সাঃ) এদের সকলকেই অত্যন্ত ভালবাসতেন। হযরতের কন্যাদের মধ্যে কেবল হযরত ফাতিমা-ই এ গৌরব লাভ করেন যে, তার মাধ্যমেই নবীজীর বংশ টিকে আছে।[১৯] অন্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মুহসেন এবং রোকাইয়া নামে তার দু' সন্তান ছিলেন,[২০] যারা শৈশবেই মারা যান।

ফযীলত-মর্যাদা

হযরত ফাতিমার ফযীলত-মর্যাদা অনেক। আঁ-হযরতের আহলে বায়তের মধ্যে অনেক মর্যাদা শামিল থাকলেও তাদের মধ্যে হযরত ফাতিমার অস্তিত্ব ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আয়াতে তাতহীর বা পরিচ্ছন্নতার আয়াত ঃ[২১]

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

(الاحزاب : ٣٣)

–হে আহলে বায়ত, আল্লাহ্ তো চান তোমাদের নাপাকী দূর করতঃ ভালোভাবে তোমাদেরকে পাক করতে।

এ আয়াতটি হযরত ফাতিমার ফযীলত-মর্যাদা বিশেষভাবে প্রমাণ করে। আব্দুর রহমান ইবনে আবূ নুয়াইম আবূ সাইদ আল-খাদ্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, হযরত (সাঃ) বলেছেন ঃ

سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مَرْيَمُ ثُمَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ خدِيجَةُ ثُمَّ اسِيَةُ امْرَاةُ فِرْعَوْنَ.

জান্নাতে নারীদের সর্দার হবেন মারইয়াম, তারপর ফাতিমা ইবনেতে মোহাম্মদ, এর পর খাদীজা, তারপর ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া।

হযরত (সাঃ) একবার মাটির উপর চারটি রেখা টানেন এবং লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা জান, এটা কি? সকলেই আরয করলো, আল্লাহ্ এবং তার রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, ফাতিমা ইবনেতে মোহাম্মদ, খাদীজঅ ইবনেতে খুওয়াইলিদ, মারইয়াম ইবনেতে ইমরান এবং আছিয়া ইবনেতে মুযাহেম, জান্নাতবাসী নারীদের মধ্যে এদের ফযীলত সবচেয়ে বেশি।[২২]

আল্লাহ্ তা'আলা নারী সমাজের মধ্যে হযরত ফাতিমাকে যে ফযীলত-বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, তার কোন নযীর নেই। হযরত ফাতিমার ফযীলত সম্পর্কে হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে ঃ[২৩]

তোমাদের অনুসরণের জন্য দুনিয়ার স্ত্রীদের মধ্যে মারইয়াম ইবনেতে ইমরান, খাদীজা ইবনেতে খুওয়াইলদ, ফাতিমা ইবনেতে মুহাম্মদ এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া যথেষ্ট।

সততা-সত্যবাদীতায়ও তাঁর কোন তুলনা ছিল না। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন ঃ[২৪]

আমি ফাতিমার চেয়ে সত্যবাদী কাউকে দেখিনি। অবশ্য তাঁর পিতার কথা স্বতন্ত্র। তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম।

হযরত (সাঃ) কোন সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে হযরত ফাতিমার ঘরে যেতেন।[২৫] তিনি হযরত ফাতিমাকে যতটা ভালোবাসতেন, অন্য কোন সন্তানকে ততটা ভালোবাসতেন না। অথচ তার কোন কোন বোন তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমতি এবং রূপবতী ছিলেন। কিন্তু হযরতের কাছে হযরত ফাতিমা

ছিলেন সবচেয়ে প্রিয়।[২৭] হযরত (সা:) হযরত ফাতিমাকে বলেন, তোমার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন, আর তোমার রাগ উষ্মায় আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হন।[২৮] নজীবী কোন যুদ্ধ বা কোন সফর থেকে ফিরে প্রথমে মসজিদে যেতেন। দু'রাকাত নামায পড়তেন। পরে হযরত ফাতিমার ঘরে যেতেন। এর পর স্ত্রীদের কাছে যেতেন।[২৯] কোন এক তাবেয়ী হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলে খোদা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন কাকে? জবাবে তিনি বলেন, নারীদের মধ্যে হযরত ফাতিমাকে, আর পুরুষদের মধ্যে হযরত আলীকে।[৩০]

হযরত ফাতিমা জীবনে সকল কাজে রাসূলে খোদাকে অনুসরণ করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, আমি ওঠা-বসা, চাল-চলন এবং কথা বলার ভাব-ভঙ্গীতে আঁ-হযরতের সাথে হযরত ফাতিমার চেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ কাউকে দেখিনি। হযরত ফাতিমা নবীজীর নিকট আগমন করলে তিনি উঠে দাঁড়াতেন, কপালে চুমু খেতেন এবং নিজের স্থানে বসাতেন।[৩১]

হযরত ফাতিমাও রাসূলে খোদার সাথে এরূপ করতেন।[৩২] হযরত উম্মে সালমা বলেন, চাল-চলন এবং কথা বলার ভাব-ভঙ্গীতে আঁ-হযরতের উৎকৃষ্ট নমুনা ছিলেন হযরত ফাতিমা (রা:)। হযরতের চেহারার সাথে হযরত ফাতিমার চেহারার অনেকটা মিল ছিল। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, আমার চক্ষু হযরত ফাতিমার পর রাসূলে খোদার চেয়ে উত্তম কাউকে দেখেনি।[৩৩] নবীজী বলেন ঃ

فَاطِمَةُ مُضْغَةٌ مِنِّي فَمَنْ اَغْضَبَهَا فَقَدْ اَغْضَبَنِي.

অর্থ: ফাতিমা আমার দেহের একাংশ। যে তাকে নারায করবে, সে আমাকে নারায করবে।[৩৪]

সাধারণ অবস্থা

কন্যা-সে আমীরের হোক বা ফকীরের-বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সে পিতা-মাতার গৃহেই প্রতিপালিত হয়। পিতা-মাতার গৃহেই সে জীবনের উৎকৃষ্ট সময় কাটায়। ফলে পিতা-মাতা এবং সে গৃহের সাথে তার এক স্বাভাবিক সম্পর্ক এবং ভালবাসা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এরপর একটা সময় আসে, যখন তাকে এক নতুন দুনিয়া, নতুন জীবন এবং নতুন লোকদের সংস্পর্শে

আসতে হয়। এটা এমন এক সময়, যখন পিতা-মাতা শরীয়ত-আইন এবং তমদ্দুন অনুযায়ী কন্যাকে পর পুরুষের হাতে তুলে দেন। এ সময়টি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক, এ কথা কে না জানে? কন্যাকে বিদায়ের সময় তার এককালের নিবাস মাতম খানায় পরিণত হয়। চারিদিকে কান্নার রোল পড়ে। মনের দাবিতে বাধ্য হয়ে কন্যাকেও কাঁদতে হয়। হযরত ফাতিমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বিয়ের কথা শুনে পিতৃগৃহ ত্যাগের কথা চিন্তা করে তিনিও কাঁদতে শুরু করেন। এ সময় সারওয়ারে কায়েনাত আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে প্রবেশ করেন। হযরত ফাতিমাকে এভাবে কাঁদতে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কন্যা! কেন এ কান্না? আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছি, যিনি জ্ঞান ও সহনশীলতায় সকলের চেয়ে উত্তম এবং ইসলাম গ্রহণে ছিলেন প্রথম ব্যক্তি।[৩৫]

একবার হযরত ফাতিমা কিছুটা অসুখ বোধ করেন। নবীজী তাঁকে দেখতে যান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কন্যা, তুমি কেমন আছ? আরয করলেন, আমার খারাপ লাগছে। আর এ খারাপ লাগায় আরও সংযোজিত হয়েছে যে, ঘরে খাবার কিছুই নেই। নবীজী বললেন, কন্যা! তুমি নারীদের সর্দার হবে- এটা কি তোমার পছন্দ নয়? আরয করলেন, তাহলে মারইয়াম ইবনেতে ইমরানের মর্তবা কি? নবীজী বললেন, তিনি ছিলেন তার সময়ের নারীদের সর্দার, আর তুমি তোমার সময়ের নারীদের সর্দার। খোদার কসম, আমি দ্বীন-দুনিয়ার সর্দারের সাথে তোমাকে বিয়ে দিয়েছি।[৩৬]

হযরত (সাঃ) মদীনায় হিজরত করে হযরত আবূ আইউব আনসারীর গৃহে অবস্থান করেন। হযরত ফাতিমার বিয়ে হলে তিনি হযরত আলীকে একটা ঘর নিতে বলেন। তিনি হযরতের গৃহ থেকে কিছুটা দূরে একটা ঘর ভাড়া করেন। এই ঘরেই হযরত ফাতিমাকে দেখতে যান। কথা প্রসঙ্গে নবীজী প্রিয় কন্যাকে বলেন, আমি তোমাকে কাছে রাখতে চাই। হযরত ফাতিমা আরয করলেন, আপনি হারেস ইবনে নু'মানকে বললে তিনি আমাদের থাকার জন্য একটা ঘর দিতে পারেন। হযরত বললেন, কন্যা! হারেস ইবনে নু'মানকে এমন কথা বলতে আমার লজ্জা হয়। হারেস এ সম্পর্কে জানতে পেরে নবীজীর দরবারে হাযির হয়ে আরয করেন, আমি জানতে পেলাম যে, আপনি সাহেবজাদীকে নিকটে কোন গৃহে রাখতে চান। আমার সমস্ত ঘর

হাযির। আপনি হযরত ফাতিমাকে ডেকে এবং পাঠান। আমার জান মাল আল্লাহ্ রাসূলের জন্য কোরবান। খোদার কসম, আপনি যে জিনিস আমার কাছ থেকে নিবেন, তা আপনার কাছে থাকা আমার নিজের কাছে থাকার চেয়ে আমার নিকট বেশি প্রিয় হবে। রাসূলে খোদা বললেন, তুমি ঠিক বলেছ। আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দিন। তোমার প্রতি রহমত নাযিল করুন। এরপর হযরত ফাতিমাকে হযরত হারেস ইবনে নু'মানের গৃহে স্থানান্তরিত করেন।[৩৭]

হযরত ফাতিমা ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার-মোত্তাকী দ্বীনদার মহিলা। তার প্রায় সারাটা জীবনই কেটে গেছে দুনিয়া ত্যাগ আর অল্পে তুষ্টিতে। ধৈর্য ও সহনশীলতা, দুনিয়া ত্যাগ আর পরহেজগারী এবং লাজ-লজ্জায় তিনি ছিলেন উত্তম নমুনা। দুনিয়ার কষ্ট এবং বিপদাপদের কথা তিনি কিছুই ভাবেননি। তিনি ঘরের সমস্ত কাজ নিজেই করতেন। তার সারাটা জীবন কতটা টানাটানির মধ্যে কেটেছে, এ থেকেই তা অনুমান করা যায়। পরিশ্রমের সব কাজ নিজ হাতেই করতেন। চাক্কী পিষতে পিষতে হাতে ফোস্কা পড়ে যেতো। ঘর ঝাড়ামোছা করতে করতে কাপড় ময়লা হয়ে যেতো। মশক ভরে পানি উঠাতে দুর্বল সীনা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

দিকে দিকে বিপুল বিজয়ের পর মদীনায় প্রাচুর্যের ঢল নেমে আসে। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, এতে সারা জাহানের নেত্রী হযরত ফাতিমার কোন অংশ ছিল কি-না, তাহলে এর নেতিবাচক জবাব ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। এতদসত্ত্বেও তার করুণ অবস্থার কথা জানিয়ে নবীজীর নিকট দাসীর জন্য আবেদন জানালে তিনি অন্যভাবে সান্ত্বনা দিতেন। কখনো কোন ওযীফা বলে দিতেন, কখনো দুনিয়ার অস্থায়ীত্বে কথা বুঝাতেন; কখনো সরাসরি নাকচ করে বলতেন, এতা ফকীর মিসকীনদের হক। হাদীস শাস্ত্রের বড় বড় ইমামগণ বলেন, চাক্কী ঘুরাতে ঘুরাতে হযরত ফাতিমার হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিল। চুলা ফুকতে ফুকতে চেহারার রং বিগড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোন দাসী-সেবিকা রাখার সামর্থ্য ছিল না। একদিন হযরত আলী হযরত ফাতিমাকে বলেন, তোমার তো পানি টানতে টানতে বুক ব্যথা হয়ে গেছে। এখন তো দরবারে নবুওয়াতে অনেক কয়েদী

এসেছে! তুমি যাও, নবীজীর কাছ থেকে একজন খাদেম চেয়ে নাও। হযরত ফাতিমা বললেন, আমি কাকে বলবো? আমার অবস্থা তো এই যে, চাক্কী পিষতে পিষতে আমার হাত ফোসকা পড়ে গেছে। অতঃপর তিনি মহান পিতার খেদমতে হাযির হন। পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, কি অবস্থা, কেন এসছো? কোন দরকার আছে? তিনি বললেন না কোন কাজ নেই, শুধু সালাম জানাবার জন্য এসেছি। এরপটর হযরত ফাতিমার সালাম নিবেদন করে ফিরে আসেন। যেসব কথা বলা দরকার ছিল আর যে নিবেদন করার জন্য গিয়েছিলেন, লজ্জায় তা বলেননি। ঘরে ফিরে গেলে হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যে কাজের জন্য গিয়েছিলে, তার কি হলো? কি ব্যবস্থা করে এলে? জবাবে বলেন, আমি কেবল সালাম জানিয়ে ফিরে এসেছি। আমার লজ্জা কোন কিছু বলার এবং কোন প্রশ্ন করার অনুমতি দেয়নি। এরপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আঁ-হযরতের খেদমতে হাযির হন। হযরত আলী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পানি টানতে টানতে বুকে ব্যথা হয়ে গেছে। হযরত ফাতিমা আরয করলেন, চাক্কী পিষতে পিষতে হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে। এতসব কষ্ট তো আর সয়না। আপনার দরবারে অনেক কয়েদি এসেছে, তাদের একজন আমাদেরকে দান করুন। হযরত বললেন, খোদার কসম, তোমাদের খেদমতের জন্য আমি কোন কয়েদী দিতে পারি না। আমি কি আহলে সুফফার হক মারবো? তাদের জন্য ব্যয় করার অর্থাৎ তাদের সাহায্য করার জন্য কিছুই নেই আমার কারেছ। হ্যাঁ, এসব কয়েদী বিক্রী করে তার মূল্য দিয়ে আহছেলসুফফার প্রয়োজন পূরণ করতে পারি।

ইনসাফপূর্ণ ও নীতি ভিত্তিক জবাব শুনে স্বামী-স্ত্রী গৃহে ফিরে এল, নবীজীও হযরত আলীর গৃহে গমন করেন। তখন তিনি শুয়েছিলেন। নবীজীকে দেখে উভয়ই উঠেন তাকে খোশ আমদেদ জানাবার জন্য । নবীজী তাদেরকে বারণ করে বলেন, তোমরা আমার কাছে যে প্রয়োজন ব্যক্ত করেছিলে, সে জিনিষটি পেতে তোমরা আগ্রহী, না তার চেয়ে উত্তম জিনিস আমি তোমাদেরকে বলে দেবো? তারা বললেন, জি-হ্যাঁ, অবশ্যই বলবেন। তিনি বললেন, প্রত্যেক নামাযের পর দশবার সুব্হানাল্লাহ্, দশবার আল্হামদুলিল্লাহ এবং দশবার আল্লাহু আকবার পড়বে আর শোয়ার সময়

সুব্হানাল্লাহ্ ৩৩ বার আল্হামদুলিল্লাহ্ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়বে। এ হচ্ছে তোমাদের জন্য উত্তম খাদেম।[৩৮]

এ বর্ণনা প্রসংগে বর্ণনাকারী হযরত আলী এবং হযরত ফাতিমার অসহায়তা ও করুণ দৃশ বর্ণনা করেছেন এভাবে, তারা যখন বিছানায় শুয়েছিলেন, গায়ের চাদর এত ছোট ছিল যে, পা ঢাকলে মাথা ঢাকা হতো না, আর মাথা ঢাকলে পা ঢাকা হতো না।[৩৯]

হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতিমার প্রতি খুবই লক্ষ্য রাখতেন। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতেন না। কিন্তু এরপরও নবীজী তাকে তাকীদ করতেন যে, ফাতিমার সাথে ভালো আচরণ করবে। এ দিকে হযরত ফাতিমাকেও নছিহত করতেন যে, নারীর বড় কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর আনুগত্য করা, তার কথা মেনে চলা। মোট কথা, তিনি সব সময় উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করতেন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমন যে, কোন কোন সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যাতে দুঃখ-বেদনা প্রকাশ পেয়ে থাকে। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এতেও ভালোবাসা লুক্কায়িত থাকে।

একবার হযরত আলীর পক্ষ থেকে এমন কিছু আচরণ হয়, যা হযরত ফাতিমা সহ্য করতে পারেননি। তিনি বিষণ্ন মনে রাসূলাল্লাহ্র খেদমতে হাযির হন। হযরত আলীও পেছনে পেছনে গমন করেন। তিনি গিয়ে এমন স্থানে দাঁড়ান, যেখান থেকে তাঁদের উভয়ের কথা শুনতে পারেন। হযরত ফাতিমা হযরত আলীর বিরুদ্ধে ক্রোধের অভিযোগ করেন। হযরত বললেন, কন্যা! আমি যা বলছি, মনোযোগ দিয়ে শুন। এমন কোন নারী-পুরুষ আছে, যাদের মধ্যে কখনো কোন মন কষাকষি হয় না? আর পুরুষ সমস্ত কাজ নারীর ইচ্ছা অনুযায়ী করবে, তাকে কিছুই বলবে না? আর পুরুষ সমস্ত কাজ নারীর ইচ্ছা অনুযায়ী করবে, তাকে কিছুই বলবে না?[৪০] হযরত আলীর উপর এ নীতিগত জবাবের এমন প্রভাব পড়েছিল যে, এরপর তিনি এমন কোন কাজ করেননি, যাতে হযরত ফাতিমার মন বিষন্ন হতে পারে। হযরত আলী নিজেই বলেন, আমি হযরত ফাতিমার উপর যে কড়াকড়ি করতাম, তা থেকে নিবৃত্ত থাকি। আমি স্ত্রীকে বলি, খোদার কসম, ভবিষ্যতে আমি এমন কোন কাজ করবো না, যাতে তোমার কষ্ট হয় বা তোমার মনে আঘাত লাগে।

পারিবারিক বিষয় নিয়ে হযরত আলী এবং হযরত ফাতিমার মধ্যে কখনো মন কষাকষি হলে হযরত (সাঃ) এমনিভাবে আপোষ করাতেন। তাদের মধ্যে আপোষ করে তিনি এক অস্বাভাবিক আনন্দ বোধ করতেন। আর একবার এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে হযরত (সাঃ) হযরত আলীর গৃহে গমন করেন। এ সময় তাঁর চেহারায় দুঃখের কিছু ছাপ স্পষ্ট ছিল। তিনি উভয়ের মধ্যে আপোষ করিয়ে দেন। তিনি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন তার চেহারা ছিল প্রফুল্ল। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যখন ঘরে যান, তখনো আপনার চেহারা ছিল বিবর্ণ, আর এখন হর্ষোৎফুল্ল! তিনি বললেন, আমি দু'ব্যক্তির মধ্যে আপোষ করিয়ে দিয়েছি, যারা আমর অতি প্রিয়।[৪১]

হযরত (সাঃ) যেহেতু দুনিয়ার সাজ-শয্যা খুব না পছন্দ করতেন, তাই তিনি নিজে সন্তানদেরকে এমন জিনিস দিতেন না এবং অন্যের দেয়াও পছন্দ করতেন না। হযরত আলী একবার হযরত ফাতিমাকে একটা স্বর্ণের হার দেন। হযরত তা জানতে পেরে বললেন, ফাতিমা! তুমি কি মানুষ দ্বারা এমন কথা বলতে চাও যে, রাসূলাল্লাহ্র কন্যা আগুনের হার ব্যবহার করে? এরপর হযরত ফাতিমা হারটি বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে একটা গোলাম কিনেন।

একবার নবীজী কোন এক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছেন। হযরত ফাতিমা তাকে খোশ আমদেদ জানিয়ে দরজায় পর্দা ঝুলান। ইমাম হাসান হোসাইনকে রূপার ২টি কাংকন পরান। কিন্তু নবীজী ঘরে প্রবেশ না করেই ফিরে আসেন। হযরত ফাতিমা হযরতের না আসার কারণ বুঝতে পেরে পর্দা খুলে ফেলেন এবং পুত্রদ্বয়ের কাংকন দুটিও খুলে ফেলেন। পুত্রদ্বয় কাঁদতে কাঁদতে হযরতের নিকট গমন করেন। তিনি বললেন, যদিও এরা আমার আহলে বাইত, কিন্তু আমি চাই না যে, এরা সৌন্দর্যে ভূষিত হোক। তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, রূপার হারের এবং পরিবর্তে ফাতিমার জন্য আছীব এর হার নোকরাই কাংকনের পরিবর্তে হাতির দাতের দুজোড়া কাংকন এনে দাও।[৪২]

আবূ জেহেলের ভাই ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরা হযরত আলীকে (রাঃ) বলেন, তুমি আবূ জেহেলের কন্যা গোরাকে বিয়ে কর। হযরত (সাঃ)

হযরত আলীর ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে পেরে তাঁর কাছে এটা অসহ্য লাগল (হযরত ফাতিমা নিজেই আঁ-হযরতকে জানান)। নবীজী মসজিদে গমন করেন এবং মিম্বারে দাঁড়িয়ে তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে নিম্নোক্ত খোতবা পাঠ করেন ঃ

انَّ بَنِيْ هِشَامَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ اسْتَاذَنُوْنِيْ اَنْ يُّنْكِحُوْا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِب فَلاَ اذْنَ ثُمَّ لاَاذْنَ الاَّ اَنْ يُرِيْدَ ابْنُ اَبِيْ طَالِبَ اَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِيْ وَيُنْكِحُ ابْنَتَهُمْ فَانَّمَا هِيَ مُضْغَةٌ مِنِّيْ يُرِيْبُنِيْ مَارَابَهَا وَيُؤْذِيْنِيْ مَااذَاهَا.

–বনু হিশাম আলী ইবনে আবূ তালেবের কাছে তাদের কন্যা বিয়ে দেয়ার জন্য আমার অনুমতি চাচ্ছে, কিন্তু আমি অনুমতি দেবো না, কখনো না। অবশ্য আবূ তালেব-পুত্র আমার কন্যাকে তালাক দিয়ে তাদের কন্যাকে বিয়ে করতে পারে। ফাতিমা আমার দেহের একটা অংশ বিশেষ। তাকে যে কষ্ট দেয়, সে যেন আমাকে কষ্ট দেয়। তাকে যে দুঃখ দেবে, সে আমাকেও দুঃখ দেবে।[৪৩]

তিনি আরও বলেন ঃ

وَانِّيْ لَسْتُ اُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ اُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ.

–আমি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করতে চাই না। কিন্তু খোদার কসম, আল্লাহ্‌র রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহ্‌র দুশমনের কন্যা একস্থানে মিলিত হতে পারে।[৪৪]

নবীজীর এ খোতবা এতটা ক্রিয়া করে যে, হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতিমার জীবদ্দশায় আর কোন বিয়ে করেননি।[৪৫]

হযরত (সাঃ) হযরত আলী, হযরত ফাতেমা এবং হযরত ইমাম হাসান-হোসাইনকে বলেন, যাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ, তাদের সাথে আমারও যুদ্ধ আর যাদের সাথে তোমার সন্ধি, তাদের সাথে আমারও সন্ধি।[৪৬] অর্থাৎ

যাদের ব্যাপারে তোমরা অসন্তুষ্ট হবে, তাদের ব্যাপারে আমিও অসন্তুষ্ট হবো আর যাদের ব্যাপারে তোমরা খুশি হবে, আমিও তাদের ব্যাপারে খুশি হবো।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হযরত ফাতেমার সাথে যখন আমার বিয়ে হয়, তখন আমাদের জন্য কোন বিছানা পর্যন্ত ছিল না। ঘরে ছিল কেবল এক খানা চামড়া! রাতে তার ওপর ঘুমাতাম আর তা দিয়ে মশক এর কাজ চালাতাম। আমার ঘরে তখন কোন খাদেম ছিল না।[৪৭] হযরত আলী (রাঃ) একবার নবীজীর খেদমতে আরয করেন, আপনি আমাদের দুজনের মধ্যে কাকে বেশি ভালোবাসেন? তিনি বললেন, আমার কাছে ফাতেমা তোমার চেয়ে বেশি প্রিয়। আর ফাতিমার চেয়ে তুমি বেশি প্রিয়।[৪৮]

নবীজীর কানে কানে কথা বলা

প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে হযরত ফাতিমার ২৯ বৎসর বয়সে রাসূলে খোদার স্নেহ ছায়া বিদায় নেয়। হযরত (সাঃ) যেহেতু হযরত ফাতিমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালে হযরত ফাতেমা অত্যন্ত ব্যথিত হন। হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, হযরতের ওফাতের আগে আমি তার পাশে বসা ছিলাম। এ সময় হযরত ফাতিমা আসেন। তার চলার ভঙ্গি হযরতের চলার ভঙ্গির সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। হযরত মারহাবা ইয়া ইবনেতি- কন্যা খোশ আমদেদ বলে তাকে ডান দিকে বা বাম দিকে বসান। এরপর তার কানে কিছু বললে হাসেন। আমি বড় অবাক হলাম এবং হযরত ফাতিমাকে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না। ইতিপূর্বে হাসি-কান্না, হর্ষ বিষাদ একসঙ্গে দেখিনি। হযরত ফাতিমাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি কিছুতেই আমার পিতার গোপন তথ্য ফাঁস করবোনা। রাসূলে খোদার ইন্তিকালের পর আমি হযরত ফাতেমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করি যে, সেদিন হাসি-কান্নার কারণ কি ছিল? তিনি বললেন, যেহেতু হযরত (সাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাই আমি বলছি। প্রথমবার তিনি বলেছিলেন যে, হযরত জিবরাইল (আঃ) ইতিপূর্বে বৎসরে একবার কুরআন শরীফ শুনাতেন, এ বছর তিনি দু'বার শুনিয়েছেন। এ থেকে মনে হয়, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমার আহলে বায়তের মধ্যে সর্ব প্রথম তুমি আমার সাথে মিলিত হবে।

এতে আমি দুঃখিত হই এবং কাঁদতে থাকি। এরপর তিনি বললেন, তুমি দুনিয়ার নারীদের সর্দার-এটা কি তোমার পছন্দ নয়, এটা শুনে আমি হাসতে থাকি।

ওফাতের পূর্বে হযরত (সাঃ) চেতনা হারিয়ে ফেলেন। হযরত ফাতিমা বললেন وَاكَرْبَ اَبَاهُ -হায়, আমার পিতার অস্থিরতা! সম্বিত ফিরে এলে হযরত বলেন, আজকের পর তোমার পিতাকে আর অস্থির হতে হবে না।[৪৯]

নবীজী ওফাতের পর তার পুণ্যবতী কন্যাদের মধ্যে কেবল হযরত ফাতিমাই বেঁচে ছিলেন। সত্য কথা এই যে, হযরতের ইন্তিকালে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। জীবন চরিত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি নবীজীর ইন্তিকালের পর অত্যন্ত ব্যথিত থাকতেন। তাই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোতে কেউ তাঁকে হাসতে দেখেনি।[৫০]

নবীজীর দাফন-কাফন শেষে ছাহাবায়ে কেরাম তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আল্লাহর রাসূলকে দাফন করে এসেছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কয়েক মন মাটির নিচে নবীজীর দেহকে চাপা দিতে তোমাদের মন কিভাবে বরদাশত করেছে?[৫১] তিনি নবীজীর কবরে গমন করেন, সেখানে ক্রন্দন করেন, কবর থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে চোখে-মুখে মাখেন এবং এই কবিতাটি পাঠ করেন,

مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ اَحْمَدَ – اَنْ لَا يَشُمَّ مُدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا

صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبُ لَوْ اَنَّهَا – صُبَّتْ عَلَى الْاَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا

–যে ব্যক্তি আঁ-হযরতের মাথার মুবারকের মাটির ঘ্রাণ নেয়, তার জন্য আর কি চাই? তার জন্য সারা জীবন আর কোন খোশবুর ঘ্রাণ নেওয়ার দরকার নেই।

আমার উপর যেসব বিপদাপদ আপতিত হয়েছে, তা যদি দিনের উপর আপতিত হতো তবে দিনগুলো সব রাত হয়ে যেতো।[৫২] মহিলা সাহাবী

কবিতাগুলো হযরত আলীর রচনা। রাসূলে খোদার মাজার মুবারকে হাযির হয়ে ফাতিমা এগুলো আবৃত্তি করেন। রাসূলে খোদার শোক গাথায় আর যে কবিতাগুলো তাঁর রচনা বলে কথিত, তা হচ্ছে এই ঃ

اِغْبَرَّ اٰفَاقُ السَّمَاءِ وَكُوِّرَتْ.

شَمْسُ النَّهَارِ وَاُظْلِمَ اْلعَصْرَان

وَالعَصْرُ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ كَئِيْبَةٌ.

اَسَفًا عَلَيْه كَثِيْرَةَ الاَحْزَان.

فَلْيَبْكه شَرْقُ الْبِلَادِ وَغَرْبُهَا.

وَلْتَبكه مُضَرٌ وَكُلُّ يَمَان.

وَلْيَبْكه الطُّوْرُ الاَتُمُ وَجُوْدُه.

وَالْبَيْتُ ذُوْ الاَوْتَارِ وَالاَرْكَانِ.

يَاخَاتَمَ الرُّسُلِ الْمُبَارَكُ صِنْوٌ.

صَلّى عَلَيْكَ مُنْزِلُ الْقُرْاٰن.

—আসমান ধূলিধূসরিত হয়েছে,
দিবাকর হয়েছে দলিত-মথিত,
আর যমানা হয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন।
নবীর (সা:) পর যমীন কেবল দুঃখ-মলিনই হয়নি,
বরং দুঃখ ভারে বিদীর্ণও হয়েছে।
ক্রন্দন করে তাঁর জন্য প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অধিকারী;
ক্রন্দন করে মুযার ও ইয়ামানবাসী।

বড় বড় পর্বত আর আলীশান মহল ভেঙ্গে পড়েছে।
হে শেষ নবী! আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহমত নাযিল করুন।[৫৩]

প্রিয় নবীর ইন্তিকালের পর মীরাস সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে। হযরত ফাতিমা হযরত আবূবকর (রাঃ) কে বললেন, মীরাস যা কিছু হয়, বণ্টন করে দিন। তিনি জবাবে বলেন, আমি নবীজীর স্বজনকে আমার নিজের স্বজনের চেয়ে বেশি ভালোবাসি। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন, নবীরা যা কিছু সম্পদ রেখে যান, তা সবই ছদকা হয়। তাতে মীরাসের বিধান কার্যকর হয় না। সুতরাং আমি কি করে বণ্টন করতে পারি? এতে হযরত ফাতিমা অনেক ব্যথিত-বিচলিত হন।[৫৪]

ছহীহ বোখারীতে উল্লেখ আছে যে, এসব কথায় হযরত ফাতিমা অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি হযরত আবূবকর (রাঃ) এর প্রতি এতটা অসন্তুষ্ট হন যে, বাকি জীবন তার সাথে কোন কথাই বলেন নি।[৫৫] কিন্তু তবকাত গ্রন্থের এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি অসুস্থ হলে হযরত আবূবকর (রাঃ) তাকে দেখতে আসেন এবং ভেতরে যাওয়ার জন্য তার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত আলী (রাঃ) স্ত্রী ফাতিমাকে বলেন, আবূবকর এসেছেন এবং ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চান। হযরত ফাতিমা বললেন, তাতো আপনিই বুঝতে পারেন। এরপর তিনি ভেতরে আসেন এবং মন-মেজাজ কেমন আছে, জানতে চান। এতে তিনি খুশি হন।[৫৬] তার অন্তরে কোন কালিমা আর বাকি নেই। এ থেকে জানা যায় যে, তিনি আগে হযরত আবূ বকরের (রাঃ) প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, পরে তার এ অসন্তুষ্টি দূর হয়ে যায়।

হযরত ফাতিমার আরও তিন বোন ছিলেন, তারাও যৌবনেই বিদায় নেন। নবীজীর ইন্তিকালের আট মাস পর, কারো কারো মতে ৭০ দিন পর হযরত ফাতিমাও ইন্তিকাল করেন।[৫৭] আবার কেউ কেউ বলেন, দু'মাস বা চার মাস পর তিনি ইন্তিকাল করেন। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, হযরতের ওফাতের ৬ মাস পরে ১১ হিজরীর ৩য় রমযানে ২৯ বছর বয়সে তিনি ইন্তি কাল করেন।[৫৮] এমনিভাবে দুনিয়াতেও হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমার আহলে বায়তের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে।[৫৯] নবুওয়াতের ৫ বছর আগে তার জন্ম হয়েছে- একথা মেনে নিলে তবেই তার বয়স ২৯ বছর স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু তার জন্ম

সাল যদি নবুওয়াতের এক বৎসর পর ধরা হয় তাহলে এ বয়স হয় না। কিন্তু জীবনী লেখকগণ যেহেতু তার বয়স ২৯ বছর স্বীকার করেছেন, তাই মানতেই হয় যে, তার জন্ম হয়েছে নবুওয়াতের ৫ বছর পূর্বে। ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর মতে ১১ হিজরীর ৩রা রমযান হযরত ফাতেমার ইন্তিকাল হয়েছে। হযরত আব্বাস জানাযার নামায পড়ান এবং হযরত আলী, হযরত ফযল ও হযরত আব্বাস কবরে নামেন।[৬০]

তাঁর মৃত্যু-পীড়া সম্পর্কে ইতিহাসে কিছুই উল্লেখ নেই। অবশ্য এটা জানা যায় যে, কোন কঠিন পীড়ায় তাঁর ইন্তিকাল হয়নি। ফলে মৃত্যুর আগে তাকে অনেক দিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়নি। হযরত উম্মে সালমা বলেন, হযরত ফাতিমার ওফাতের সময় হযরত আলী (রাঃ) ঘরে ছিলেন না। হযরত ফাতিমা আমাকে ডেকে পানির ব্যবস্থা করার জন্য বলেন, তিনি বলেন আমি গোসল করবো। আমি পানির ব্যবস্থা করে কাপড় বের করে তাকে দেই। তিনি ভালোরূপে গোসল করে কাপড় পরলেন। এরপর বললেন, বিছানা পেতে দিন, আমি শোবো। আমি বিছানা পেতে দেই। তিনি কেবলামুখী হয়ে শুলেন। আমাকে বললে বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি গোসল করেছি, তাই পুনরায় গোসল করার দরকার নেই। আমার দেহ খোলারও আর কোন প্রয়োজন নেই। এরপরই তিনি ইন্তিকাল করেন। হযরত আলী (রাঃ) ঘরে ফিরে এলে আমি তাকে এ ঘটনা জানালাম। তিনি তাকে পুনরায় গোসল না করিয়ে দাফন করেন।[৬১] আল-এছাবা গ্রন্থে উম্মে রাফে' থেকেও এ রেওয়ায়াতটি বর্ণিত হয়েছে।[৬২] তার জানাযায় খুব কম লোকেরই অংশ গ্রহণের সুযোগ হয়েছে। এর কারণ এই যে, রাতের বেলা তার ইন্তিকাল হয়েছে আর হযরত আলী (রাঃ) তার ওছিয়ত অনুযায়ী রাতের বেলাই তাকে দাফন করেন।[৬৩] তবকাত গ্রন্থে এ রেওয়ায়াতটি বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

নারীকূল শিরোমনী হযরত ফাতিমার মেজাজে চরম পর্যায়ে লাজ-লজ্জা ছিল। ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি হযরত আসমা ইবনেতে আমীসকে বলেন, নারীর মৃত দেহ খোলা অবস্থায় কবরস্তানে নিয়ে যাওয়া আমার

পছন্দ নয়। এতে পর্দাহীনতা হয়। নারী-পুরুষের মৃত দেহের মধ্যে কোন পার্থক্যও থাকে না। নারীর মৃত দেহ খোলা অবস্থায় নিয়ে যায়, পুরুষরা এটা ঠিক করে না। আমার কাছে এটা একেবার না পছন্দ । হযরত আসমা ইবনেতে আমীস বললেন, হে রাসূলের কন্যা! আমি হাবশায় একটা চমৎকার ব্যবস্থা দেখে এসেছি। আপনি হুকুম দিলে তা পেশ করতে পারি। এই বলে তিনি কয়েকটি খেজুরের ডাল চেয়ে নেন। তার উপর কাপড় টানিয়ে দেন। এর ফলে পর্দার ব্যবস্থা হয়। এ উপায়টি হযরত ফাতিমার বেশ পছন্দ হয় এবং তিনি খুব খুশি হন।[৬৪] পর্দায় ঢাকা অবস্থায় তার মৃত দেহ কবর পর্যন্ত নেওয়া হয়। ইসলামে তিনি হচ্ছেন প্রথম মহিলা, এভাবে পর্দায় ঢেকে যার লাশ কবরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরে হযরত যয়নব ইবনেতে জাহাশ এর মৃত দেহও এভাবে কবরে নেওয়া হয়।[৬৫]

হযরত আলী (রা:) দাফন-কাফন শেষে ঘরে এলে তিন তখন অত্যন্ত বিষণ্ন ছিলেন। শোক-দুঃখের আতিশয্যে তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

আমি দেখছি, আমার মধ্যে দুনিয়ার অনেক রোগ ঢুকেছে।
আর দুনিয়াবাসী যতক্ষণ দুনিয়ায় আছে, সে তো রুগীই।
একই স্থানে মিলিত হওয়ার
পর বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ জরুরী।
বিচ্ছেদের বাইরের যে সময়, তাতো খুবই স্বল্প।
রাসূলে খোদার পরে ফাতিমার বিচ্ছেদ
এ কথারই প্রমাণ যে,
বন্ধু চিরদিন থাকে না।[৬৬]

হযরত আলী (রা:) প্রতিদিন হযরত ফাতিমার কবরে যেতেন। তিনি হযরত ফাতিমার কথা স্মরণ করে কাঁদতেন আর এ কবিতা আবৃত্তি করতেন ঃ

আমার কি হয়েছে যে, সালাম জানাতে কবরে আসি!
কিন্তু বন্ধুর কবর তো আমার জিজ্ঞাসার কোন জবাব দেয় না।
হে কবর, কি হয়েছে তোর, ডাকে যে তুই দিসনা সাড়া?
তুই কি বন্ধুর ভালবাসায় বিরক্ত হয়েছিস?

কবর

ঐতিহাসিক ওয়াকেদী বলেন, আমি আব্দুর রহমান ইবনে আবূ মাওলাকে জিজ্ঞেস করি, অধিকাংশ লোক বলে যে, জান্নাতুল বাকী'তে হযরত ফাতিমার করব রয়েছে। আপনার মত কি? জবাবে তিনি বলেন, জান্নাতুল বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয়নি, দারে আকীল-হযরত আকীলের গৃহের এক কোণে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। তাঁর কবর এবং রাস্তার মধ্যে প্রায় সাত হাত দূরত্ব রয়েছে।

১. আল-এছাবাহ পৃষ্ঠা ৩৭৮, ২. আদ দুররাতুল বাইদা, ৩. তবকাত পৃষ্ঠা ১১, ৪. আল এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭১, ৫. আল-এছাবাহ পৃষ্ঠা ৭২৫, ৬. ঐ, ৭. তবকাত পৃষ্ঠা ১১১, ৮. আল এছাবাহ পৃষ্ঠা ৭২৫, ৯. উসুদল গাবাহ পৃষ্ঠা ৭৫২, আল এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭১, ১০. উসুদল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২০, ১১. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা৭৭১, ১২. তবকাত পৃষ্ঠা ১১, ১৩.উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা, ১৪. তবকাত পৃষ্ঠা ১২, ১৫. তবকাত পৃষ্ঠা ১৩, উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২ আল এছাবাহ পৃষ্ঠা ৭২৭, ১৬. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭১, ১৭. তবকাত পৃষ্ঠা ১৪, ১৬, ১৮. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭১, ১৯. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২০, ২০. যুরকানী পৃষ্ঠা ২৩৩, ২১. সূরা আহযাব আয়াত ৩৩, ২২. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭১-৭৭২, ২৩. তিরমিযী, কিতাবুল মানাকেব, ২৪. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭২, ২৫. উসুদুল গাবা পৃষ্ঠা ৫২৩. ২৬. ঐ পৃষ্ঠা ২০, ২৭. সুনানে আবূ দাউদ, ২৮. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২২ আল এছাবাহ, ২৯. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭১, ৩০. ঐ পৃষ্ঠা ৭৭২, ৩১. ঐ আবূ দাউদ, হরত আয়েশার বর্ণনায়, ৩২. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭২, ৩৩. আল-এছাবাহ পৃষ্ঠা ৭২৬, ৩৪. সহীহ বোখারী পৃষ্ঠা ২৩২, ৩৫. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২০, ৩৬. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭১, ৩৭. তবকাত পৃষ্ঠা ১৪, আল-এছাবাহ পৃষ্ঠা ৭২৬, ৩৮. তবকাত পৃষ্ঠা ১৬ আল-এছাবাহ পৃষ্ঠা ৭২৯-৭৩০, ৩৯. তবকাত পৃষ্ঠা ১৬, ৪০, ৪১. তবকতা পৃষ্ঠা ১৬, আল এছাবাহ পৃষ্ঠা ৭৩০, ৪২. আবূ দাউদ ও নাসাঈ, ৪৩. সহীহ বোখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৮৭, উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২১, ৪৪. সহীহ বোখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৪৩৮, ৪৫. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭১, ৪৬. আল এছাবাহ পৃষ্ঠা ৭৩৮, ৪৭. তবকাত পৃষ্ঠা ১৩ উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২২, ৪৯. তবকাত পৃষ্ঠা ১৭ উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২২ আল-এছাবাহ পৃষ্ঠা ৭২৭-৭২৮, ৫০. আদ দুররুল মানসূর পৃষ্ঠা ৩৫৯ উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২৪, ৫১. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২০, ৫২. আদুরুল মানসূর পৃষ্ঠা ৩৬০, ৫৩. আদদুররুল মানসূর পৃষ্ঠা ৩৬০, ৫৪. তবকাত পৃষ্ঠা ১৮, ৫৫. সহীহ বোখারী পৃষ্ঠা ৫২৬ ও ৬০৯, ৫৬. তবকাত পৃষ্ঠা ১৭. ৫৭. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭৩, ৫৮. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭৩ তবকাত পৃষ্ঠা ১৮, ৫৯. তবকাত পৃষ্ঠা ১৮ উসুদল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২৪, ৬০. তবকাত পৃষ্ঠা ১৮, আল-এছাবাহ পৃষ্ঠা ৭৩১ আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭৩. ৬১. তবকাত পৃষ্ঠা ১৭-১৮, ৬২. পৃষ্ঠা ৭২৯, ৬৩. উসুদল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২৪, ৬৪. উসুদল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২৪. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭৩, ৬৫. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭৩. আদ-দুররুল মানসূর পৃষ্ঠা ৩৬০।

আদর্শ নারী

১৭

হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)

হযরত আসমা ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর কন্যা। তার মাতা ফাতীলা ছিলেন কোরইশের প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত সর্দার আবদুল উযযার কন্যা। আবদুল্লাহ ইবনে আবূ বকর ছিলেন তার আপন ভাই[১] এবং হযরত আয়েশা ছিলেন তার সৎ বোন[২] এবং বয়সে তার চেয়ে ছোট।[৩] তার লকব বা উপাধী ছিল যাতনু নেতা কাইন বা দুই-নোতকওয়ালী। এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, মক্কার কাফেররা নবীজীকে সব রকম অত্যাচার-নির্যাতন এমন কি হত্যার করার জন্য উদ্যত হলে তিনি মক্কা ছেড়ে মদীনা হিজরত করার সংকল্প করেন। অবশেষে এক রাতে হযরত (সাঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং মক্কার অদূরে সাওর পর্বতের একটি গুহায় অবস্থান করেন। কাফেররা তাদের সন্ধানে চারিদিকে ছুটাছুটি করে, এমনকি সে গুহার মুখ পর্যন্ত বার বার হাযির হয়। কিন্তু যেহেতু নবুওয়াতের আলোকে দুনিয়াকে আলোকিত করা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, তাই কাফেররা তাঁর কাছে পৌছতে পারেনি। যারা গুহায় আটক অবস্থায় হযরতের সাহায্য সহযোগিতা করেন, হযরত আসমা ছিলেন তাদের একজন। তিনি রাত্রিতে তাঁদের জন্য খাবার নিয়ে যেতেন এবং রাত্রেই ফিরে আসতেন।

হযরত আসমার ভাই আবদুল্লাহ তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি সারাদিন কাফেরদের ইচ্ছা আর পরামর্শ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন এবং রাত্রে নবীজীকে সব জানাতেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর মেষ পালক আমের রাতের বেলা মেষ নিয়ে গুহায় মুখে হাযির হতেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দুধ দিয়ে ফিরে আসতেন। এমনিভাবে মেষের যাতায়াতের ফলে

হযরত আসমা এবং তার ভাই আবদুল্লাহ্ পদচিহ্ন মুছে যেতো। এ কারণে কাফেররা গুহা খুঁজে বের করতে সক্ষম হতো না। নবীজীকে খুঁজে বের করার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে কাফেরা তার সন্ধানদাতাকে একশ উট পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। তৃতীয় রাতে হযরত আসমা খাবার নিয়ে গেলে নবীজী তাকে বলে, আলীকে বলবে তিনটি উট এবং রাস্তা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল একজন লোক নিয়ে কাল রাতে গুহার সামনে উপস্থিত হতো। কথামতো হযরত আলী যথাসময়ে তিনটি উট এবং একজন রাহবর সঙ্গে নিয়ে হাযির হন। হযরত আসমাও দু'তিন দিনের খাবার নিয়ে হাযির হন। নাস্তা এবং পানির মশক বাঁধার জন্য রশি দরকার। কিন্তু এই মুহূর্তে হাতের কাছে কোন রশি নেই। হযরত আসমা নেতাক[৪] বা উড়না খুলে দু'টুকরো করে রশির কাজ সারেন। এক টুকরা দিয়ে নাস্তা আর অপর টুকরা দিয়ে মশকের মুখ বন্ধ করা হয় তখন দরবারে নবুওয়াত থেকে তাকে যাতুন নেতাকাইন[৫] উপাধী দেওয়া হয়। চৌদ্দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এ উপাধী তার নামের সাথে যুক্ত হয়ে আছে। উল্লেখ্য যে, কামীজ-এর উপরে যে রুমাল বা উড়না পরিধান করা হয়, আরবে তাকে নেতাক বলা হতো।

হিজরতের ২৭ বৎসর আগে মক্কা শরীফে তার জন্ম হয়। তখন তার পিতার বয়স ২০ বছরের কিছু বেশি।[৬] নবীজীর ফুফাতো ভাই হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম এর সাথে তার বিয়ে হয়।[৭] হযরত আসমা ছিলেন বড় উঁচু স্তরের মহিলা সাহাবী। মক্কায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নবীজীর হাতে বায়রাতের গৌরব অর্জন করেন। প্রথমে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। ১৭ জনের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮]

হযরত (সা:) এবং হযরত আবূ বকর (রা:) মদীনা মুনাওওয়ারা পৌঁছার পর নিশ্চয়তা ফিরে এলে মহিলাদেরকে নেওয়ার প্রস্তাব হয়। নবীজী যায়েদ ইবনে হারেসা এবং গোলাম আবূ রাফেকে মক্কা প্রেরণ করেন। হযরত আবূ বকরও একজন লোক প্রেরণ করেন। তার পুত্র আবদুল্লাহ্, মাতা এবং দুবোন হযরত আসমা ও হযরত আয়েশাকে নিয়ে মক্কা রওয়ানা হন।[৯] হযরত আসমা কোবা নামক স্থানে পৌঁছলে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের এর জন্ম হয়।[১০]

হযরত আসমা প্রিয় পুত্রকে নবীজীর খেদমতে নিয়ে যান তিনি নবজাতককে কোলে নিয়ে খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দেন এবং তার জন্য দোয়া করেন।[১১] হিজরতের পর ইসলামে এ হচ্ছে প্রথম সন্তানের জন্ম। হযরত আসমার গর্ভে হযরত যুবায়ের এর পাঁচ পুত্র-আবদুল্লাহ্, ওরওয়া, মুন্‌যের, আছেম ও মুহাজের এবং তিন কন্যা খাদীজা, উম্মুল হাসান ও আয়েশা জন্ম গ্রহণ করেন।[১২]

হযরত আসমা ছিলেন অত্যন্ত বিনয় ও নম্র স্বভাবের মহিলা। কষ্ট-ক্লেশ করতে তিনি কোন লজ্জা বোধ করতেন না। স্বামীর অভাব-অনটন, গৃহের দায়িত্ব পালন ইত্যাদি কাহিনী তিনি নিজেই বর্ণনা করেন ঃ

যুবায়ের ইবনুল আওয়াম এর সাথে আমার যখন বিয়ে হয়, তখন তার ধন-দৌলত, খাদেম নকর কিছুই ছিল না। তখন তিনি ছিলেন একেবারেই নিঃস্ব। কেবল একটা ঘোড়া আর একটা উট ছিল। আমিই এর দেখাশুনা করতাম। হযরত (সা:) যুবায়েরকে এক খন্ড খেজুর বাগান দান করেন। এ খেজুর বাগান ছিল মদীনার অদূরে। আমি প্রতিদিন সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের বীচি ঘরে আনতাম, নিজে তা কুটে ঘোড়াকে খাওয়াতাম। বালতি দিয়ে পানি তুলতাম। ঘরের সমস্ত কাজ-কর্ম নিজ হাতে করতাম। যেহেতু আমি ভালো রুটি তৈয়ার করতে পারতাম না, তাই আমি শুধু আটা মলে রাখতাম। আমার ঘরের কাছেই থাকতেন আনসারের স্ত্রীরা। নিষ্ঠা-ভালোবাসায় এ স্ত্রীরা পরের কাজ করে আনন্দ পেতেন। তারা আমাকে রুটি তৈয়ার করে দিতেন। প্রতিদিন আমাকে এসব কষ্ট সইতে হতো। একদিন আমি খেজুর বাগান থেকে খেজুরের বীচি মাথায় করে নিয়ে আসছিলাম। পথিমধ্যে নবীজীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তার সাথে অন্যান্য সাহাবীরাও ছিলেন। তিনি আমাকে উটের পিঠে তুলে নেয়ার জন্য তার উট বসান। কিন্তু লজ্জা আমায় অনুমতি দেয়নি। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, লজ্জার কারণে আমি তার সাথে উটের পিঠে বসছি না, তখন তিনি চলে যান। আমি ঘরে ফিরে স্বামী যুবায়ের-এর নিকট এ কাহিনী বলি। তিনি বললেন, আল্লাহ্ জানেন, তোমার মাথায় করে খেঁজুরের বীচি বয়ে আনা তার সাথে বসার চেয়ে আমার কাছে কঠিন। কিছুদিন পর আমার পিতা হযরত আবূ

বকর (রাঃ) আমার জন্য একজন খাদেম পাঠান। এরফলে ঘোড়ার সেবা থেকে আমি মুক্তি পাই। বিপদ থেকে অনেকাংশে অব্যাহতি লাভ করি।[১৩]

ইসলাম গ্রহণ কালে হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর নকিট প্রায় ১ লক্ষ দিরহাম ছিল। কিন্তু দ্বীনের খাতিরে তিনি সব সম্পাদই নবীজীর সাহায্যে ব্যয় করেন। হিজরতের সময় তার কাছে দেড়-দু' হাজার দিরহামের বেশি ছিল না এ নিয়েই তিনি মক্কা থেকে মদীনা গমন করেন আর সন্তানদেরকে আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে যান। হযরত আসমা পিতাকে বিদায় দিয়ে ঘরে ফিরে আসেন। হযরত আবূ বকর-এর পিতা আবূ কোহাফা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি।

বয়সের ভারে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। দৃষ্টি শক্তিও রহিত। পিতা আবূ কোহাফা ভোরে হযরত আসমার ঘরে আসেন এবং অতি দুঃখের সঙ্গে বলেন, আবূ বকর নিজেও চলে গেছে, টাকা-কড়িও সব নিয়ে গেছে। হযরত আসমা তার মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য একটি থলিতে পাথর ভরে তাকের মধ্যে সে স্থানে রাখেন, যেখানে আবূ বকর টাকা-কড়ি রাখতেন। তিনি আবূ কোহাফাকে বলেন, দাদাজান! আব্বা তো আমাদের জন্য অনেক টাকা কড়ি রেখে গেছেন-এই বলে তিনি তাঁর হাত তাকের মধ্যে রাখেন। আবূ কোহাফা হাতড়িয়ে দেখে মনে করেন, সত্যিই বুঝি টাকা-কড়ি আছে। এমনি করে তার মনে সান্ত্বনা আছে। হযরত আসমা বলেন, আমি কোবল তার সান্ত্বনার জন্য এমনটি করেছি। আসলে ঘরে একটা দানা কড়িও ছিল না।[১৪] হযরত আসমার মাথা ব্যাথা দেখা দিলে তিনি মাথায় হাত রেখে বলতেন, হে খোদা! যদিও আমি অনেক গুনাহগার, কিন্তু তুমি তার চেয়েও বড় ক্ষমাশীল।[১৫] একবার তার ঘাড়ে ব্যথা দেখা দেয়। নবীজী ব্যথার স্থানে হাত রেখে বলেন, আল্লাহ্ তোমার এ কষ্ট দূর করুন।[১৬] দুঃখ দৈন্যের কারণে হযরত আসমা পারিবারিক ব্যাপারে অত্যন্ত হিসেব করে চলতেন। সব কিছুই প্রয়োজন অনুপাতে মেটে-ঝেঁপে ব্যয় করতেন। নবীজী তাকে নিষেধ করে বলেন, মেপে-ঝেঁপে ব্যয় করবে না। এমনটি করলে আল্লাহ্ও তোমাকে তাই দেবেন। নবীজীর কথায় তিনি এ অভ্যাস ত্যাগ করেন।

হযরত আসমা ছিলেন পাকা ঈমানের মুসলিম মহিলা। এ কারণে মুশরেকরা ছিল তার কঠোর শত্রু। একবার তার মাতা কিছু হাদিয়া-তোহফা নিয়ে তাকে দেখতে আসেন। যেহেতু তখনও তিনি ছিলেন মুশরেক, তাই তিনি মাতার হাদিয়া গ্রহণ করেননি, তাকে ঘরে উঠতেও দেননি। হযরত আয়েশার কাছে খবর পাঠান যে, আপনি নবীজীকে জিজ্ঞেস করে নিন, এ ক্ষেত্রে আমি কি করবো আর তার হুকুম কি? নবীজী জানান যে, হাদিয়া গ্রহণ কর এবং তাকে ঘরে মেহমান হিসেবে থাকতে দাও। আল্লাহ্‌র নির্দেশও তাই। কালামুল্লায় বলা হয়েছে:

যারা দ্বীনের ব্যপাারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি আর তোমাদের গৃহ থেকে বিতাড়িতও করেনি, তাদের সাথে সদাচার এবং ইনসাফের আচরণ করতে আল্লাহ বারণ করেন না কারণ যারা ইনসাফের আচরণ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ্‌তো তোমাদেরকে বারণ করেন এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করেছে এবং তোমাদেরকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। আর যারা এদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারাই যালেম।[১৭]

এরপর তিনি হাদিয়া গ্রহণ করেন এবং মাতাকে আপন গৃহে অবস্থানের অনুমতি দেন।[১৮] পরবর্তীকালে অনেক ধন-সম্পদের মালিক হলেও ইসলামের সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের ধারা তিনি ত্যাগ করেননি। তিনি সব সময় মোটা কাপড় পরতেন, শুকনা রুটি খেতেন, ফকীরের ন্যায় জীবন যাপন করতেন। তার সরল-অনাড়ম্ব জীবন যাপনের প্রমাণ হিসেবে একটা ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

তার পুত্র মুনযের ইরাক যুদ্ধে বিজয় লাভ করে গৃহে ফেরার সময় নারীদের জন্য নক্সা করা কিছু চিকন কাপড় নিয়ে আসেন। কাপড় নিয়ে মায়ের খেদমতে হাযির হন। মা তখন বার্ধক্যের কারণ দৃষ্টি শক্তি হারা। তিনি হাত দিয়ে স্পর্শ করে কাপড় সম্পর্কে জানতে পেরে রাগান্বিত হন। এ মিহিন কাপড় পরতে তিনি অস্বীকার করেন। পুত্র মুনযের পরে মোটা কাপড় এনে

দিলে খুশী হয়ে তা গ্রহণ করেন এবং বলেন, পুত্র! আমাকে এমন কাপড় পরাবে।[১৯]

উদারতা-দানশীলতা

তার মধ্যে উদারতা-দানশীলতা ছিল অনেক বেশি। ছেলেদেরকে সর্বদা উপদেশ দিয়ে বলতেন, অন্যের কল্যাণ বিধান, তাদের সাহায্যের জন্যই তোমাদের টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত, জমা করে রাখার জন্য নয়। তোমরা যদি টাকা-পয়সা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের জন্য বয় না করে কার্পণ্য কর, তবে আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে তার দান-অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করবেন। তোমরা যা কিছু ইচ্ছা করবে বা ব্যয় করবে, আসলে তা-ই হবে তোমাদের জন্য উত্তম সম্বল। এ এমন এক সঞ্চয়, যা কখনো কমবে না, তা নষ্ট হওয়ার আশংকাও নেই।[২০] তিনি কোন সময় অসুখে পড়লে দাস-দাসীকে মুক্ত করে দিতেন।[২১] হযরত আয়েশা ইন্তিকালের সময় একখন্ড ভূমি রেখে যান, তা হযরত আসমার ভাগে পড়ে। তিনি তা এক লক্ষ দিরহামে বিক্রি করে সবই আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।[২২] হযরত যুবায়ের-এর মেজায ছিল খুব কড়া। তাই তিনি নবীজীকে জিজ্ঞেস করে নেন যে, স্বামীর অনুমতি না নিয়ে আমি তার মাল ফকীর-মিসকীনকে দিতে পারি কি-না? নবীজী বললেন, হা, দিতে পার।[২৩] একবার তার মাতা মদীনা মুনাওওয়ারা এসে তার কাছে কিছু টাকা দিতে বলেন। তিনি নবীজীকে জিজ্ঞেস করেন, আমার মাতা মুশরেকা। তিনি আমার কাছে টাকা চান। এমতাবস্থায় আমি তাকে সাহায্য করতে পারি কি? নবীজী বললেন, হা, তিনিতো তোমার মা।[২৪] অর্থাৎ তুমি তার সাহায্য করতে পার।

সাহস ও চরিত্র

হযরত আসমা ছিলেন সুন্দর চরিত্রের মূর্ত প্রতীক। নিষ্ঠা-আন্তরিকতা ছিল তার স্বভাব ধর্ম। আপনজনদের কল্যাণ চিন্তায় তিনি সদা মগ্ন থাকতেন। একবার হযরত (সাঃ) সূর্য গ্রহণের নামায পড়াচ্ছিলেন। তিনি নামায অনেক দীর্ঘায়িত করেন। হযরত আসমা ঘাবড়ে যান। তিনি ক্লান্ত হয়ে এদিক-ওদিক দেখেন। তার পাশে আরও দু'জন মহিলা ছিলেন। একজন মোটা-

সোটা, অপরজন হেংলা-পাতলা ও দুর্বল। এরা দাঁড়িয়ে আছে দেখে তিনি সাহস পান। তিনি মত পরিবর্তন করে বলেন, আমারতো এদের চেয়ে বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকা উচিৎ।[২৫] নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। নামায কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বেহুশ হয়ে গেলে মাথায় পানি দিতে হয়।[২৬]

গুণ-বৈশিষ্ট্য

অনেকেই হযরত আসমার ভক্ত ছিলেন এবং একান্ত ভক্তি সহকারে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন। তাঁর পবিত্রতা ও মহত্বের ব্যাপক খ্যাতি ছিল। অনেকেই তাঁর কাছে দোয়ার জন্য আসতেন। বিপদের সময় খাছভাবে দোয়ার জন্য আসতেন। কোন নারীর জ্বর হলেও তার কাছে দোয়ার জন্য আসতো। তিনি মহিলার বুকে পনি ছিটিয়ে দিয়ে বলতেন, নবীজী বলেছেন, জ্বর হচ্ছে জাহান্নামের আগুনের তাপ। পানি দিয়ে তা ঠান্ডা করবে।[২৭] পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি নবীজীর জুব্বা-যা হযরত আয়েশা ইন্তিকালের সময় হযরত আসমাকে দিয়ে যান-ধুয়ে পানি পান করাতে।[২৮] তিনি কয়েকবার হজ্ব করেন। প্রথমবার নবীজীর সঙ্গে হজ্ব করেন[২৯] নবীজী থেকে তিনি প্রায় ৫৬ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব হাদীস বুখারী-মুসলিমে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যে সব রাবী তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো,

আবদুল্লাহ, ওরওয়া, ফাতিমা ইবনেতে মুনযের, ইবনে যুবায়ের, ইবনে আব্বাস, ইবনে আবী মুলাইকা, ওয়াহাব ইবনে কাইসান, মুসলেম মুয়াররী প্রমুখ। তিনি ছিলেন সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারীণী। তার বিশ্বাস ছিল দৃঢ়, অন্তর ছিল বলিষ্ঠ, ধৈর্য ছিল অটুট আর ছবর ছিল অঢেল।[৩০]

তালাক

হযরত যুবায়ের কর্তৃক হযরত আসমাকে তালাক দেয়ার ব্যাপারটি সব গ্রন্থকারই সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তালাকের কারণ কেউই উল্লেখ করেননি। ইবনুল আসীর বলেন, তালাকের দুটি কারণ ছিল। এক. হযরত আসমা খুব বয়স্কা ছিলেন, বয়সের কারণে তিনি দৃষ্টি শক্তিও হারান।[৩১] এ

কারণে হযরত যুবায়ের তাকে বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হন।[৩২] দুই. উভয়ের সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হওয়ার ফলে তালাক হয়েছে। আমাদের মতে প্রথম কারণটি গ্রহণী যোগ্য নয় এজন্য যে, তখন পর্যন্ত ইসলামের নৈতিক শিক্ষার ভিত এতটা দুর্বল হয়নি যে, হযরত যুবায়ের-এর মতো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ অপরাধে স্ত্রীকে তালাক দেবেন যে, সে বৃদ্ধা হয়ে গেছে। অন্য কারণ আছে বিধায় আন্দাজ-অনুমানও এটা মেনে নিতে অক্ষম। অবশ্য দ্বিতীয় কারণটি বুঝে ধরে এবং এটা হওয়া সম্ভবও। কারণ, হযরত যুবায়ের এর মেযাজ ছিল কঠোর এবং তিনি বাড়াবাড়ি করতেন এটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পারস্পরিক বিরোধের ফলে তিক্ততা দেখা দিতে পারে। শেষ পর্যন্ত যা তালাকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রেওয়ায়াত এবং দেরায়াত উভয় অবস্থায়ই প্রথম কারণেই তুলনায় দ্বিতীয় কারণ অধিক যুক্তি যুক্ত মনে হয়। উপরন্তু ইবনুল আসীর-এর আর একটি বর্ণনা থেকেও আমাদের মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, একবার কোন এক ব্যাপারে হযরত যুবায়ের হযরত আসমার উপর ক্রুদ্ধ হন। এমনকি মারপিট পর্যন্ত গড়ায়। হযরত আসমা পুত্র আবদুল্লাহ্‌র সাহায্য চান হযরত যুবায়ের পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে আসতে দেখে বলেন, তুমি এখানে এলে তোমার মাকে তালাক দেব। হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, আপনি আমার মাকে কসমের লক্ষ্যবস্তু করেছেন। এই বলে তিনি যান এবং পিতার হাত থেকে মাতাকে উদ্ধার করেন।[৩৩] যাই হোক, তালাকের পর তিনি পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র কাছে চলে আসেন এবং সেখানেই থাকেন।[৩৪] আব্দুল্লাহর মতো অনুগত পুত্র পাওয়াও কষ্টকর। তিনি বৃদ্ধা মাতার আনুগত্য করতেন এবং তার সন্তুষ্টিকে সমস্ত লক্ষ্যের চাবিকাঠি মনে করতেন।

বীরত্ব, নৈতিক দৃঢ়তা এবং ধৈর্য-সহ্য

আরব ভূমির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেখানকার শিশুরা উদার এবং দানশীল হয়ে থাকে, তেমনি বীরত্ব আর সাহসিকতাও তাদের স্বভাবজাত ধর্ম। দানশীলতায় হযরত আসমার যেমন খ্যাতি ছিল, তেমনি বীরত্বের জন্যও তিনি ছিলেন মশহুর। সাঈদ ইবনুল আছ এর শাসনকালে মদীনায় যখন ফেতনা-ফাসাদ-বিপর্যয় দেখা দেয়, শহরে অশান্তি বিরাজ করে, চারিদিকে

চুরি-ডাকাতি শুরু হয়, হযরত আসমা তখন শিয়রে খঞ্জর নিয়ে ঘুমাতেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করে, আপনি কেন এমন করেন? জবাবে তিনি বলেন, কোন চোর-ডাকাত এসে আমার উপর হামলা করলে আমি তার ভূড়ি কেটে ফেলবো।[৩৫]

তার পুত্র আবদুল্লাহ্ পরিণত বয়সে হিজরী ৬৬ সালে আরবীয় ইরাকের শাসনকর্তা হন। এটা ছিল এমন সময়, যখন উমাইয়্যা শাসনকর্তা ইয়াযীদ ইসলামে পাপ-অনাচার বিস্তার করা শুরু করে, চারিদিকে বিপর্যয়-অরাজকতা দেখা দেয়। হাজার হাজার লোক এই বিভ্রান্ত ইয়াযীদের হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইয়াযীদের হাতে বায়আত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। মক্কাকে কেন্দ্র করে তিনি সেখান থেকে খেলাফতের আওয়ায তোলেন। যেহেতু সকলেই তাঁর বীরত্ব, মহত্ব, সত্যবাদীতা ও সহজ-সরল জীবন ধারার কথা স্বীকার করতো, তাই দলে দলে লোকেরা তার খেলাফতের দাবিতে সাড়া দিয়ে তার প্রতি সমর্থন জানাতে থাকে।

পরবর্তীকালে আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান উমাইয়্যা সাম্রাজ্যের শাসন-কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। হাজ্জাজ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের-এর সাথে লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং হিজরী ৭২ সালের পয়লা জিলহজ্ব মক্কা অবরোধ করে। মক্কায় রসদ সামগ্রী প্রেরণ বন্ধ করে দেয়। উভয় বাহিনীর মধ্যে দীর্ঘ ৬ মাস ধরে লড়াই চলতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবরোধের ফলে কাহিল হয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এর সমর্থকদের অনেকেই পলায়ন করতে বাধ্য হয়। মাত্র গুটি কতেক লোক তার সমর্থক থাকে। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ্ মাতা আসমার খেদমতে হাযির হয়ে আরয করেন ঃ

আম্মাজান! ওফাদারদের বে-ওফায়ী আর অবশিষ্টদের অধৈর্যের ফলে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। কি করি, কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। আপনার অনুমতি পেলে আনুগত্য মেনে নেবো। কারণ, আনুগত্য স্বীকার করে নিলে হাজ্জাজ এবং তার সমর্থকদের কাছে যা কিছু দাবি করবো, সবই তারা মেনে নিতে পারে।

জবাবে মাতা হযরত আসমা বলেন, প্রিয় পুত্র! তুমি ভালো জান। তুমি মনে কর যে, সত্য ও ন্যায়ের জন্য লড়ছ, তাহলে তোমাকে অটল-অবিচল থাকতে হবে। পুরুষের মতো লড়ে যাও, প্রাণের ভয়ে কোন অবমাননা মেনে নেবে না। সম্মানের সাথে তরবারীর আঘাত খাওয়া অপমানের জীবনের চেয়ে অনেক উত্তম। তুমি শাহাদাত বরণ করলে আমি আনন্দিত হবো। আর তুমি নশ্বর দুনিয়ার লোভী প্রমাণিত হলে তোমার চেয়ে খারাপ আর কে হতে পারে? এমন লোক নিজেও খারাপ হয়, আর অপরকেও ধ্বংস ও জিল্লতীর চরমে নিয়ে ছাড়ে। তুমি যদি মনে কর যে, তুমি একা, আনুগত্য ছাড়া আর কোন উপায় নেই; এটা শরীফ লোকদের কাজ নয়। তুমি কতকাল বেঁচে থাকবে? একদিন তো মরতেই হবে। তাই তোমার জন্য উত্তম হচ্ছে সুনাম রেখে মরা। এতে আমি আনন্দিত হবো।

মাতার সোনালী উপদেশ শুনে হযরত আবদুল্লাহ্ বললেন, আমর আশংকা হচ্ছে সিরীয়রা মৃত্যুর পর আমাকে নানা প্রকার শাস্তি দেবে।

হযরত আসমা জাবাবে বলেন ঃ

পুত্র! তুমি যে আশংকা প্রকাশ করছ, তা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু বকরী জবাই করার পর তার খাল ছিলে ফেলা হোক, বা তাকে দিয়ে কিমা করা হোক, তাতে বকরীর কোন কষ্ট হয় না।

অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ প্রিয় মাতার হাতে চুমু খেয়ে বলেন, আসলে আমিও তাই মনে করি। আমি সত্যের জন্য দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করি। আমি নিছক দ্বীনের স্বার্থে এ কাজ করছি। আজ আমি লড়াই করে অবশ্যই শাহাদাত লাভ করবো। আপনি কোন দুঃখ, কোন অনুতাপ করবেন না। মা! প্রিয় মা আমার! আজ পর্যন্ত তোমার পুত্র কোন পাপ কাজ করেনি। শরীয়তের বিধান জারীর ক্ষেত্রে ইচ্ছা করে কোন ভুলও করেনি। শাসনকর্তাদের যুলুম-নির্যাতনে আনন্দিতও হয়নি।

অতঃপর আকাশের দিকে মুখ তুলে বলেন, খোদা! তুমি জান, আমি মাকে যা কিছু বলেছি, তা সবই বলেছি তার সান্ত্বনার জন্য, যাতে তিনি অবস্থা দেখে দুঃখ না পান।

হযরত আসমা আরো বলেন, প্রিয় পুত্র! আমি আশা করি, তোমার ক্ষেত্রে আমার ধৈর্য হবে এক নযীরবিহীন ধৈর্য। তুমি আমার সামনে শহীদ হলে তা হবে আমার মুক্তির কারণ, আর তুমি বিজয়ী হলে তা হবে আমার জন্য আনন্দ ও শোকর আদায়ের কারণ। এখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হও এবং পরিণাম কি হয় দেখ।

অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ মায়ের নিকট দোয়া চেয়ে লৌহবর্ম পরিধান করে শেষ বারের মতো মায়ের সাথে দেখা করতে আসেন। মাতা হযরত আসমা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্‌কে বিদায় দিতে গিয়ে তার সাথে কোলাকুলি করার সময় হাতে লৌহবর্ম অনুভব করে বললেন, প্রাণ প্রিয় পুত্র আবদুল্লাহ্! যারা শাহাদাতের জন্য আকাংখী, তারা লৌহবর্ম পরিধান করে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি আপনার মন জয় করার জন্য লৌহবর্ম পরিধান করেছি মাত্র।

মাতা বললেন, লৌহবর্ম দ্বারা আমার মনকে তুষ্ট করা যাবে না। বুকে সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। হযরত আব্দুল্লাহ্ তাই করলেন। একটি কবিতা[৩৬] আবৃত্তি করতে করতে তিনি ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন, শত্রু বাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বীর বিক্রমে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত শাহাদত বরণ করেন।[৩৭]

শাহাদাতকালে আবৃত্তি করা কবিতাটি ছিল এই ঃ

اِنِّيْ اِذَا اَعْرِفُ يَوْمِيْ اَصْبِرُ

وَاِنَّمَا يَعْرِفُ يَوْمَهُ الْحُرُّ

اِذْ بَعْضُهُمْ يَعْرِفُ ثُمَّ يُنْكِرُ.

–আমি যখন আমার দিনে অবস্থা দেখি, ধৈর্য ধারণ করি।

আর স্বাধীনচেতা ব্যক্তি তো তার দিন সম্পর্কে ভালোই জানে।

কিন্তু কিছু লোক এমনও আছে, যারা জেনেও অস্বীকার করে।

শাহাদাতের পর হাজ্জাজ হযরত আব্দুল্লাহর লাশ প্রকাশ্য রাজপথে ঝুলিয়ে রাখে। তিন দিন পর হযরত আসমা দাসীকে সাথে নিয়ে এসে দেখেন, নিচের দিকে মাথা দিয়ে লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এহেন মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে নিজেকে সংবরণ করে তিনি বললেন, ইসলামের ঘোড়াসওয়ার দ্বীন-মিল্লাতের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এ বীর পুরুষের কি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার এখনও সময় হয়নি?[৩৮]

সত্যবাদীতা ছিল হযরত আসমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মতো নিষ্ঠুর যালেমের সামনেও সত্য বলতে তিনি ইতস্তত করেননি। বরং তিনি তাঁকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেন। হযরত আবদুল্লাহর শাহাদাতের পর হাজ্জাজ হযরত আসমার নিকট এসে বলে, তোমার ছেলে আব্দুল্লাহ খোদার ঘরে বেদ্বীনী বিস্তার করেছিল, তাই খোদা তার উপর কঠোর শাস্তি নাযিল করেছেন। জবাবে হযরত আসমা বলেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আমার ছেলে বেদ্বীন ছিল না। আমার ছেলে ছিল রোযাদার, রাতে নামাযগুযার, পরহেযগার ও ইবাদাতগুযার। পিতা-মাতার একান্ত বাধ্য-অনুগত সন্তান। আমি নবীজীর কাছে একটি হাদীস শুনেছি। তিনি বলেছেন, সকীফ গোত্রে দু'জন লোক হবে। এদের প্রথমজন হবে দ্বিতীয় জনের চেয়ে জঘন্য।[৩৯] এদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী অর্থাৎ মোখতার সকফীকে তো আমি দেখেছি। আর অপর যালেম তুমি, যাকে আমি এখন দেখছি তার এই তিক্ত জবাবে হাজ্জাজ জ্বলে উঠলেও শেষ পর্যন্ত চুপ থাকে।

এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাজ্জাজ হযরত আসমাকে বলে, আমি তোমার পুত্রের সাথে এ আচরণ করেছি। তখণ তিনি জবাবে বলেন, তুমি আমার পুত্রের দুনিয়া বরবাদ করেছ আর নিজের করেছ আখেরাত বরবাদ। আমি এটাও শুনেছি যে, তুমি উপহাস করে আমার পুত্রকে বলতে ইবনু যাতিন নেতাকাইন-দুই নেতাকওয়ালীন পুত্র। হ্যাঁ, আমি আমার নেতাক দিয়ে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আমার পিতা হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর খানা বেঁধেছিলাম। আমি এ হাদীসও শুনেছি যে, সকীফ গোত্রে একজন মিথ্যাবাদী এবং একজন যালেমের জন্ম হবে।

মিথ্যাবাদীকে তো আমি দেখেছি। আর যালেম হচ্ছ তুমি। হাজ্জাজ এ হাদীস্ শুনে প্রভাবিত হয় এবং কেটে পড়ে।[৪০]

কিছুদিন পর আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে লাশ নামান হয়। হযরত আসমা লাশ চেয়ে নিয়ে গোসল করান। লাশের জোড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। গোসল করাতে খুব কষ্ট হয়। কিন্তু এই মর্মবিদারী দৃশ্য দেখেও হযরত আসমা ধৈর্য ধরণ করেন।

হযরত আসমা ইবনেয় ও নম্র স্বভাবের হলেও বোন হযরত আয়েশার মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। হাজ্জাজের দম্ভ আর ঔধ্যত্যের সামনেও তার ব্যক্তিত্ব ইসলামের ইতিহাসে অক্ষয় ও স্মরণীয় হয়ে আছে।

ওফাত

হযরত আসমা আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করতেন, খোদা! আব্দুল্লাহর লাশ দেখার আগে আমাকে মৃত্যু দেবে না। আল্লাহ্ তাঁর এ দোয়া কবুল করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহর শাহাদতের এক সপ্তাহ্ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই হিজরী ৭৩ সালের জমাদিউল আওয়াল মাসে[৪১] নশ্বর জীবনের শত বর্ষ পূর্ণ করে[৪২] মক্কা মুয়াযযামায় তিনি ইন্তিকাল করেন। বয়স একশ বছর পূর্ণ হলেও তার একটা দাঁত পড়েনি। হুশ-জ্ঞানও সম্পূর্ণ ঠিক ছিল।[৪৩] তার কদ ছিল লম্বা। দেহ ছিল মাংশল ও সুঢৌল। শেষ পর্যন্ত শক্তি-সামর্থ্য সবই অটুট ছিল।

৩১ হিজরী সালে তার স্বামী হযরত যুবায়ের যখন জামাল যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন আমর ইবনে জরমুয মুজাশেয়ী নামে জনৈক ব্যক্তি সেবা উপত্যাকায় তাকে হত্যা করে। তিনি এ ঘটনা জানতে পেরে ব্যথিত হন এবং এ শোক গাথা পাঠ করেন ঃ

ইবনে জরমুয যুদ্ধের দিন একজন সাহসী যোদ্ধার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে।

আর তা করেছে এমন সময় যখন সে ছিল নিরস্ত্র।

আমর! তুমি তাকে আগে জানিয়ে দিলে তার মনে ভয় দেখতে পেতে না,

হাতে দেখতে না কম্পন।

তোমার মাতা তোমার জন্য কাদন করুক,

তুমি একজন মুসলমানকে হত্যা করেছো। তোমার উপর অবশ্যই আযাব আসবে।

একদিকে স্বামীর হত্যা আর অপর দিকে বক্ষের পুতুল কলিজার টুকরা পুত্রের শাহাদত, এ দুটি ঘটনা তার জন্য কেয়ামতের চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু এ হৃদয় বিদারক ঘটনা যে অশেষ ধৈয-সহ্যের সাথে তিনি হযম করেছেন, তা কেবল হযরত আসমার মতো মহাপ্রাণ মহিলার পক্ষেই সম্ভব।

১.তবকাতে ইবনে সাআদ পৃষ্ঠা ১২৮, ২. আদ-দুররুল মানসুর পৃষ্ঠা ৩৩ ও উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৩২৯, ৩. ঐ, ৪. আরবীতে নেতাক বলা হয় রুমালকে, মহিলারা কামীজের পর যা পরিধান করে, ৫. তবকাত পৃষ্ঠা ১৮২, উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৩৯২, এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭২৪, আদ-দুরুল মানসুর পৃষ্ঠা ৩৩, ৬. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৩৯২, ৭. তবকাত পৃষ্ঠা ১৮২ এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭২৪, উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৩৯২, আদ দুররুল মানসুর পৃষ্ঠা ৩৩, ৮. তবকাত পৃষ্ঠা ১৮২, ৯. তবকাত পৃষ্ঠা ২৩, ১০. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৭২৪, ১১. ছহীহ বুখারী, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৫৫, ১২. আদদুরুল মানসুর পৃষ্ঠা ২২-২৩. ১৩. তবকাত পৃষ্ঠা ১৮২, ১৮৩ ছহীহ বুখারী দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৮৬, ১৪. মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৫০, ১৫. তবকাত পৃষ্ঠা ৮৩ আল এছাবা, ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা-৮, ১৬. তবকাত পৃষ্ঠা ১৮৩, ১৭. সূরা মুমতাহানা আয়াত : ৮-৯, ১৮. মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল. ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্টা ৩৫০, ১৯. ২০. ২১. তবকাত পৃষ্ঠা ১৮৩ ও খুলাছাতুত তাহযীব পৃষ্ঠা ৪৮৮, ২২. ছহীহ বুখারী. সমষ্টির জন্য ব্যক্তির দান অধ্যায়, ২৩. মুসনাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড. পৃষ্ঠা ১৪৪, ২৭. ছহীহ বুখারী, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৫০. ২৮. মুসনাদ ৬ষ্ঠা খন্ড পৃষ্ঠা ৩৪৮, ২৯. ছহীহ মুসলিম ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৭৯, ৩০. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৩৯৩, ৩১. আদদুররুল মানসুর পৃষ্ঠা ৩৪।

১৮

হযরত উমামা বিনতে আবুল আছ (রাঃ)

তার নাম উমামা, পিতা আবূল আছ ইবনে রাবী' ইবনে আবদুল উযযা। মাতা হযরত যয়নব ইবনেতে রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম।[১] নানা হযরত (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় তার জন্ম হয়েছে।[২] বয়স হলে বিয়ে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। এদিকে হযরত ফাতিমার তখন ইন্তিকাল হয়েছে। হযরত ফাতিমা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে ওছিয়ত করে যান তার ইন্তিকালের পর উমামাকে বিয়ে করার জন্য। স্ত্রীর ওছিয়ত অনুযায়ী হযরত আলীকে (রাঃ) হযরত উমামাকে বিয়ে করেন। হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। কারণ হযরত আবূল আছ তাকেই ওছিয়ত করেছিলেন হযরত উমামাকে বিয়ে করার জন্য।[৩] হিজরী ৪০ সালে হযরত আলী (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেনা হযরত মুআবিয়া যাতে হরত উমামাকে বিয়ে না করেন এজন্য শাহাদাতের আগে তিনি মুগীরা ইবনে নওফলকে ওছিয়ত করে যান হযরত উমামাকে বিয়ে করার জন্য। এই ওছিয়ত অনুযায়ী হযরত আলীর শাহাদাত লাভের পর ইদ্দত শেষে মুগীরা ইবনে নওফল-এর সাথে তার বিয়ে হয়।[৪]

হযরত আলীর আশঙ্কা সত্য পরিণত হয়। অর্থাৎ মুআবিয়া মারওয়ানকে চিঠি লিখেন যে উমামার কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠাও এবং এ উপলক্ষ্যে এক হাজার দীনার ব্যয় কর। কিন্তু হযরত উমামা এ সম্পর্কে জানতে পেরে মুগীরা ইবনে নওফেলকে অবহিত করেন। মুগীরা ইমাম হাসান এর অনুমতি নিয়ে তখনই বিয়ে করার ব্যবস্থা করেন।[৫]

হযরত উমামা নবীজীর অতি প্রিয় পাত্রী ছিলেন। এমন কি নামাযের সময়ও তাকে দূরে রাখতেন না। নামায পড়ার সময় কাঁধে বসিয়ে নিতেন। তিনি এভাবে নামায শেষ করতেন। এটা ছিল অতি ভালোবাসার দাবি।[৬]

একবার কোথাও থেকে একটা মূল্যবান হার উপহার আসে। নবীজী গৃহে ফিরে বললেন, আহলে বাইতের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় যে, তাকে আমি হারটি দেবো। নবীজীর স্ত্রীরা ভাবলেন, এটি বুঝি হযরত আয়েশার ভাগ্যে জুটবে। কিন্তু হযরত (সাঃ) হযরত উমামাকে ডেকে হারটি তার গলায় পরিয়ে দেন।[৭] অন্য বর্ণনায় দেখা যায়, হার নয়, বরং এ ছিল স্বর্ণের আংটির। হাবশায় বাদশাহ্ নাজ্জাশী হযরতের দরবারে উপহার হিসেবে এটি পাঠান। হযরত (সাঃ) হযরত উমামাকে তা-ই দান করেন।[৮]

মুগীরা ইবনে নওফেল-এর ঔরসে এক পুত্র সন্তান ইয়াহইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তদনুযায়ী তিনি আবূ ইয়াহইয়া কুনিয়াত ধারণ করেন।[৯] হযরত উমামার শেষ জীবন মুগীরা ইবনে নওফেল-এর সাথে কাটে। মুগীরার গৃহেই তাঁর ইন্তিকাল হয়।[১০]

১. তবকাত পৃষ্ঠা ৭২৬, উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৪০০, আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭২৭, ২. ঐ, ৩. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৩০০, ৪. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭২৭ আদদুররুল মানসূর পৃষ্ঠা ৬৫, ৫. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৪০০ আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭২৭ তবকাত পৃষ্ঠা ২৭; ৬. তবকাত পৃষ্ঠা ২৬ উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৪০০ আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭২৭ ছহীহ বুখারী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৭৭, ৬. তবকাত পৃষ্ঠা ২৬ উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৪০০ আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭২৭ ছহীহ বুখারী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৭৭, ৭. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৪০০ আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭২৭ আদদুররুল মানসুর পৃষ্ঠা ৬৫, ৮. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৭ যুরকানী ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ২২৫. ৯. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৪০০ আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭২৭ আদদুররুল মানসুর পৃষ্ঠা ৬৫, ১০. ঐ আল এছাবাহ ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৪।

১৯

হযরত আসমা বিনতে আমীস (রাঃ)

তার নাম আসমা। তিনি ছিলেন খুশআম গোত্রের মহিলা। তার পিতা ছিলেন আমীস ইবনে সাআদ ইবনে তামীম ইবনে হারেস। আর মাতা ছিলেন হিন্দ (খাওলা) ইবনেতে আওফ। পিতা ছিলেন কেনানা গোত্রের।[১] হযরত জাফর ইবনে আবূ তালেবের সাথে তার প্রথম বিয়ে হয়।[২] হযরত (সাঃ) মক্কায় দারে আরকাম-এ অবস্থানের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী (সাঃ) এর হাতে বায়আতের গৌরব অর্জন করেন।[৩] প্রায় একই সময় তার স্বামী জাফর ইবনে আবূ তালেবও ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪] তিনি স্বামীর সাথে হাবশায় হিজরত করেন। সেখানে আবূ জাফরের ঔরসে তিনটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে– মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ্ ও আওন।[৫]

হাবশায় কয়েক বৎসর অবস্থান শেষে ৭ম হিজরীতে খয়বর বিজয়ের পর তারা মদীনায় ফিরে আসেন এবং হযরত হাফসার গৃহে যান। ইতিমধ্যে হযরত উমরও (রাঃ) আসেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এ কে? জবাব এসেছে, আসমা। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, হাবশাওয়ালী সমুদ্রওয়ালী! হযরত আসমা বললেন, জি হ্যাঁ, সে। এরপর হযরত উমর (রাঃ) হযরত আসমাকে বললেন, তোমাদের ওপর আমাদের ফজীলত রয়েছে, কারণ আমরা মোহাজের। কথাটা শুনে হযরত আসমার খুব রাগ ধরে। তিনি বলেন, হ্যাঁ, ঠিক বলছেন আপনি। কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, আপনারা হযরতের সঙ্গে ছিলেন, অভুক্তদেরকে খাবার দিতেন, জাহেলদেরকে তা'লীম দিতেন। আর আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টি বিধানের কারণে ভিন দেশে পড়েছিলাম; কেউ আমাদের জিজ্ঞাসা করার ছিল না। ধৈর্য-সহনশীলতার সাথে কঠোর বিপদাপদ মোকাবিলা করেছি। তিনি যখন এ কথাগুলো বলছিলেন, তখন নবীজী গৃহে ফিরে আসেন। হযরত আসমা তাকে সব কথা খুলে বললেন। জবাবে রাসূলে খোদা বলেন, তিনি (অর্থাৎ

উমর) এক হিজরত করেছেন, আর তুমি করেছ দুই হিজর। তাই এদিক থেকে তোমার ফজীলত বেশি। নবীজীর এ জবাবে হযরত আসমা ও অন্যান্য মোহাজিররা ভারী খুশি হন। হাবশায় যারা হিজরত করেছিলেন, তারা হযরত আসমার কাছে আসতেন এবং এ ঘটনার তাৎপর্য জানতে চাইতেন।[৬]

৮ম হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে মুতার যুদ্ধে হযরত জাফর শহীদ হলে হযরত (রা:) হযরত আসমার গৃহে গমন করে বললেন, জাফরের সন্তানরা কোথায়? তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। হযরত আসমা সন্তানদেরকে হযরতের খেদমতে নিয়ে আসেন। তাদেরকে দেখে নবীজী দুঃখ প্রকাশ করেন, তার চোখে পানি টলমল করে। হযরতকে অশ্রুশিক্ত দেখে হযরত আসমার অস্থির-ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জা'ফরের কি কোন খবর এসেছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়েছে। এ হৃদয় বিদারক খবর শুনে আসমা চিৎকার করে উঠেন। পরিবারে কেয়ামত নেমে আসে। চারিদিক থেকে নারীরা ছুটে আসে, ঘরে মাতম পড়ে যায়। হযরত তাদেরকে বলেন, বুক চাপড়াবে না, বিলাপ করবে না।

হযরত (সা:) এ হেদায়াত করে ঘরে ফিরে যান। হযরত ফাতিমাকে বলেন, জাফর এর সন্তানদের জন্য খাবার প্রস্তুত কর। কারণ, আসমা আজ শোকাহত।[৭] এর পর তিনি মসজিদে গিয়ে অতি দুঃখের সাথে হযরত জাফরের শাহাদাতের কথা ঘোষণা করেন। এ সময় এক ব্যক্তির হযরতের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করে যে, জা'ফরের পরিবার-পরিজন মাতম করছে। তিনি বললেন, যাও তাদেরকে কাঁদতে নিষেধ কর। লোকটি ফিরে এসে পুনরায় আরয করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তারা বিরত হচ্ছে না। তিনি আবারও এ খবর পাঠান, কিন্তু কোন ফল হয় না। এবার হযরত বললেন, তাদের মুখে মাটি পুরে দাও।[৮] ছহীহ বুখারীতে এটা উল্লেখ আছে যে, হযরত আয়েশা লোকটিকে বলেন, খোদার কসম, তোমরা এরূপ না করলে আঁ-হযরতের অস্থিরতা যাথারীতি বহাল থাকবে। তৃতীয়বার হযরত (সা:) হযরত আসমার গৃহে উপস্থিত হয়ে শোক করতে বারণ করেন।[৯]

দ্বিতীয় বিয়ে

হযরত জাফরের শাহাদতের ৬ মাস পর হিজরী ৮ম সালের শাওয়াল মাসে হযরত আবূ বকর (রা:) এর সাথে হযরত আসমার দ্বিতীয় বিয়ে হয়।[১০]

দু'বছর পর দশম হিজরীর যিলকাদ মাসে হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর ঔরসে পুত্র মুহাম্মদের জন্ম হয়। এ সময় আসমা হজ্ব করার জন্য মক্কায় এসেছিলেন। যুলহুলাইফায় মুহাম্মদের জন্ম হলে হযরত আসমা চিন্তিত হয়ে পড়েন যে হজ্ব কি করে আদায় করবেন। তাই তিনি এ ব্যাপারে নবীজীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, গোসল করে এহ্‌রাম বাঁধ।[১১]

৮ম হিজরীতে স্বামীর শাহাদাতে হযরত আসমা যে আঘাত পেয়েছিলেন, তা তার জন্য কেয়ামতের চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু খোদার সন্তুষ্টির জন্য তিনি ধৈর্য ধারণ করেন। ১৩ হিজরীতে হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর ওফাতে তিনি আবার আঘাত পান এবং এ আঘাতও ধৈর্যের সাথে বরণ করে নেন। হযরত আবূ বকরের ইন্তিকালের সময় ওসিয়ত করে যান যে, স্ত্রী আসমা আমাকে গোসল করাবে। তার ওসিয়ত অনযায়ী হযরত আসমা তাকে গোসল করান।[১২] হযরত আবূ বকর (রাঃ) ওফাত কালে পুত্র মোহাম্মদের বয় ছিল আনুমানিক তিন বছর।[১৩]

তৃতীয় বিয়ে

হযরত আবূ বকর (রাঃ) ওফাতের পর হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে তার তৃতীয় বিয়ে হয়। শিশু পুত্র মোহাম্মদও মাতার সাথে হযরত আলীর (রাঃ) গৃহে প্রতিপালিত হয়। একদিন মোহাম্মদ ইবনে জাফর ও মোহাম্মদ ইবনে আবূ বকর (রাঃ) পরস্পরে গর্ব করে একে অপরকে বলে, আমি তোমার চেয়ে বেশি সম্মানিত, আমার পিতা তোমার পিতার চেয়ে বেশি ভালো। তাদের মধ্যে দীর্ঘকাল এ বাহাদুরী চলতে থাকে। হযরত আলী (রাঃ) স্ত্রী আসমাকে বললেন, তুমি এ বিতর্কের মীমাংসা কর। হযরত আসমা বললেন, আরবের নওজোয়ানদের মধ্যে জাফরের চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি, আর বয়স্কদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর চেয়ে ভালো কাউকে দেখিনি। এ মীমাংসার পর হযরত আলী (রা) বললেন, তুমিতো আমার জন্য কিছুই রাখনি।[১৪]

হযরত আলীর (রাঃ) ঔরসে এক পুত্র ইয়াহইয়া জন্ম গ্রহণ করে। মুহাম্মদ ইবনে ওমরের উদ্ধৃতি দিয়ে তবকাত-এ বলা হয়েছে যে, হযরত আলীর ঔরসে দু'জন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে-ইয়াহইয়া ও আওন (পৃষ্ঠা ২০৮)। কিন্তু প্রথম বর্ণনা বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। কারণ, অধিকাংশ জীবন চরিতকার এ ব্যাপারে একমত।

হযরত (সা:) ইন্তিকালের আগে রোগাক্রান্ত হলে হযরত উম্মে সালমা ও হযরত আসমা রোগ নির্ণয় করে তাকে ঔষধ খাওয়াতে চান। কিন্তু তিনি খেতে অস্বীকার করেন। এ সময় তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলে তারা এটাকে মোক্ষম সময় মনে করে মুখে ঔষধ ঢেলে দেন। কিছুক্ষণ পর তার অচৈতন্যতা দূর হলে কিছুটা জ্ঞান ফিরে আসে। তিনি বলেন, আসমা এ পরামর্শ দিয়ে থাকবে।[১৫]

৩৮ হিজরীতে তার পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর মিসরে শহীদ হলে যালেমরা অতি নিষ্ঠুরভাবে তার লাশকে গাধার খালে পুরে পুড়িয়ে ফেলে। স্পষ্ট যে, হযরত আসমার জন্য এর চেয়ে কষ্টদায়ক ঘটনা ও মর্ম বিদারী দৃশ্য আর কি হতে পারে। কিন্ত তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ধারণ করেন। এ মর্ম বিদারী ঘটনার খব পেয়ে জায়নামায নিয়ে নিয়োজিত হন।[১৬]

হযরত আসমা থেকে ৬০টি হাদীস বর্ণিত আছে। এসব হাদীসের রাবীরা হচ্ছেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর, ইবনে আব্বাস, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ, ইবনুল হাদ, ওরওয়া, ইবনে মোসাইয়্যের, উম্মে আওন ইবনেতে মুহাম্মদ ইবনে জাফর, ফাতেমা ইবনেতে আলী, আবূ ইয়াযীদ মাদানী।[১৭]

হযরত আসমার গর্ভে মোট ৭ জন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে– পাঁচ জন পুত্র ও দুজন কন্যা। প্রথম স্বামী হযরত জা'ফরের ঔরসে তিন পুত্র মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ও আওন, দ্বিতীয় স্বামী হযরত আবূ বকর এর ঔরসে এক পুত্র মুহাম্মদ এবং তৃতীয় স্বামী হযরত আলীর ঔরসে এক পুত্র ইয়াহইয়া।

হিজরী চল্লিশ সালে হযরত আলী (রা:) শাহাদাত বরণ করেন। প্রায় কাছাকাছি সময়ে হযরত আসামও ইন্তিকাল করেন।[১৮]

১. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৩৯৫, তবকাত পৃষ্ঠা ২০৫, আল এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭২৫, ৩. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২০৫, ৪. সীরাতে ইবনে হিশাম পৃষ্ঠা ১৩৬, ৫. তবকাত পৃষ্ঠা ২০৫ আল এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭২৫, ৬. ছহীহ বুখারী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭০৬, তবকাত ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৫, ৭. ঐ ছহীহ বুখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ২০৭-২০৮, ৮. ছহীহ বুখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬১১, ৯. মুসনাদ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৩৬৯. ১০. আল এছাবা, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯, তবকাত পৃষ্ঠা ২০৬-২০৭, ছহীহ বুখারী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৮৫, ৩৯৪, আল এছাবা ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯, ১১. আল এছাবা ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯, তবকাত পৃষ্ঠা ২০৮, ১২. তবকাত পৃষ্ঠা ৭২৫, উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৩৯৫, ১৫. ছহীহ বুখারী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৫১. তবকাত ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩১-৩২, ১৬. আল এছাবা, ৮ম খন্ড পষ্ঠা ৯, ১৭. আদদুররুল মানসুর পৃষ্ঠা ৩৫, ১৮. মুসনাদ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৩৬৯।

২০

হযরত উম্মুল ফযল বিনতে হারেস (রাঃ)

তার নাম লুবাবা, লকব বা উপাধী আল-কুবরা এবং কুনিয়াত উম্মুল ফযল। তার পিতা ছিলেন হারেস ইবনে হাযন আল-হেলালী এবং মাতা ছিলেন কেনানা গোত্রের হিন্দ (খাওলা) ইবনেতে আওফ।[১] নবীজীর চাচা হযরত আব্বা ইবনে আবদুল মুত্তালেবের সাথে তার বিয়ে হয়।

নবীজীর স্ত্রী হযরত খাদীজা ইবনেতে খুওয়াইলিদ এর পর মক্কার মহিলাদের মধ্যে তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।[২] কিন্তু আল-এছাবা গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৯৩৭) উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। মনে হয়, এ বর্ণনা দুর্বল। কারণ, অন্যান্য সীরাত গ্রন্থে প্রথম বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আব্বাসের ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন।[৩] তিনি নবীজীর কাছ থেকে প্রায় তিরিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব হাদীসের বর্ণনাকারীদের নাম হচ্ছে, আব্দুল্লাহ্ তাম্মাম, আনাস ইবনে মারেক, আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস, উমাইর, কুরাইব এবং কাবুস।[৪] আঁ-হযরত (সা:) অধিকন্তু তাঁকে দেখার জন্য তার ঘরে যেতেন। সেখানে দুপুরে তিনি সামান্য সময় বিশ্রাম গ্রহণ করতেন।[৫]

তাঁরা কয়েক বোন ছিলেন। কোরাইশ এবং হাশেম বংশের বিশিষ্ট পরিবারে এদেরকে বিয়ে দেয়া হয়েছে। তার এক বোন হযরত মায়মূনা নবীজীর স্ত্রী হওয়া গৌরব অর্জন করেন। অপর বোন হযরত সালমাকে বিয়ে দেয়া হযরত হামযার সাথে এবং আর এক বোন হযরত আসমাকে বিয়ে দেয়া হয়

হযরত আলীর ভাই হযরত জাফর ইবনে আবূ তালেবের সাথে। এ আসমাকেই পরে হযরত আবূ বকর এবং তার ইন্তিকারের পর হযরত আলীর সাথে বিয়ে দেয়া হয়।[৬] এ কারণে তার মাতা হিন্দ ইবনেতে আওফ সম্পর্কে বলা হয় যে, এ দিক থেকে তিনি ছিলেন এক বড় ভাগ্যবান মহিলা। এ ক্ষেত্রে তার কোন নযীর ছিল না।[৭] আঁ হযরত (সাঃ) বলতেন, উমউল ফযল, মায়মূনা, সালমা এবং আসমা এরা চার বোন মোমেনা।[৮] অন্য রেওয়ায়াতে উল্লেখ আছে যে, উম্মুল ফযল, মায়মুনা, সালমা আসমা লুবাবাতুস সুগরা, হোযাইলা ইয্যাহ এরা সব বোনই মোমেনা।[৯] উম্মুল ফযল বিদায় হজ্জে নবীজীর সঙ্গে হজ্বও আদায় করেন। হজ্জের সময় আরাফার দিন অনেকে সন্দেহ করে যে, হযরত (সাঃ) রোযা রেখেছেন। হযরত উম্মুল ফযলের নিকট এ সন্দেহ প্রকাশ করা হলে তিনি নবীজীর খেদমতে এক পেয়ালা দুধ পাঠান। নবীজী দুধ পান করলে এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহ দূর হয়।[১০] তিনি ছিলেন অতি ইবাদাতগুযার, অতি যাহেদ মহিলা। প্রত্যেক সোম বৃহস্পতিবার তিনি রোযা রাখতেন।[১১]

সন্তানদীর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ভাগ্যবান মহিলা। তার সব সন্তানই ছিল অত্যন্ত যোগ্য। আবূল ফযল, আবদুল্লাহ্, ওবায়দুল্লাহ্, মাবাদ, কাশাম, আবদুর রহমান এবং উম্মে হাবীবা তার স্মৃতিবাহী সন্তান।[১২]

কবি আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ হেলালী তার সৌভাগ্যে গর্ব করে একটা কবিতা আবৃত্তি করেন।[১৩] আঁ হযরতের মাথা কোলে রেখে চুল আঁচড়ানো বা সুরমা লাগানোর সৌভাগ্য নবুওয়াতের আগে বা পরে অন্য কোন নারী লাভ করতে পারেনি। আর হযরত (সাঃ) তা পছন্দ করতেন না। কিন্তু হযরত উম্মুল ফযল এ গৌরব লাভ করেছেন।

একবার তিনি নবীজীর খেদমতে আরয করেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি। যে, আপনার দেহের একাংশ আমার ঘরে আছে। নবীজী বললেন, ইন্‌শাআল্লাহ্ ফাতিমার পুত্র সন্তান হবে, তুমি তাকে দুধ পান করাবে এবং তার লালন পালন করবে। আসলে হয়েছেও তাই। হযরত ফাতিমার পুত্র হযরত

হোসাইনের জন্ম হলে হযরত উম্মুল ফযল তাকে দুধ পান করান এবং লালন পালন করেন। একবার হযরত হোসাইনকে নিয়ে নবীজীর কাছে যান। তিনি নবীজীর কোলে পেশাব করে দিলে তাকে হযরতের কোল থেকে নিয়ে রাগ করে বলেন, তুই হযরতের কোলে পেশাব করে দিয়েছিস। নবীজী বললেন, তুমি আমার শিশুকে ধমক দিয়ে আমাকে ব্যথা দিয়েছ। এরপর তিনি নিজে পানি দিয়ে পেশাব ধুয়ে ফেলেন।[১৪] হযরত উম্মুল ফযল খলীফা ওসমান (রাঃ) এর শাসনামলে ইন্তিকাল করেন। তার স্বামী হযরত আব্বাস (রাঃ) তখনও বেঁচে ছিলেন।[১৫]

১. তবকাত পৃষ্ঠা ২০৩, আল এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭৯, ২. ঐ উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫৩৯, ৩. তবকাত পৃষ্ঠা ২০৩, ৪. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫৪০, ৫. তবকাত পৃষ্ঠা ২০৩ আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭৯, উসুদুল গাবা পৃষ্ঠা ৫৩৯, ৬. আল-এছাবাহ পৃষ্ঠা ৯৩৮, ৭. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫৩৯, আল এস্তীআব পৃষ্ঠা-৭৭৯, ৯. তবকাত পৃষ্ঠা ২০৩, ১০. আল-এছাবাহ, পৃষ্ঠা ৯৩৮, তবকাত পৃষ্ঠা ২০৪, ছহীহ বুখারী, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৬০, ১১. তবকাত পৃষ্ঠা ২৬০, খুলাছাতুত্ তাহযীব পৃষ্ঠা ৪৯৫, ১২. তবকাত পৃষ্ঠা ২০৩, আল এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭৯, ১৩. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫৩৯, ১৪. তবকাত পৃষ্ঠা ২০৪, আল এছাবাহ পৃষ্ঠা ৯৩৮, ১৫. আল-এছাবাহ পৃষ্ঠা ৯৩৮।

২১

হযরত ফাতিমা বিনতে কায়েস (রাঃ)

তার নাম ফাতিমা। পিতা কায়েস ইবনে খালেদ আকবর ইবনে ওয়াহাব। আর মাতা উমায়মা ইবনেতে রবীআ' ছিলেন বনু কেনানার মহিলা। তার ভাই ছিলেন যাহহাক। তিনি ভাইয়ের চেয়ে ১০ বছর বড় ছিলেন।[১] আবূ আমর হাফ্ছ ইবনে মুগীরার সাথে তার বিয়ে হয়।[২] হিজরতের প্রথম পর্যায়ে নারীরা যখন মক্কা মুয়ায্যামা থেকে হিজরত করেন। তখন তাদের সাথে হযরত ফাতিমা ইবনেতে কায়েসও ছিলেন।[৩] তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি, বিচক্ষণ, সুস্থ চিন্তার অধিকারী এবং সাহিত্যসেবী মহিলা।[৪] অনেক রাবী তার উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের কয়েক জনের নাম নিম্নে বিবৃত হলো ঃ[৫]

শাঈ, নাখ্ঈ, আবূ সালমা, কায়েস ইবনে মুহাম্মদ, আবূ বকর ইবনে জাহাদ, ওরওয়া, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্, আসওয়াদ, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আবদুল্লাহ্ আল-বাহী, আবদুর রহমান ইবনে আছেম, তামীম প্রমুখ।

২৩ হিজরীতে খলীফা ওমর (রাঃ) শহীদ হলে হযরত ফাতিমা ইবনেতে কায়েসের গৃহেই মজলিসে শুরার বৈঠক বসে। যেহেতু তিনি ছিলেন প্রজ্ঞার অধিকারী মহিলা, তাই খেলাফতের ব্যাপারে তার নিকট থেকেও পরামর্শ নেয়া হয়।[৬]

হিজরী দশম সালে হযরত আলী (রাঃ) একটি বাহিনী নিয়ে ইময়ামান গমন করলে তার স্বামী আবূ আমরও উক্ত বাহিনীর সাথে যান। বিদায় কালে

তিনি বিয়ের উকীল ইয়াস ইবনে রবী'আর মারফতে স্ত্রী ফাতিমাকে শেষ তালাক দিয়ে যান। ইতিপূর্বে দু'তালাক দিয়েছিলেন। স্ত্রীর খোরপোষ বাবত তিনি ৫ ছা' যব এবং ৫ ছা খোরমাও প্রেরণ করেন। হযরত ফাতিমা ইয়ারেস নিকট খাদ্য ও বাসস্থান দাবী করলে তিনি বলেন, তোমার স্বামী কেবল এটুকুই আমাকে দিয়েছেন। এছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই। আর এটাও তিনি দিয়েছেন দয়াপরবশ হয়ে সহানুভূতি স্বরূপ। অন্যথায় তার কাছে আমার কোন অধিকার নেই। কথাগুলো তার কাছে খুব অসহ্য ঠেকে। তিনি কাপড়-চোপড় নিয়ে নবীজীর কাছে হাযির হন। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ এবং অন্যান্যরাও সেখানে পৌছেন। হযরত ফাতিমা সব কথা খুলে বলেন। নবীজী জানতে চাইলেন, আবূ আমর তোমাকে ক'বার তালাক দিয়েছে। তিনি বললেন, তিনবার। নবীজী বললেন, এখন আবূ আমর এর উপর তোমার খোরপোষ আর ওয়াজেব নয়। এখন তুমি উম্মে শুরাইক এর গৃহে থেকে ইদ্দত পালন কর। কিন্তু উম্মে শুরাইকের গৃহে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ছিল। তাই তিনি বলেন যে, ইবনে মাকতুম অন্ধ এবং তোমার চাচাতো ভাই। তার বাসায় থেকে ইদ্দত পালন করলেই ভাল হয়। নবীজীর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি ইবনে মাকতুম এর গৃহে থেকে ইদ্দত পালন করেন। ইদ্দতের মেয়াদ শেষ হলে চারিদিক থেকে বিয়ের পয়গাম আসতে থাকে। আমীর মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান, আবূ জাহাম এবং উসামা ইবনে যায়েদও পয়গাম পাঠান। এসব পয়গাম নিয়ে তিনি নবীজীর সাথে পরামর্শও করেন। নবীজী বলেন, মুআবিয়াতে নিঃস্ব ব্যক্তি, তার কাছে কিছুই নেই। আর আবূ জাহামতো ঝগড়াটে এবং বদমেযাজী। উসামা ইবনে যায়েদ এদের চেয়ে ভালো। তুমি তাকে বিয়ে কর। হযরত ফাতিমার ধারণা ছিল, নবীজী তাকে বিয়ে করবেন, তাই তিনি ইতস্তত করেন'। নবীজী বললেন, তোমার আপত্তি কি জন্য? আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর, এতে তোমার মঙ্গল রয়েছে। অবশেষে তিনি রাযী হন এবং উসামা ইবনে যায়েদকে বিয়ে করেন। হযরত ফাতিমা বলেন, এ বিয়ের পর আমি লোকের নিকট ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হই।[৭]

মহিলা সাহাবী

হযরত ফাতিমা ছিলেন রূপ-গুণের অধিকারী মহিলা। তার শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যই ছিল না, অভ্যাস, গুণাবলী, স্বভাব-চরিত্র সবই ছিল ভালো। ৫৪ হিজরীতে স্বামী উসামার ইন্তিকালে তিনি ভীষণ দুঃখিত হন। এরপর তিনি আর বিয়ে করেননি। ইদ্দত অতিক্রমের পর খলীফা ইয়াযীদ হযরত ফাতিমার ভাই যাহহাককে ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলে তিনি ভাইয়ের সাথ কুফা গমন করেন এবং সেখানেই বসবাস করেন।

জীবন চরিত ও ইতিহাস গ্রন্থে হযরত ফাতিমার মৃত্যু সাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। কিন্তু মক্কায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এর শাসনকাল পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

১. আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭৪, উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২৬, আদদররুল মানসুর পৃষ্ঠা ৩৬৪, ২. তবকাত পৃষ্ঠা ২০০ আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭৪, উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২৬, আদদুররুল মানসুর পৃষ্ঠা ৩৬৪, ৩. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২৬, আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭৪, আদদুরুল মানসুর পৃষ্ঠা ৩৬৪, ৪. ঐ, ৫. ঐ পৃষ্ঠা ৫২৭, আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭৪, আদদুররুল মানসুর পৃষ্ঠা ৩৭৫, ৬. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৫২৭, আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৭৪, আদদুররুল মানসুর পৃষ্ঠা ৩৬৫, ৭. তবকাত ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০১. ছহীহ মুসলিম ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৮৩-৪৮৫, মুসনাদ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৪১১-৪১৪।

হযরত খান্সা বিনতে আমর ইবনুশ শারীদ (রাঃ)

তার আসল নাম তমাযুর, কিন্তু চপলতা-চঞ্চলতা, প্রজ্ঞা-বিচক্ষণতা আর সৌন্দর্যের কারণে খানসা লকবে তাকে স্মরণ করা হয়। খানসা অর্থ মাদি হরিণ। তার নামের চেয়ে লকব বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি ছিলেন নজদ-এর অধিবাসী। তার পিতার নাম আমর ইবনুশ শারীদ, ইবনে রবাহ ইবনে ইয়াকযা ইবনে আছিয়্যা ইবনে খফাফ ইবনে ইমরাউল কায়েস। তিনি কায়েস কবীলার সলীম খান্দানের উত্তরসূরী ছিলেন। সলীম খান্দানের রাওয়াহা ইবনে আবদুল আযীয সালমার সাথে তার প্রথম বিয়ে হয়।[১] প্রথম স্বমীর ঔরসে এক পুত্র সন্তান আবদুল্লাহ এবং দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসে দু'পুত্র ইয়াযীদ ও মু'আবিয়া এবং এক কন্যা ওমরা জন্ম গ্রহণ করেন।[২]

মক্কার আকাশে রেসালাতের সূর্য উদিত হয়ে চারিদিকে আলোর আভা বিকিরণ করলে হযরত খানসার চক্ষুও সে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। পারিবারের আরও কয়েকজন সদস্যের সাথে তিনিও মদীনায় নবীজীর দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩] হযরত (সা:) দীর্ঘক্ষণ তার কবিতা শুনেন এবং তার কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ ও বিমোহিত হন।[৪] প্রথম জীবনে তিনি মাঝেমধ্যে দু'একটি কবিতা রচনা করেন।[৫] কিন্তু বনু আসাদ গোত্রের যুদ্ধে তার আপন ভাই মুআবিয়া নিহত হন। এ যুদ্ধে তার এক বৈপিতৃক ভাই ছখর বনু আসাদ গোত্রের আবূ সওর এর হাতে আহত হয়। তিনি দীর্ঘ এক বছর ধরে এ ভাইয়ের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সুস্থ হননি। প্রিয় বোনকে বিয়োগ ব্যথায় ব্যথিত করে অবশেষে তিনি পরপারের পথে যাত্রা করেন।[৬]

হযরত খানসা উভয় ভাইকেই অতি ভালোবাসতেন। কিন্তু জ্ঞান, ধৈর্য, বদান্যতা, বীরত্ব, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং সৌন্দর্য ইত্যাদির কারণে ছখরকে

তিনি বেশি ভালোবাসতেন।[৭] এ কারণে ভাই ছখর এর মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তখন থেকে ভাইয়ের শোকগাথায় অনবদ্য কবিতা রচনা শুরু করেন।[৮] এসব মর্সিয়া বা শোকগাথায় দুঃখ-ব্যথা-বেদনা তিনি এমন হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ব্যক্ত করেন যে, তা শুনে লোকেরা অস্থির হয়ে ওঠতো এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়তো। এখানে তার মর্সিয়ার কয়েকটি শ্লোক এর বাংলা অনুবাদ উল্লেখ করা হচ্ছে। এসব শ্লোকে তার কাব্য প্রতিভা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিধৃত ঃ

হে মোর চক্ষুদ্বয়! বদান্যতা অবলম্বন করো, কার্পণ্য করো না।

ছখর এর মতো দানশীলের জন্য তোমরা কি রোদন করনা।

তোমরা কি রোদন করনা তার জন্য,

যে ছিল সাহসী এবং সুন্দর।

যে ছিল যুব নেতা, তোমরা কি তার জন্য কাঁদবে না?

যার বংশ মর্যাদা ছিল সুউচ্চ আর সে নিজেও ছিল দীর্ঘকায়।

যখন তার দাড়ি-গোফ গজায়নি,

তখনই সে গোত্রের নেতা হয়েছিল।

জাতি যখন মর্যাদায় দিকে হাত প্রসারিত করে, তখন সেও হাত বাড়ায়।

সে এমন মর্যাদায়

পৌছে, যা ছিল অন্যদের হাতে অনেক উর্ধ্বে।

এমন সৌভাগ্য নিয়েই সে তিরোহিত হয়।

তুমি দেখবে, শ্রেষ্ঠত্ব তার ঘরের পথ দেখায়।

প্রশংসিত হওয়াতেই সে মনে করতো সবচেয়ে বড় মর্যাদা।

ইজ্জত-শরাফত আলোচিত হলে তুমি দেখবে যে,

ইজ্জতের চাদরে সে আবৃত।

আরবের নারীদের অভ্যাস অনুযায়ী হযরত খানসা সকাল-সন্ধ্যা তার নিহত ভাইয়ের কবরে বসে তাকে স্মরণ করে কাঁদতেন এবং মর্সিয়া পড়তেন।[৯]

ছখর! তুমি আমার চক্ষুকে কাঁদিয়েছ। তাতে কি?

তুমিতো দীর্ঘদিন হাসিয়েও ছিলে মোরে।

যেসব নারী চিৎকার করে রোদন করে,

তাদের সাথে আমিও রোদন করছি।

আর আমিতো তাদের মধ্যে বেশি হকদার,

যারা চিৎকার করে।

তোমাকে দিয়ে আমি অনেক বিপদ কাটিয়েছি,

যখন তুমি বেঁচে ছিলে

কিন্তু এখন কে এসব বড় বিপদ ঠেকাবে?

যখন কোন নিহত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন

করাকে খারাপ মনে করা হয়,

তখন আমি তোমার জন্য ক্রন্দনকে অত্যন্ত সুন্দর মনে করি।

ছখর-এর মান-মর্যাদার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন ঃ

وَاِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِه.

كَاَنَّهُ عَلَمٌ فِىْ رَأسِه نَارٌ.

–বড় বড় লোকেরা ছখর এর আনুগত্য করে।

সে যেন এক পর্বত, যার চূড়ায় রয়েছে আগুন।

এসব মর্সিয়া বা শোকগাথার জন্যই তিনি গোটা আরবে খ্যাত হন। সব রকম কবিতা বিশেষ করে মর্সিয়া বা শোকগাথা রচনায় হযরত খানসা ছিলেন অনন্য। উসদুল গাবাহ গ্রন্থের রচয়িতা লিখেন ঃ

اَجْمَعَ اَهْلُ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ اَنَّهُ لَمْ تَكُنْ اِمْرَأَةٌ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا اَشْعَرَ مِنْهَا.

–সকল কাব্য রসিক এ ব্যাপারে একমত যে, খানসার আগে বা পরে তার চেয়ে বড় মহিলা কবি আর কেউ ছিল না।[১০]

আদ-দুররুল মানসূর গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

কবি জারীরকে (উমাইয়া যুগের প্রসিদ্ধ কবি মৃত্যু ১১০ হিজরী) জিজ্ঞেস করা হয়, সবচেয়ে বড় কবি কে? জবাবে বলেন, খানসা না হলে আমি হতাম সবচেয়ে বড় কবি।[১১]

আরবের একজন বড় কবি বাশ্‌শার বলেন, নারীদের কবিতা বিশেষভাবে দেখলে তাতে কোন না কোন ত্রুটি বা দুর্বলাত অবশ্যই পাওয়া যায়। কেউ জিজ্ঞেস করেন, খানসার কবিতারও কি এ দশা? জবাবে তিনি বলেন, তিনি তো পুরুষদের চেয়েও অগ্রসর।[১২]

আরবের সকল কবি লায়লা আখীলিয়াকে মহিলা কবিদের শিরোমণি বলে স্বীকার করেন, কিন্তু তারাও খানসাকে ব্যতিক্রম বলে মনে করেন।

জাহেলী যুগের সাধারণ নিয়ম ছিল যে, আরবের লোকেরা নানা স্থানে আসর জমিয়ে বসতো। তাদের এসব আসরের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় এবং কাব্য চর্চা। এসব কবিতা প্রতিযোগিতায় নারী-পুরুষ সমভাবে অংশ গ্রহণ করতো। এ আসর শুরু হতো রবিউল আউয়াল মাসে অর্থাৎ বসন্তকালের শুরুতে। আরবের দূর-দূরান্ত থেকে কাজ-কর্ম ছেড়ে লোকেরা ছুটে আসতো এসব আসরে অংশ গ্রহণ করার জন্য। রবিউল আউয়াল এর শুরুতে এই মেলা জমতো প্রথমে দুমাতুল জুন্দলে, সেখান থেকে আসতো হিজর-এর বাজারে, পরে ওম্মান এবং হাযরা মাওত এ গমন করতো। সেখান থেকেই ইয়ামান এর ছানআয়। এসব মেলা কোথাও দশ দিন, কোথাও ২০ দিন স্থায়ী হতো। সারা দেশে মেলা শেষে জিলকদ মাসে সর্বশেষ মেলা বসতো ওকায বজারে। পবিত্র হজ্বকে সামনে রেখে মক্কার অদূরে অনুষ্ঠিত এ শেষ মেলায় আরবের সকল সর্দার-গোত্রপতিরা অবশ্যই যোগ দিতো। কোন কারণে কোন গোত্রপতি যোগ দিতে না পারলে তিনি প্রতিনিধি পাঠাতেন। এই শেষ মেলায় আরবদের সব বিষয় চূড়ান্ত করা

হতো। অর্থাৎ এখানেই বিভিন্ন গোত্রের সর্দার নিয়োগ করা হতো, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা হতো, নিজেদের মধ্যকার রক্তপাত এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের মীমাংসা হতো। ওকাযের এই মেলায়। কোরাইশ বংশের মান-মর্যাদা ছিল সবচেয়ে বেশি। সকল বিষয় নিষ্পত্তি হওয়ার পর প্রত্যেক কবীলার কবিরা নিজ নিজ কবিতা শুনাতেন। এসব কবিতায় থাকতো স্ব-স্ব গোত্রের বাহাদুরী, উদারাতা-দানশীলতা, অতিথি পরায়ণতা, পূর্ব পুরুষদের গুরুত্বপূর্ণ কীর্তিগাথা, শিকার এবং রক্তপাতের বর্ণনা। এখানেই কবি এবং বক্তার মর্যাদা নির্ণীত হতো।

মহিলা কবি খানসাও এসব আসর-মেলায় যোগ দিতেন। এসব আসরে পঠিত তার মর্সিয়া কাব্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে স্বীকৃতি লাভ করতো। তিনি উটের পিঠে আরোহণ করে মেলায় উপস্থিত হলে কবিরা এসে তার চারিপাশে জড়ো হতো কবিতা শুনার জন্য। এরপর তিনি মর্সিয়া বা শোকগাথা শুনাতেন। তার তাঁবুর সামনে একটা পতাকায় লেখা থাকতো– أَرْثَى الْعَرْب -আরবের সবচেয়ে বড় শোক গাথা রচয়িতা। এমন গৌরব অন্য কোন কবির ভাগ্যে জুটেনি।

জাহেলী যুগে অনেক বড় বড় কবি ছিলেন। নাবেগা যুব্ইয়ানী ছিলেন এসব নামকরা কবিদের একজন। কাব্যে পান্ডিত্যের জন্য চারিদিকে তার প্রচুর খ্যাতি ছিল। তার আসল নাম ছিল যিয়াদ ইবনে মু'আবিয়া। কুনিয়াত ছিল উমামা। আবূ ওবায়দা তার সম্পর্কে লিখেন ঃ

তিনি ছিলেন, প্রথম পর্যায়ের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য। বেশি কবিতা রচনার জন্য তার লকব বা উপাধী হয়েছে নাবেগা। ওকাযের মেলায় তার জন্য লাল তাবু টানানো হতো। অন্য কেউ এ গৌরব লাভ করতো না। কারণ এ গৌরব ছিল সে কবির হক, কবিতায় যিনি ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত শিক্ষক। তার কবিতা ছিল সূক্ষ্ম তত্ত্ব সমৃদ্ধ। ছিল অপরূপ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। চরিত্রের পরিশুদ্ধিকে তিনি অত্যাবশ্যক মনে করতেন এবং আল্লাহ্র ভয়ে জীবন যাপনকে সর্বোত্তম বিবেচনা করতেন। উদারচিত্ত এ কবি নিজেই

ছিলেন তার কথার প্রমাণ। তার প্রশংসাসূচক কাসীদার নৈপূণ্য, প্রফুল্লছিত্ততা, রকমারিত্ব, সততা এবং ভাষা অলংকারের অনেক দৃষ্টান্ত বর্তমান ছিল। ওকাযের মেলায় নাবেগার সামনে কবিতা আবৃত্তি করে কবিরা তার কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করতো। খানসার কবিতা শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নাবেগা বলেন ঃ

মূলত তুমি নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবি। আমি ইতিপূর্বে এ অন্ধ কবির কবিতা না শুনলে (অর্থাৎ আ'শার কবিতা) অবশ্যই তোমাকে এ যুগের সেরা কবি বলে আখ্যায়িত করতাম এবং বলতাম যে, তুমি সংস্কৃতিমনা অসংস্কৃতমনা সকল কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

দুনিয়ায় অনেক কবি ছিলেন, তারা অনেক নাম-কাম এবং যশোকীর্তিও অর্জন করেছেণ। কিন্তু হাসসান ইবনে সাবিত যে ফযীলত-মর্যাদা লাভ করেছেন তা অন্য কোন কবির ভাগ্যে জুটেনি। যেসব কবি মহানবীর সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম।

কিন্তু বিধাতা হযরত হাসসানকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তা আর কাউকে দেননি। তিনি ছিলেন হযরতের দরবারের কবি। জীবনের ৫৯টি বচর কুফরীর অন্ধকারে কাটিয়ে ৬০ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তার সমস্ত কাব্য প্রতিভা নিয়োজিত করেন ইসলাম এবং মুসলমানদের খেদমতে। অধিকন্তু তার কাসীদায় থাকতো আঁ-হযরতের প্রশংসা, ইসলামের প্রশান্তি, কাফেরদের নিন্দা এবং মহানবীর যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা। তার কবিতা ছিল সাদা-মাটা, লবণাক্ত এবং স্বচ্ছ-শুভ্র।

খানসা সম্পর্কে নাবেগার সিদ্ধান্তে তিনি অত্যন্ত মনক্ষুণ্ন হন[১৩] তিনি নাবেগাকে বলেন, তোমার ফয়সালা মোটেই ঠিক নয়। আমার কবিতা খানসার কবিতার চেয়ে উন্নতমানের। নাবেগার ইঙ্গিতে খানসা বললেন, আপনার শ্রেষ্ঠ কবিতা শুনান দেখি। অতঃপর আমি নিজে তার সমালোচনা করবো। হযরত হাসসান তার এ কবিতাটি শুনান ঃ[১৪]

لَنَا الْجِفَافُ الْغُرُّ يُلْمَعْنَ فِيْ الضُّحَى.

وَاَسْيَافُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ نَحْدَةِ دِمَاءِ

আমাদের আছে বড় বড় বরতন, যা সূর্যালেকে চক চক করে।

আর আমাদের তরবারী অনেক উঁচু থেকে রক্ত ঝরায়।

হযরত হাসসান। তার এ কবিতায় বদান্যতা ও বীরত্বের পরিচয় তুলে ধরেন।

তার এ কবিতার সমালোচনায় হযরত খানসা বলেন ঃ

ক. جِفَافٌ (জেফাফ) বহুবচরে শব্দ হলেও তাতে আধিক্য বুঝায় না, বরং এর স্থানে جِفَانٌ (জেফান) বলা হলে অর্থ আরও ব্যাপক হতো।

খ. غُـــرٌّ (গুররুন) বলা হয় চেহারার চাকচিক্যকে। بِيْضٌ (বীযুন) এর চেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক।

গ. يَلْمَعْنَ (ইয়ালামআন) বলা হয় কৃত্রিম চাকচিক্যকে। এর স্থলে يُشْـــرِقْنَ (ইউশরেকনা) বললে ভালো হতো। কারণ, ইশরাক লামআন এর চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী।

ঘ. ضُـــحى (দুহা)-এর পরিবর্তে دُجـــى (দুজা) বললে ভালো হতো। কারণ অন্ধকারে আলোর মূল্য বেশি হয়।

ঙ. اَسْـــيَافٌ (আসইয়াফ) বহু বচনের শব্দ হলেও তাতে প্রাচুর্য বুঝায় না। এর স্থলে سيوف (সুয়ুফ) শব্দ ব্যবহার করা অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল।

চ. يَقْـــطُرْنَ (ইয়াকতুরনা) এর পরিবর্তে يَسِلْنَ (ইয়াসেলনা) শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক। কারণ, বিন্দু বিন্দু রক্তের প্রবাহ অধিক ক্রিয়া করে।

ছ. دَمٌ (দাম) এর পরিবর্তে دِمَـــاءٌ (দেমা) শব্দের ব্যবহার ভালো হতো। কারণ, এটা বহু বচনের শব্দ। আর দাম এক বচনের।

হযরত হাসসান এ সমালোচনা শুনে চুপ মেরে যান। তিনি এর কোন জবাব দিতে পারেন নি।[১৫]

মোট কথা, কাব্য বিচারে হযরত খানসার স্থান ছিল দ্বিতীয় স্তরের আরব কবিদের মধ্যে সর্বোচ্চ। ১৮৮৮ সালে বৈরুত থেকে তার কবিতার একটি বৃহৎ সংকলন প্রকাশিত হয়। এতে আরও ৬০ জন আরব মহিলা কবির মর্সিয়া কাব্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৮৮৯ সালে-এর ফরাসী অনুবাদ প্রকাশি হয়েছে।

হযরত উমরের শাসনকালে কাদেসিয়ার যুদ্ধ সংগটিত হয়। এ যুদ্ধে ইরানীরা বিপুল শক্তি নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। হযরত খানসা তার চারজন পুত্র সন্তানকে নিয়ে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে রাত্রে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।[১৬] তিনি বলেন ঃ

'আমার প্রিয় সন্তানরা! তোমরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছ, স্বেচ্ছায় হিজরত করেছিলে। সেই অইবনেশ্বর খোদার শপথ, যিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুন নেই। যেমননিভাবে তোমরা মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছ, টিক তেমনিভাবে তোমরা পিতার সত্য সন্তান। আমি তোমাদের পিতার সাথে প্রতারাণা করিনি, তোমাদের মামাকেও লাঞ্ছিত করিনি। তোমাদের বংশধারা নিষ্কলুস, নিষ্কলংক। তোমরা জান, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মধ্যে মুসলমানদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্ পক্ষ থেকে বিরাট সাওয়াব। এ সত্য তোমরা ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করে নেবে যে, অইবনেশ্বর জগতের তুলনায় এ নশ্বর জগত অতি তুচ্ছ, নগন্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِنَ اَمَنُوْا اَصْبِرُوَا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

মুসলমানরা! ধৈর্য ধারণ কর, একে অপরকে ধৈর্যের তালীম দাও এবং সকলে সম্মিলিত থাক এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভে সমর্থ হবে। (আলে ইমরান : ২০০)

তোমরা যখন দেখবে যে, তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়েছে, যুদ্ধের তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে আর তার স্ফূলিঙ্গ চারিদিকে চিক চিক করছে, তখন তোমরা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বে এবং নির্দিধায় তরবারী চালাবে আর অইবনেশ্বর

খোদার নিকট থেকে বিজয় ও সাহায্য প্রত্যাশা করবে। ইনশাআল্লাহ্ পরকালের শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্বে অবশ্যই তোমারা সফলকাম হবে।[১৭]

মায়ের উপদেশ অনুযায়ী ইসলামের এ সূর্য সৈনিকরা প্রত্যুষে রণক্ষেত্রে ঝাপিড়ে পড়ে এবং ইতিহাসের পাতায় শৌর্য-বীর্য আর সাহসিকতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শেষ পর্যন্ত সকলেই শাহাদাত বরণ করেন।[১৮]

হযরত খানসা তাদের শাহাদাত সম্পর্কে জানতে পেরে বলেন, আল্লাহ্র শুকরিয়া, তিনি আমাকে তাদের শাহাদাতের মর্যাদা দিয়েছেন। খোদার নিকট আমার প্রত্যাশা, আমি তার রহমতের ছায়ায় আমার সন্তানদের সাথে মিলিত হবো।[১৯]

হযরত উমর শহীদ সন্তানদের প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক দু'শ দিরহাম বৃত্তি মঞ্জুর করেন।

হযরত খানসা হযরত আয়েশার খেদমতেও হাযির হতেন। তার মাথায় একগাছি পরচুলা বাধা থাকতো। আরবে এটা ছিল শোকের প্রতীক। হযরত আয়েশা বললেন, ইসলামে এটা নিষিদ্ধ। তিনি বললেন, হযরত এতো আমার জানা নেই। কিন্তু আমি যে এটা বেঁধেছি তার একটা বিশেষ কারণ আছে। আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, কি সে বিশেষ কারণ? হযরত খানসা বললেন ঃ

আমার পিতা যার সাথে আমার বিয়ে ঠিক করেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বেহিসেবী, অপব্যয়ী। তাই তিনি আমার এবং তার নিজের সমস্ত সম্পদই জুয়া খেলায় উড়িয়ে দেন। আমি নিঃস্ব হয়ে পড়লে আমার ভাই ছখর তার সমস্ত সম্পদ দু'ভাগ করে এক ভাগ আমাকে দান করেন। আমার স্বামী আবারও অল্প দিনের মধ্যে তা উজাড় করে দিলে আমার ভাই ছখর আমাদের দুঃখ কষ্টের জন্য দুঃখ করে পুনরায় তার সম্পদ দু'ভাগ করে এক ভাগ আমাকে দান করেন। এবার তার বউ তাকে বলে যে, তুমি যে এভাবে খানসাকে সব দিয়ে দিচ্ছ, এটা কতকাল এভাবে চলবে? আর তার স্বামী তো সবই জুয়ার আড্ডায় উড়াজ করে দেবে। ছখর এর জবাবে তার স্ত্রীকে

এই কবিতাটি পড়ে শুনান ঃ[২০] খোদার শপথ, আমি তাকে সম্পদের নিকৃষ্ট অংশ দেবোনা।

সে তো সতী-সাধ্বী, আমার জন্য তার লজ্জাই যথেষ্ট।

আমি মারা গেলে সে (আমার শোকে) তার ওড়না ছিড়বে।

আর চুলের গোছা বানাবে।

তাই ভাই ছখর এর স্মৃতি হিসেবে আমি চুলের এ গোছা বানিয়েছি। কাদেসিয়া যুদ্ধের প্রায় ৭ বৎসর পর ২৪ হিজরীতে হযরত খানসা ইন্তিকাল করেন। বর্ণনা মতে মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ানের শানসকালে কোন বিজন প্রান্তরে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২১]

১. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৪১১, আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৪৫, আল এছাবাহ পৃষ্ঠা ৫৪৯, ২. আদদুররুল মানসুর, পৃষ্ঠা ১১০, তবকাতুশ শুআরা, পৃষ্ঠা ১৯৭, ৩. আদদুররুল মানসুর, পৃষ্ঠা ১১০, ৪. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৪৪১, এছাবাহ ৫৫০, আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৪০, ৫. উসুদুল গাবাহ পৃষ্ঠা ৪৪১, এছাবাহ পৃষ্ঠা ৫৫০, আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৪৫, ৬. উসুদুল গাবাহ, পৃষ্ঠা ৭৪৫, আল-এছাবাহ পৃষ্ঠা ৫৫০, ৭. আদদুররুল মানসুর পৃষ্ঠা ১১০, ৮. উসুদুল গাবাহ ৪৪১, আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৪৫, ৯. উসুদুল গাবাহ, পৃষ্ঠা ৪৪১, ১০. তবকাতুশ শু'আরা পৃষ্ঠা ৭১-৭২, ১১. তবকাতুশ শু'আরা পৃষ্ঠা ১৭২, ১২. আদদুরুল মানসুর পৃষ্ঠা ১১০, ১৩. ঐ, ১৪. ঐ, ১৫. আদুদুররুল মানসুর, পৃষ্ঠা ১১০, ১৬. উসুদুল গাবাহ, পৃষ্ঠা ৫৫১, আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৪৫, ১৭. উসুদুল গাবাহ, পৃষ্ঠা ৪৪২. আল-এস্তী আব পৃষ্ঠা ৭৪৫, আদ-দুররুল মনসুর, পৃষ্ঠা ১১১, আল এছাবাহ, পৃষ্ঠা ৫৫১, ১৮. উসুদুল গাবাহ, আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৪৫, ১৯. উসুদুল গাবাহ, পৃষ্ঠা ৪৪২, আল-এস্তীআব পৃষ্ঠা ৭৪৬, আল-এছাবাহ, পৃষ্ঠা ৫৫২, ২০. ঐ পৃষ্ঠা ৫৫২, আদ দুররুল মানসুর, পৃষ্ঠা ১১১, ২১. আদ-দুররুল মানসুর, পৃষ্ঠা ১১৪।

২৩

হযরত ছফিয়্যা (রাঃ)

হযরত ছফিয়্যা এবং নবীজীর বংশধারা এক। তিনি ছিলেন হযরতের ফুফী এবং আবদুল মোত্তালেবের কন্যা। এ রিশতায় নবীজীর মাতার সৎবোন হালা ইবনেতে ওয়াহাব ছিলেন তার মাতা।[১] জাহেলী যুগে আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে হারব এর সাথে তার বিয়ে হয়। এ পক্ষে একজন পুত্র সন্তানও জন্ম লাভ করে। হারেস এর মৃত্যুর পর আওয়াম ইবনে খুয়াইলেদ-এর সাথে তার বিয়ে হয়। এ সংসারে তিনজন পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে– যুবায়ের, সায়েদ এবং আব্দুল কা'বা।[২]

ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, হযরতের ফুফীদের মধ্যে কেবল হযরত ছফিয়্যা-ই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যদিও ইবনে সা'আদ ইসলাম গ্রহণকারীদের পর্যায়ে হযরত আরওয়া এবং হযরত আতেকা ইত্যাদির নামও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সত্য কথা এই যে, হযরত ছফিয়্যা ছাড়া অন্য কারো ইসলাম গ্রহণ প্রমাণিত হয়নি। এটাই ঐতিহাসিক ইবনে আসীর-এরও সিদ্ধান্ত। এ বৈশিষ্ট্য তার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করেছে। হিজরত সম্পর্কেও কেবল এতটুকুই জানা যায় যে, তিনি হযরত যুবায়ের এর সাথে হিজরত করেন। ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ কেবল এটুকুও উল্লেখ করেছেন هَاجَرَتْ اِلَى الْمَدِيْنَةِ তিনি মদীনায় হিজরত করেন।

তিনি কয়েকটি যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন। খন্দকের যুদ্ধে তার দৃঢ়তা ছিল নারীদের বিস্ময়কর কাজের এক বিরল দৃষ্টান্ত। হযরত (সাঃ) মুজাহিদদেরকে নিয়ে জিহাদে গমনকালে হযরত হাসসান-এর সাথে নারীদেরকে একটি দুর্গে রেখে যান। এ দুর্গকে আতম এবং ফারে'ও বলা হতো। হযরত হাসসানকে এ দুর্গ সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন।

সেখানে নারীরা ছিল এক। কেবল একজন পুরুষ হযরত হাসসানের উপস্থিতি তেমন মঙ্গলকর ছিল না। তাই ইহুদীরা ময়দান খালী দেখে মুসলমানদের অন্যত্র ব্যস্ত থাকার সুযোগ নিতে চেয়েছিল। জনৈক ইহুদী দূর্গের দ্বার পর্যন্ত পৌছে কান পেতে মুসলমানদের কথাবার্তা শুনছিল। উদ্দেশ্য ছিল সুযোগ বুঝে হামলা করা। হযরত ছফিয়্যা ইহুদীকে দেখে ফেলেন। তিনি হযরত হাসসানকে ডেকে বললেন, আসুন, একে হত্যা করি। তিনি জবাবে বললেন, আমার এ ক্ষমতা থাকলে তো নীবীজীর সাথেই যুদ্ধে গমন করতাম। ঘটনা হচ্ছে–হযরত হাস্সান ইতিপূর্বে এক মারাত্মক ব্যধিতে আক্রান্ত হন। ফলে শারীরিক দুর্বলতা ছাড়াও মনের দিক থেকেও তিনি এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, এমন সাহস তার ছিল না। যাই হোক, হযরত হাসসানের এ জবাবে হযরত ছফিয়্যা সাহস হারা হননি। তিনি সাহস করে উঠে তাবুর একটা খুটি তুলে ইহুদীর দিকে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন। ইহুদী মাথায় ভীষণ আঘাত পেলো। আঘাত ছিল প্রচন্ড। তাই সে মারা গেল। হযরত হাসসানকে উদ্দেশ্য করে এবার হযরত ছফিয়্যা বললেন, এবার গিয়ে তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচে ইহুদীদের মধ্যে ছুঁড়ে মারুন। হযরত হাসসান এবারও অক্ষমতা প্রকাশ করেন। অবশেষে এ কাজটিও তাকেই করতে হয়। এতে ইহুদীরা বুঝতে পারে যে, দুর্গে হামলা চালানো তেমন সহজ নয়। মনে হয়, এখানে কিছু মুসলিম বাহিনী নিয়োজিত আছে।[৪]

খন্দক যুদ্ধের আগে ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত ছফিয়্যা ওহোদ যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন। এখানেও তিনি ঈর্ষাযোগ্য সাহসিতকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আফফান ইবনে মুসলেম বর্ণনা করেন যে, কাফেরদের সংখ্যা দেখে মুসলমানরা ঘাবড়ে যায় এবং পলায়নের জন্য উদ্যত হয়। এটা ছিল তাদের এক ধরনের পরাজয়। এ সময় হযরত ছফিয়্যা হাতে বর্ষা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ান। মেরে মেরে তিনি তাদেরকে বারণ করেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বলেন, তোমরা নবীজীকে রেখে পলায়ন করছ? হযরত (সাঃ) তাকে দেখে হযরত যুবায়েরকে ডেকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন হযরত হামযার লাশ দেখতে না পান। কারণ লাশের অবস্থা ছিল করুণ। একজন নারী তাও আবার একই মায়ের গর্ভজাত বোন, তা দেখে সহ্য করতে পারবে না। হযরতের এরশাদ অনুযায়ী হযরত যুবায়ের তার কাছে আসে।

বললেন, আম্মা! হযরত (সাঃ) আপনাকে ফিরে যেতে বলেছেন। তিনি জিজ্ঞেস কররেলন, কেন? আমি শুনেছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করা হয়েছে। খোদা জানেন যে, এ দৃশ্য আমার কাছে অসহ্য। কিন্তু তাহলেও আমি অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করবো। ইনশা আল্লাহ্ আমি সংবরণ করবো। হযরত যুবায়ের নবীজীর খেদমতে হাযির হয়ে হযরত ছফিয়্যার মনোভাব জানালেন। এটা শুনে হযরত তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর হযরত ছফিয়্যা তার সৎভাইয়ের লাশ দেখতে যান। তার বিকৃত-বিচ্ছিন্ন দেহ স্বচক্ষে দেখেন। তিনি নিজেকে এতটা সংবরণ করেন যে, কিছুই বলেননি। কেবল ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন' বলে মাগফিরাতের দোয়া করেন। তিনি চলে গেলে নবীজীর নির্দেশে হযরত হামযার লাশ দাফন করা হয়।[৫]

আদ-দুররুল মানসূর গ্রন্থ রচয়িতা তার সম্পর্কে লিখেন ঃ

كَانَتْ شاعِرَةً فَصِيْحَةً مُتَقَدِّمَةً عِنْدَ جَمِيْعِ الْعَرَبِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالشَّرَفِ وَالْحَسَبِ وَالنَّسَبِ.

তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী মহিলা কবি। কথা ও কাজ এবং মর্যাদা ও অভিজাত্যর বিচারে গোটা আরবের নিকট তিনি ছিলেন বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারীণী।

আব্দুল মোত্তালেবের মৃত্যুতে হযরত ছফিয়্যা স্বীয় বোন এবং বনু হাশেমের অন্যান্য মহিলাদেরকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এতে উপস্থিত প্রায় সকল মহিলা-ই মর্সিয়া পড়ে শুনান। হযরত ছফিয়্যা এ অনুষ্ঠানে যে মর্সিয়া পাঠ করেন, তার কয়েকটি কবিতা ছিল এরূপ:

রাতে ক্রন্দনরত এক মহিলার কান্নার শব্দে আমি জেগে উঠি,

যিনি এক ভদ্র ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করছিলেন।
আর তখন আমার আঁসু পড়ছিল গালের উপর
মুক্তার মতো ক্রমাগত ধারায়।
এমন ভদ্র ব্যক্তির মৃতুতে আফসোস কর। যিনি অপদার্থ ছিলেন না,
দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তার শ্রেষ্ঠত্ব ছিল স্বীকৃত।
তিনি ছিলেন বড় বংশের সন্তান, তার কপাল ছিল প্রশস্ত,

শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্ম্যের অধিকারী।
দুর্ভিক্ষকালে তিনি ছিলেন মানুষের জন্য মেঘমালা।
মানুষ যদি প্রাচীন ঐতিহ্য-আভিজাত্যের কারণে চিরকাল বেঁচে থাকতো!
কিন্তু চিরকাল বেঁচে থাকার তো উপায় নেই।
তাহলে আপন মর্যাদা এবং প্রাচীন শরাফাতের কারণে
তিনি বেঁচে থাকতেন চিরদিন।

হযরত (সাঃ) এর ওফাতে তিনি যে মর্সিয়া পাঠ করেন, তার কয়েকটি কবিতা ছিল নিম্নরূপঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ছিলেন আমাদের আশা-আকাংখা।
আপনি ছিলেন আমাদর প্রতি অনুগ্রহ, যালেম ছিলেন না আপনি।
আপনি ছিলেন রহমদিল, হাদী, শিক্ষক।
আজ সকল রোদনকারীর উচিৎ
আপনার জন্য রোদন করা।
আমার মাতা, খালা, চাচা এবং মামা রাসূলে খোদার জন্য কোরবান।
অতঃপর আমি নিজে এবং আমার অর্থ সম্পদও তার জন্য কোরবান।
মানুষের ব যদি তাকে আমাদের মধ্যে চিরঞ্জীব করে রাখতেন,
তবে আমরা কতনা ভাগ্যবান হতাম।
কিন্তু তার নির্দেশ তো কার্যকর হয়ে থাকে।
আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সালাম অভিবাদন।
আর আপনাকে স্থান দেয়া হোক জান্নাতে আদন-এ্

বীরত্ব গাথা রচনায়ও তার কাব্য প্রতিভা অকিঞ্চিৎকর ছিল না। এক্ষেত্রে বীরত্ব গাথা রচয়িতা কবিদের সকল বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। উদাহারণ স্বরূপ বলা যায়,

কেউ আছে কি, যে আমার পক্ষ থেকে কোরাইশকে জানিয়ে দেবে যে,
তোমরা কোন ব্যাপারে আমাদর ওপর কর্তৃত্ব কর।
তোমরাতো জান যে, আমাদের বুজুর্গরা অনেক প্রবীণ-প্রাচীন।
তোমরা এটাও জান যে, আমাদের জন্য
নিকট থেকে কখনো আগুন জ্বলেনি।
আমাদের মধ্যে ভালো লোকের সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে।
যদিও কোন কোন চরিত্রের ভিত্তি হচ্ছে লাজ্জা-অমর্যাদা।[৬]

হাফেজ ইবনে হাজার আল-এছাবায় হযরত হামযার মর্সিয়া প্রসঙ্গে হযরত ছফিয়্যার একটা কবিতা উল্লেখ করেছেন। এ কবিতা থেকেও তার কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে আঁচ করা যায়। এতে তিনি হযরত (সাঃ) কে সম্বোধন করে বলেন ঃ

انَّ يَوْمًا اَتى عَلَيْكَ لَيَوْمٌ.

كُوِّرَتْ شَمْسُهُ وَكَانَ مُضِيْئًا.

– আজ আপনার উপর এমন দিন অর্পিত হয়েছে, যাতে সূর্য মলীন হয়ে পড়েছে।

অথচ ইতিপূর্বে তো তা আলোকোজ্জ্বল ছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিকের[৭] মতে হযরত ছফিয়্যা থেকে কয়েকটি হাদীসও বর্ণিত আছে। কিন্তু এ উক্তি প্রমাণসিদ্ধ নয়।

হযরত উমরের শাসনকালে হিজরী ২০ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে হযরত ছফিয়্যা ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে হযরত মুগীরা ইবনে শোবার পাশে তাকে দাফন করা হয়।

১. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৯২, ২. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৭, ৩. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৯, ৪ আল-এছাবা, ২য় ও ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৬৭১. ৫. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা৪২৯, ৬. আদ-দুররুল মানসুর ২৬১-২৬২ পৃষ্ঠা থেকে কবিতাগুলো সংকলিত হয়েছে. ৭. আল এছাবাহ ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৭২।

২৪

হযরত ফাতিমা (রা:) বিনতে আসাদ

হযরত ফাতিমার পিতার নাম আসাদ ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ। যেহেতু তিনি হাশেমী বংশের কন্যা, তাই বংশ সম্পর্কে আর বেশি আলোচনার প্রয়োজন নেই।[১] আবূ তালেব ইবনে আব্দুল মোত্তালেবের সাথে তার বিয়ে হয়। তার ঔরসেরই হযরত আলীর (রা:) জন্ম হয়। আল্লামা ইবনে আবদুল বার এ সম্পর্কে লিখেন,

তিনি হচ্ছেন হাশেমী বংশের প্রথম মহিলা, যার গর্ভে হাশেমী সন্তানের জন্ম হয়েছে।[২]

হযরত (সা:) আরববাসীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলে সমস্ত কবীলার মধ্যে বনু হাশেম অগ্রবর্তী ছিল। এ কবীলায় প্রায় সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ফাতিমাও তাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি নিজেও ইসলাম কবুল করেন। তার কোন কোন সন্তানও ইসলাম গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ইসলামের সাথে হিজরতেরও মর্যাদা দেন। তিনি যখন মদীনা শরীফ গমন করেন, তখন হযরত আলীর (রা:) সাথে হযরত ফাতিমার বিয়ে হয়। আহলে বায়তের জীবন ছিল দুনিয়ার জৌলুশ মুক্ত, একেবারে সাদা সিধে। তাই তারা নিজেরাই ঘরের সমস্ত কাজকর্ম করতেন। চাকর-নকর, দাস-দাসীর নাম-গন্ধও ছিল না। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা:) তার মাতাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

كَفِى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ سِقَايَةَ الْمَاءِ وَالذَهَابُ فِى الْحَاجَةِ وَيَلْفك الدَّاخِلَ الطَّحْنَ وَالْعَجْنَ.

আমি পানি তুলবো আর বাইরের কাজ কর্ম করবো। আর ফাতিমা ইবনেতে রাসূলাল্লাহ চাক্কী পিষবে এবং আটা খামীর করার কাজে আপনাকে সাহায্য করবে।[৩]

তিনি ছিলেন অত্যন্ত নেক মেযাজ এবং শরীফ অভ্যাসের মহিলা। রাসূলে খোদা তার প্রশংসা করতেন। তার ইন্তিকালের পর হযরত (সা:) বলেন ঃ

لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ بَعْدَ اَبِىْ طَالِب اَبَرَّبِىْ مِنْهَا.

আবূ তালেবের পর আমার প্রতি তার চেয়ে বড় মেহেরবান আর কেউ ছিল না।[৪]

হযরত (সা:) অধিকন্তু তার ঘরে বিশ্রাম নিতেন এবং তাকে দেখতে যেতেন।[৫]

তালেব, আকীল, জাফর এবং আলী ছিলেন তার পুত্র সন্তান এবং উম্মে হানী, হামানা ও রাবতা ছিলেন তার কন্যা সন্তান।[৬]

কারো কারো ধারণা, হিজরতের পূর্বেই তার ইন্তিকাল হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা অমূলক। হিজরতের পরেই তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে। হযরত (সা:) আপন জামা দিয়ে তাকে কাফন পরান এবং তাকে দাফন করার পর তার সাথে কবরে শুয়ে পড়েন। লোকেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আবূ তালেবের পর তার চেয়ে বেশি দয়া আমার প্রতি কেউ দেখায়নি। এ কারণে আমি তাকে আমার জামা পরিয়েছি, যাতে জান্নাতে তাকে বেহেশতী লেবাস পরান হয় আর তার সাথে কবরে শুয়েছি, যাতে তার কবরের কষ্ট লাঘব হয়।[৭]

আদ-দুররুল মানসূর গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

وَفَاطِمَةُ هذه لَهَا فَضَائِلُ مَشْهُوْرَةٌ وَمَاثِرُ مَشْكُوْرَةٌ مَذْكُوْرَةٌ فِىْ كُتُبِ التَّارِيْخِ.

তিনি হচ্ছেন সেই ফাতিমা, যার বিশিষ্ট ফযীলত-মর্যাদার কথা ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৮]

১. আল-এস্তীআব, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৭৪, ২. ঐ. ৩. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫১৭. ৪. আল-এস্তীআব. ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৭৪, তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৬১, ৬. ঐ, ৭. আল-এস্তীআব. ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৭৪. উসুদুল গাবাহ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য, ৮. আদ-দুররুল মানসুর. পৃষ্ঠা ৩৫৯।

২৫

হযরত উম্মে আয়মান (রাঃ)

তার আসল নাম বারাকা, উম্মে আয়মান কুনিয়াত। তার বংশধারা হচ্ছে, বারাকাহ ইবনেতে সা'লাবা ইবনে আমর ইবনে হেছন ইবনে মালেক ইবনে সালমা ইবনে আমর ইবনে নুমান। তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী এবং নবীজীর পিতা হযরত আবদুল্লাহ্র অন্যতম দাসী। হযরত আবদুল্লাহর ইন্তিকালের পর তিনি নবীজীর মাতা বিবি আমেনার সাথে বসবাস করেন। নবীজীর দেখা-শুনা লালন-পালনের দায়িত্ব অনেকাংশে তার উপর ছিল। নবীজী বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ওয়ারিশ সূত্রে ইনি তার ভাগে পড়েন।[১]

বনু হারেস ইবনে খাযরাজ গোত্রে ওবায়েদ ইবনে যায়েদ নামের এক ব্যক্তি তার স্বামী ছিলেন। হোনাইনের যুদ্ধে হযরত ওবায়েদ শহীদ হলে হযরত (রাঃ) যায়েদ ইবনে হারেসার সাথে তাকে বিয়ে দেন। হযরত উম্মে আয়মানের এ বিয়ে হয় নবুওয়্যাতের পরে।[২] তার প্রথম স্বামীও মুসলমান ছিলেন আর দ্বিতীয় স্বামীতো মুসলমানের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন। কারণ, তিনি ছিলেন হযরতের আজাদকৃত প্রিয় গোলাম। সত্যকথা এই যে, ইসলামের কোলেই তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন।

যেসব মুসলমান দু'দফা হিজরত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। অর্থাৎ প্রথমে মক্কা থেকে হাবশা হিজরত করেন, পরে সেখানে থেকে মদীনায় হিজরত করেন। ওহোদ এবং খায়বর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত উম্মে আয়মান ওহোদ যুদ্ধে পানি পান করানো এবং রুগীর সেবা করার দায়িত্ব পালন করেন।[৩]

হযরত (সাঃ) কখনো কখনো তার সাথে কৌতুকও করতেন। একবার হযরত উম্মে আয়মান নবীজীর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, আমাকে সওয়ার করুন। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে উটের বাচ্চার পিঠে

সওয়ার করাবো? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উটের বাচ্চাতো আমার ভার সইতে পারবে না। আমি তো আপনার কাছে তা চাচ্ছিনা। হযরত বললেন, আমি তো উটের বাচ্চার পিঠেই সওয়ার করাবো। (সব উটইতো কোন না কো উটের বাচ্চা) এই ছিল নবীজীর কৌতুক, যাতে মিথ্যা এবং অতিরঞ্জনের নাম-গন্ধও ছিল না। আর এই ছিল নবীজীর মযাক, যে সম্পর্কে মুহাদ্দেসীনরা একমত হয়ে বলেন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَمْزَحُ وَلَايَقُوْلُ الاَّحَقًّا.

রাসূলাল্লাহ (সাঃ) হাসি-কৌতুক করতেন, কিন্তু সত্য ছাড়া কিছুই বলতেন না।

নবীজীর ইন্তিকালে হযরত উম্মে আয়মান অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং ক্রন্দন করেন। লোকেরা বুঝালে তিনি বলেন, আমি জানতাম যে, রাসূলকে হারাতে হবে। কিন্তু আমি কাঁদছি এজন্য যে, এখন আমাদের কাছে আসমান থেকে ওহী আসার ধারা বন্ধ হয়ে গেছে।[৪] ছহীহ মুসলিমে উল্লেখ আছে যে, এ সময় হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আল্লাহর নিকট নবীজীর জন্য উত্তম বস্তু বর্তমান রয়েছে। তিনি বললেন, তা আমি ভালো করেই জানি। এটা আমার কান্নার কারণ নয়। আসল কারণ হচ্ছে এ যে, এখন ওহীর ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। তার এ জবাব এতটা কার্যকর ছিল যে, হযরত আবূ বকর এবং হযরত উমরও চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেন।[৫]

হযরত উমর শহীদ হলে হযরত উম্মে আয়ামন কেঁদে বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ وَهَنَ الْاِسْلَامُ —আজ ইসলাম দুর্বল হয়ে পড়েছে।

নবীজীর নিকট আনছারদের দান করা অনেক খেজুর বাগান ছিল। বনু কোরায়যা এবং বনু নযীর-এর উপর বিজয় অর্জিত হওয়ার পর তিনি এসব বাগান ফেরত দেয়া শুরু করেন। এর মধ্যে কিছু বাগান হযরত আনাস ইবনে মালেকেরও ছিল। তিনি এসব বাগান হযরত উম্মে আয়মানকে দান করেন। হযরত আনাস এলে হযরত উম্মে আয়মান এসব বাগান ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। নবীজী তার এ অবস্থা দেখে তাকে বাগানের চেয়ে দশগুণ বেশি দান করেন।[৬]

হযরত (সা:) তার অনেক প্রশংসা করতেন। অধিকন্তু তার গৃহে যেতেন এবং আম্মী বলে ডাকতেন। তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলতেন ঃ

আমার আহলে বায়তের সর্বশেষ অংশ।[৭]

ওবায়েদ ইবনে যায়েদ-এর ইন্তিকালে হযরত (সা:) বলেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَتَزَوَّجْ اُمَّ اَيْمَنَ.

যে ব্যক্তি জান্নাতী নারী বিয়ে করতে চায়, তার উচিত উম্মে আয়মানকে বিয়ে করা।[৮]

একবার নবীজী উম্মে আয়মানের গৃহে তাশরীফ নিলে তিনি শরবত পান করতে দেন। তিনি সেদিন রোযা রেখেছিলেন, তাই ইতস্তত করেন। এতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন।[৯] হয়তো তার জানা ছিল না এবং নবীজীও প্রকাশ করা দরকার মনে করেন নি।

হযরত উম্মে আয়মান হাদীসও বর্ণনা করেছেন। যে সব বুযুর্গ তার সিলসিলায় হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বর্ণিত হলো ঃ

হযরত আনাস ইবনে মালেক, হানাশ ইবনে আবদুল্লাহ্ চানআনী এবং আবূ ইয়াযীদ মাদানী।

তার সন্তানদের মধ্যে প্রথম স্বামীর পক্ষে ছিলেন আয়মান এবং দ্বিতীয় স্বামীর পক্ষে ছিলেন উসামা। এরা উভয়েই সাহাবী ছিলেন।

হযরত ওসমান (রা:) এর শাসনামলে তিনি ইন্তিকাল করেন। ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর এর মতে নবীজীর পাঁচ ছয়মাস পরে তিনি ইন্তিকাল করেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। তিনি হযরত ওসমান (রা:) এর শাসনকালে ইন্তিকাল করেন, এটাই সত্য।[১০]

১. উসদুল গাবাহ, সহীহ মুসলিম ইত্যাদি; ২. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৬৩, ৩. ঐ, ৪. ঐ, ৫. ঐ, ৬. ছহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪১, ৭. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৬৪, ৮. ছহীহ বুখারী, তবকাত ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩. ৯. ছহীহ মুসলিম ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৪১. ১০. তবকাত, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৪।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ)

তার নাম আসমা, কুনিয়াত উম্মে সালমা। বংশধারা হচ্ছে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে আসকান ইবনে রাফে' ইবনে ইমরাউল কাসীর ইবনে যায়েদ ইবনে আবদুল আশহাল ইবনে জসম ইবনে হারেস ইবনে খাযরাজ ইবনে আমর ইবনে মালেক ইবনে আওস।[১]

তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কেবল এতটুকুই জানা যায় যে, তিনি হিজরতের পর মুসলমান হয়েছে। অবশ্য বায়আত সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। ইসলাম গ্রহণের পরপরই তার বায়আত হয়। নবীজী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দ্বীপ্তিমান ছিলেন। এ সময় হযরত আসমা হাযির হয়ে নিম্নোক্ত বক্তব্য রাখেন ঃ

আল্লাহ্‌র রাসূলের জন্য আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক। আমি মুসলিম নারীদের পক্ষ থেকে পয়গাম নিয়ে এসেছি। আল্লাহ্ তা'আলা নারী পুরুষ সকলের হেদায়াতের জন্য আপনাকে প্রেরণ করেছেন। আমরা আপনার অনুসারী, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আমাদের এবং পুরুষদের অবস্থান মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আমরা ঘরের চৌহদ্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি। সন্তানের লালন-পালনে হাজির হতে পার। হজ্বে যেতে পার, সব চেয়ে বড় কথা, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতে পার। এসব অবস্থায় আমরা তোমাদের সন্তানদের লালন পালন করি। তোমাদের মালের হেফাযত করি। কাপড়ের জন্য চরকায় সূতা কাটি। আমরা কি তোমাদের সাথে এসব পুণ্যের অংশীদার হব না?

হযরত (সাঃ) তার বক্তব্য শুনে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে করে বললেন, দ্বীন সম্পর্কে তোমরা কি কোন নারীর মুখে এমন বক্তব্য শুনেছ? সকলে বললেন, একজন নারী এমন প্রশ্ন করতে পারে, তা আমরা ধারণাও

করিনি। তিনি হযরত আসমাকে লক্ষ্য করে বললেন, নারী যদি স্বামীর সন্তুষ্টি বিধান এবং আনুগত্য করে এবং স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে তবে সেও পুরুষের সমান পুণ্য লাভ করবে।[২]

হযরত আসমার নেতৃত্বাধীন নারীদের এ প্রতিনিধি দলে তার খালাও ছিল। তার হাতে ছিল সোনার কাকন এবং আংটি। নবীজী জিজ্ঞেস করেন, এ অলংকারের যাকাত দাও? বললেন, না। তবে তুমি কি পছন্দ কর যে, খোদা তোমাকে আগুনের কাকন এবং আংটি পরান? হযরত আসমা তার খালাকে বললেন, খালা! এসব খুলে ফেলুন। তখনই তিনি সব খুলে ফেলে দেন। অতঃপর হযরত আসমা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা অলংকার না পরলে স্বামীর দৃষ্টিতে মূল্যহীনা হয়ে যাবো। হযরত বললেন, তবে তোমার রূপোর অলংকার পরবে আর তাতে জাফরান ঘষে নেবে যাতে স্বর্ণের চাকচিক্য সৃষ্টি হয়। এসব কথার পর বায়আতের সময় এলে নবীজী কতিপয় অঙ্গীকার করান। হযরত আসমা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার কাছে বায়আত করছি। আপনি হাত প্রসারিত করুন। হযরত বললেন, আমি নারীদের সাথে হাত মিলাই না।[৩]

অধিকন্তু তিনি নবীজীর দরবারে উপস্থিত থাকতেন। হযরত (সাঃ) একবার তার উপস্থিতিতে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ শুনে তার কান্নার রোল পড়ে যায়। নবীজী উঠে চলে চান। পুনরায় ফিরে এসে দেখেন, তার একই অবস্থা। বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? হযরত আসমা বললেন, আমাদের অবস্থাতো এই যে, দাসী আটা মলতে বসেছে, আমাদের ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। সে রুটি তৈয়ার করে আনার আগেই আমরা অস্থির হয়ে উঠি। দাজ্জালের যমানায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, তখন কিভাবে ধৈর্য ধারণ করবো? হযরত বললেন, সেদিন তাসবীহ ও তাকবীর অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার ক্ষিধে থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর বললেন, কান্নাকাটির কোন প্রয়োজন নেই। তখন পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকলে তোমাদের হেফাযত করবো, অন্যথায় আমার আল্লাহ্ সকল মুসলমানকে হেফাযত করবেন।[৪]

বিয়ের পর হযরত আয়েশাকে ঘরে তুলে নেয়ার সময় যেসব মহিলা তাকে সাজিয়ে দেন, তাদের মধ্যে হযরত আসমাও ছিলেন। হযরত আয়েশাকে বাইরে বসিয়ে নবীজীকে খবর দেয়া হয়। তিনি এসে হযরত আয়েশার পাশে বসলে তাকে দুধ পান করতে দেয়া হয়। তিনি একটু পান করে হযরত আয়েশাকে দেন। হযরত আয়েশা লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখলে

হযরত আসমা তাকে ধমক দিয়ে বলেন, রাসূল যা কিছু দেন, তা গ্রহণ করবে। হযরত আয়েশা একটুখানি পান করে নবীজীকে ফেরত দেন। তিনি আসমাকে দেন। হযরত আসমা হাটুর উপরে পেয়ালা রেখে নাড়া দেন, যাতে যেদিক থেকে নবীজী পান করেছেন, তিনিও সেদিক থেকে পান করতে পারেন। এরপর নবীজী বললেন, অন্যান্য নারীদেরকে দাও। তারা সকলে বলে, আমাদের চাহিদা নেই। হযরত বললেন, ক্ষুধার সাথে মিথ্যাও আছে।[৫]

১৫ হিজরীতে ইয়ারমুক যুদ্ধে হযরত আসমা তাঁবুর খুটির আঘাতে নয়জন রোমককে হত্যা করে বীরত্বের এক অনন্য দৃস্টান্ত স্থাপন করেন।[৬]

আল্লামা ইবনে আব্দুল বা'র তার সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

তিনি দ্বীনদারী এবং প্রজ্ঞা উভয় গুণে ভূষিথ ছিলেন। অতিথি সেবায় তিনি ছিলেন বিশিষ্ট। শাহার ইবনে হাওশাব তার গৃহে এলে তার সামনে খাবার পেশ করা হয় তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে নবীজী একটা ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, এখনতো আর স্বীকার করবে না? শাহার বললেন, আসমা! এখন তো আর ভুল হবে না।[৭] তিনি নবীজীর খুব বেশি খেদমত করতেন। একবার তিনি উটের রশি ধরর দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় ওহী নাযিল হয়। তিনি বলেন, ওহীর ওজন এত বেশি ছিল যে, আমার আশংকা হয়েছিল, যেন উটের হাত-পা ভেঙ্গে না যায়।[৮]

কয়েকটি হাদীস বর্ণনা তার ফযীলত-মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। বর্ণনাকারীদের নাম হচ্ছে, শাহার ইবনে হাওশাব, মাহমুদ ইবনে ওমর আনছারী, মুহাজির ইবনে আবূ মুসলিম, মুজাহেদ, ইসহাক ইবনে রাশেদ। অধিক বর্ণনার বিচারে শাহার ইবনে হাওশাব ছিলেন এদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।

তার সন্তানাদী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তার মৃত্যুকাল সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে, ইয়ারমুক যুদ্ধের পরও অনেক দিন তিনি জীবিত ছিলেন।

১. এস্তীআব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭২৬, ২. উসুদুল গাবাহ, ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩২৯, ৩. মুসনাদে আহমদ পৃষ্ঠা ৪৫৩-৫৪, ৪৬০-৬১, ৪. মুসনাদে আহমাদ, পৃষ্ঠা ৪৫৩, ৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৫৪, ৪৫৮ ও ৪৬১, ৬. আল-এছাবাহ, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩, ৭. এস্তীআব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭২৬, ৮. মুসনাদ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৪৫৮।

২৭

হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ)

তার আসল নাম নাসীবা। কিন্তু আরবের রেওয়াজ অনুযায়ী নামের চেয়ে তার কুনিয়াত বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি ছিলেন আনসারী মহিলা। খাযরাজ কবীলার নেজার বংশের সাথে তার বংশ সম্পৃক্ত ছিল। বংশধারা এই, নাসীবা বিনতে কা'আব ইবনে আওফ ইবনে মাবযুল ইবনে আমর ইবনে গানাম ইবনে মায়েন ইবনে নেজার।[১] হিজরতের প্রায় ৪০ বছর আগে মদীনায় তার জন্ম হয়।

চাচাতো ভাই যায়েদ ইবনে আছেম-এর সাথে তার প্রথম বিয়ে হয়। এ পক্ষে দু'জন পুত্র জন্ম গ্রহণ করে- আব্দুল্লাহ্ ও রাজীব। যায়েদ-এর ইন্তিকালের পর আরবা ইবনে আমর-এর সাথে তার দ্বিতীয় বিয়ে হয়। এ পক্ষে এক পুত্র সন্তান তামীম এবং এক কন্যা সন্তান খাওলা জন্ম গ্রহণ করে।[২]

ইসলাম তখনও আপন পায়ে দাঁড়ায়নি, সত্য ও ন্যায়ের আওয়াজের সাথে দুনিয়া তখনও পরিচিত হয়নি; হযরত (সাঃ) অবিরাম চেষ্টায় নিয়োজিত। শেষ পর্যন্ত তিনি মক্কাবাসীদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি আল্লাহ্র রহমত সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন, তাই ইসলামের প্রচার কার্য অব্যাহত রাখেন। এ সময় মদীনার ৬ জন লোক নবীজীর দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তী বছর আরও ৬ জন লোক যোগ দেয়। হযরত (সাঃ) বার জনের এ ক্ষুদে মুসলিম দলের সাথে হযরত মুছআব ইবনে উমাইরকে ইসলাম প্রচারের জন্য মদীনায় প্রেরণ করেন। এ ক্ষুদে নিবেদিতপ্রাণ ইসলামী দলের চেষ্টায় মদীনার অনেক বড় লোক

ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত উম্মে আম্মারা এবং তার পরিবার এদের মধ্যে ছিল। এমনিভাবে ইসলাম গ্রহণের ফলে হযরত উম্মে আম্মারা দু'টি মর্যাদা লাভ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম, দ্বিতীয়ত: তিনি ছিলেন আনসারী মহিলা।

হযরত উম্মে আম্মারার জীবনের প্রথম স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে আকাবার বায়আতে অংশ গ্রহণ। আকাবা বলা হয় ঘাটিকে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো এই যে, ইসলামের ক্রমবিকাশের তৃতীয় বর্ষে মদীনার আনুমানিক ৭৫ জন মুসলমানের একটি দল নবীজীর সাথে সাক্ষাত করার জন্য মক্কায় রওয়ানা হয়। হজ্বের দু'তিন দিন পর একটি পাহাড়ী ঘাটিত রাতের শেষ প্রহরে তারা নবীজীর সাথে মিলিত হয়ে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটা আকাবার বায়আত বলে খ্যাত ও পরিচিত। তারা শপথ আর প্রতিজ্ঞা করে বলেন, আপনি মদীনা আগমন করুন। আমরা জান-মাল-আওলাদ সবই আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্যের জন্য উৎসর্গ করবো। এদের মধ্যে দু'জন নারীও আম্মারার স্বামী আরাবা ইবনে আমর এ সময় দু'জন মহিলাকে ডেকে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ দু'জন নারীও আমাদের সাথে বায়আতের জন্য জন্য হাযির হয়েছে। নবীজী বললেন, যে প্রতিজ্ঞায় আমি তোমাদের বায়আত গ্রহণ করেছি, সে প্রতিজ্ঞায় তাদেরও বায়আত গ্রহণ করছি। হাত মিলানোর প্রয়োজন নেই। আমি নারীদের সাথে হাত মিলাই না।[৩]

এ নাজুক মুহূর্তের আগে অর্থাৎ যখন মুসলমানরা বিজয়ের পথে ছিল এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিপুল বিক্রমে দুশমনের মুকাবিলা করছিল, তখনও উম্মে আম্মারা অলস অবস্থায় বসেছিলেন না। তিনি মশকে পানি নিয়ে মুজাহিদদেরকে পান করাতেন। আর এখন এ নাজুক মুহূর্তে নবীজীর হেফাযতের জন্য একেবারে বুক পেতে দিয়েছেন। কাফেরদেরকে অগ্রসর হতে দেখলে তিনি তীর-তরবারী দিয়ে প্রতিহত করতেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজে বলেন, আমি ঢাল দিয়ে দুশমনদের হামলা প্রতিহত করতাম। আমি

এ কৌশল অবলম্বন করতাম যে, কোন সওয়ার হামলা করলে আমি ঠেকাতাম। আর সামনে অগ্রসর হলে আমি পেছনে থেকে এমনভাবে হামলা করতাম যে, ঘোড়সওয়ারসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়তো। এ অবস্থা দেখে হযরত (সাঃ) আমার ছেলে আব্দুল্লাহ্‌কে ডেকে আমার সাহায্যে নিয়োজিত করেন। আমরা উভয়ে মিলে তখনই অশ্বারোহী কাফেরদের কর্ম সারা করতাম।[৫]

এ যুদ্ধে হযরত উম্মে আম্মারার বীরত্বপূর্ণ সেবার আলোচনা উঠলে নবীজী বলতেন, আমি ওহোদ যুদ্ধে তাকে সব সময় আমার ডানে-বাঁয়ে যুদ্ধ করতে দেখেছি। যুদ্ধ তখনও থামেনি। কাফেররা বিপুল বিক্রমে হামলা চালাচ্ছে। একজন কাফেরের পাথরের আঘাতে নবীজী দান্দান মুবারক শহীদ হয়। ইতিমধ্যে ইবনে কেমইয়া তরবারী দিয়ে আক্রমণ করে। নবীজী চেহারা মুবারকে আঘাত পান। দরদর করে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। উম্মে আম্মারা এ অবস্থা দেখে মরিয়া হয়ে ইবনে কেমইরিয়ার ওপর আঘাত হানেন। কিন্তু এর কোন ফল হয়নি। কারণ, তার পরিধানে ছিল লৌহ নির্মিত বিশেষ পোশাক। এরপর সে তরবারী দিয়ে আঘাত হানলে তার কাঁধে তরবারী বিদ্ধ হয় এবং তিনি মাটিতে পড়ে যান।[৬] ইবনে কেম্‌ইয়া পলায়ন করে, কিন্তু উম্মে আম্মারা ভীষণ আঘাত পান। তার দেহ রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে। হযরত (সাঃ) সামনে উপস্থিত থেকে উম্মে আম্মারার ক্ষত স্থানে পট্টি বাঁধান। তিনি কয়েকজন বীর সাহাবীর নাম উল্লেখ করে বলেন, খোদার কসম, আজ উম্মে আম্মারার অবদান এদের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। উম্মে আম্মারা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য দোয়া করুন, যাতে আমি জান্নাতে আপনার সাথী হতে পারি। নবীজী দোয়া করলে তিনি বলেন ঃ مَاأُبَالِىْ مَا اَصَابَنِىْ مِنَ الدُّنْيَا.

এখন দুনিয়ার কোন বিপদেরই আমি আর পরওয়া করি না।[৭] এ যুদ্ধে তিনি এমন মরিয়া হয়ে অংশ গ্রহণ করেন যে, তার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ আহত

হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে তিনি নিজ হাতে পট্টি বেঁধে বললেন, হে বৎস! এবার যাও, লড়াই কর।

নবীজী বললেন, উম্মে আম্মারা! তোমার মধ্যে যে ক্ষমতা আছে, তা আর কার মধ্যে থাকতে পারে?[৮] হযরত (সা:) তার খেদমতের এতটা মূল্য দিতেন যে, যুদ্ধ শেষে সকলে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে কা'আব মাযেনীকে পাঠিয়ে তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হয়ে তিনি গৃহে ফিরে যাননি[৯] অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য জীবন চরিতকার লিখেন, হযরত উম্মে আম্মারা ওহোদ যুদ্ধ ছাড়াও হোদায়বিয়া, খায়বর এবং হোনাইনের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন এবং নবীজীর সঙ্গে ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ বলেন ঃ

وَشَهِدَتْ اُحُدًا وَالْحُدَيْبِيَةَ وَخَيْبَرَ وَعُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ وحُنَيْنًا وَيَوْمَ الْيَمَامَةَ.

তিনি ওহোদ, হোদায়বিয়া, ওমরাতুল কাযা, হোনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন।[১০]

এখানে ইয়ামামার যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে–

নবীজীর ওফাতের পর ইয়ামামার সর্দার মুসাইলামা কাযযাব মোর্তাদ হয়ে যায়। সে ছিল বড় যালেম এবং বিরাট প্রভাবশালী ব্যক্তি। তার কবীলার প্রায় চল্লিশ হাজার লোক ছিল যুদ্ধ করার মতো। এরা সকলেই তাকে সমর্থন করে। আপন শক্তি বলে মদমত্ত হয়ে সে নবী হওয়ার দাবি করে বসে এবং জোর পূর্বক সকলের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে শুরু করে। তাকে নবী বলে স্বীকার না করলে নানা প্রকার নির্যাতন চালাতো। হযরত উম্মে আম্মারার পুত্র হাবীব ইবনে যায়েদ মদীনা থেকে ফেরার পথে মুসাইলামার হাতে পড়েন। সে তাকে কাবু করে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি বললেন হ্যাঁ, সে বললো, না, বরং তুমি সাক্ষ্য দাও যে, মুসাইলামা আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি কঠোরভাবে অস্বীকার করলে তার একটা হাত কেটে ফেলে। পুনরায়

অস্বীকার করলে অপর হাতটি কেটে ফেলে। মোটকথা, সে তার এক একটি অঙ্গ কেটে ফেলে। কিন্তু তিনি প্রাণের বিনিময়েও সত্য ত্যাগ করেননি।

হযরত উম্মে আম্মারা এ ঘটনা শুনে বুকে পাথর বেঁধে ধৈর্য ধারণ করেন এবং প্রতিজ্ঞা করে বলেন যে, মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে কোন বাহিনী পরিচালিত করলে আমি আপন তরবারীর আঘাতে তাকে হত্যা করবো ইনশাআল্লাহ্।[১১]

মুসাইলামার এসব বাড়াবাড়ি সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রাঃ) জানতে পেরে রিদ্দার ফেৎনার মূলোৎপাটনের জন্য তিনি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে ৪ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। উম্মে আম্মারা এটাকে এক মোক্ষম সুযোগ মনে করে খলীফাতুল মুসলেমীনের অনুমতি নিয়ে সৈন্য বাহিনীর সাথে গমন করেন। উভয় সৈন্য বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। মুসাইলামার বাহিনীর বীর বিক্রমে লড়াই করে। ১২ শত মুসলমান শহীদ হন। কিন্তু সত্য চির উন্নত থাকে। অনেক কাফের নিহত হয়। ইতিহাস গ্রন্থের এদের সংখ্যা ৮/৯ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সংঘর্ষকালে হযরত উম্মে আম্মারা মুসাইলামাকে দেখে ফেলেন। বর্শা এবং তরবারী চালনা করে সারী ভেদ করে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে তিনি মুসাইলামার নিকটে পৌঁছেন। এ সময় তার দেহে বর্শা এবং তরবারীর ১১টি আঘাত লাগে। কনুই পর্যন্ত একটা হাতও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তার ধৈর্যে এতটুকুও ফাটল ধরেনি। মুসাইলামার উপর আঘাত হানার জন্য তিনি সম্মুখে অগ্রসর হন। এসময় এক সঙ্গে দুটি তরবারীর আঘাত পড়ে মুসাইলামার উপর। আঘাত হানার জন্য তিনি সম্মুখে অগ্রসর হন। এসময় এক সঙ্গে দুটি তরবারীর আঘাত পড়ে মুসাইলামার দেহে। সে আহত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যায়। তিনি ভালোভাবে তাকিয়ে দেখেন, পুত্র আবদুল্লাহ পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পাপীকে হত্যা করেছে? জবাবে তিনি বললেন, এক তরবারী আমার পড়েছে

আর এক তরবারী ওয়াহশীর। জানিনা, কার তরবারীর আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুতে উম্মে আম্মারা অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তখনই শুকরিয়ার সিজদা আদায় করেন।

তিনি যেহেতু ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন, একটা হাতও কেটে গিয়েছিল, খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। সিপাহসালার হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদও তার বীরত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন এবং তাকে সম্মান করতেন। অত্যন্ত যত্নের সাথে তার সেবা করেন এবং চিকিৎসায় বিন্দু মাত্রও ত্রুটি করেন নি। তিনি সুস্থ হয়ে হযরত খালেদের প্রশংসা করে বলতেন, তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল, ভদ্র ও বিনয়ী সিপাহসালার। অত্যন্ত সহানুভূতি সহকারে তিনি আমার সেবা করেছেন।[১২]

একজন বীর-সাহাবী নারীর চরিত্র সম্পর্কে বেশি আলোচনা করার তেমন প্রয়োজন পড়েনা। স্বয়ং বীরত্বই এমন এক গুণ, যাতে নিহিত রয়েছে অনেক গুণাবলী।

হযরত (সাঃ) তার কাছে এলে তিনি খাবার পেশ করেন। রাসূলে খোদা বললেন, তুমিও খাও। তিনি বললেন, আমি রোযা রেখেছি। নবীজী বললেন ঃ

اِنَّ الصَّائِمَ اِذَا اُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتَ عَلَيْهِ الْمَلٰئِكَةُ.

–রোযাদারের কাছে কিছু খাওয়া হলে ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করেন।[১৩]

এতো হচ্ছে তার প্রতি নবীজীর ভালোবাসার পরিচয়। নবীজীর পর হযরত আবূ বকর তাকে দেখতে যেতেন। হযরত উমর (রাঃ) তাকে অনেক সম্মান করতেন। তার খেলাফতকালে একবার গনীমতের মালের সাথে কিছু মূল্যবান কাপড়ও আসে। এর মধ্যে সোনালী কারুকার্য খচিত অতি মূল্যবান দোপাট্টাও ছিল। কেউ কেউ মত প্রকাশ করলো যে, এটা তার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্‌র বউকে দেয়া হোক। কেউ বললো, তার ধাত্রী কুলসুম বিনতে আলীকে দেয়া হোক। কিন্তু হযরত উমর বললেন, আমি উম্মে আম্মারাকে

এজন্য সবচেয়ে বেশি হকদার মনে করি। কারণ, ওহোদ যুদ্ধের দিন আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি ঃ

مَا الْتَفَتُّ يَوْمَ اُحُدٍ يَمِيْنًا وَّلاَشِمَا الاَّ اَرَاهَا تُقَاتِلُ دُوْنِىْ.

–ওহোদ যুদ্ধের দিন আমি যেদিকেই তাকিয়েছি, সব দিকেই উম্মে আম্মারাকে দেখতে পেয়েছি। তিনি আমার হেফাযতে যুদ্ধ করেছিলেন।

সুতরাং দোপাট্টা তার কাছে প্রেরণ করা হয়।

নবীজী থেকে তিনি কয়েকটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। আব্বাস ইবনে তামীম ইবনে যায়েদ, হরেস ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে কা'আব এবং ইকরামা ও লায়লা তার সনদে এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৪]

তার মৃত্যুকাল সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায় না। মুসাইলামা কাযযাবের সাথে যুদ্ধের পরও তার বেঁচে থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইয়ামামা যুদ্ধের পর তিনি কত দিন জীবিত ছিলেন, তা জানা যায় না।

১. আল-এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৯২৮, ২. ঐ, ৩. . আল-এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৯২৯, ৪. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩০২, ৫. ঐ, ৬. ঐ পৃষ্ঠা ৩০১, সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ১৮২, ৭. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪০৩, ৮. ঐ পৃষ্ঠা ৩০২, ৯. ঐ, ১০. ৫০১, ১১. আলীগড় থেকে প্রকাশিত 'বাওয়াতীন' সাময়িকী থেকে ইয়ামামা যুদ্ধের বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে. ১২. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩০৪, ১৩. আল-এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৯২৮. ১৪. আল-এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৯২৮।

হযরত উম্মে হারাম বিনতে মালহান (রাঃ)

উম্মে হারাম তার নাম নয়, কুনিয়াত। আসল নাম জানা যায় না। তিনি বনু খাযরাজ্যের নেজার গোত্রে সন্তান ছিলেন। তার বংশধারা: উম্মে হারাম বিনতে মালহান ইবনে খালেদ ইবনে যায়েদ ইবনে হারাম ইবনে জুন্দুব ইবনে আমের ইবনে গানাম ইবনে আদী ইবনে নেজার। তার মাতা ছিলেন মুলকিয়া অর্থাৎ মালেক ইবনে আদী ইবনে যায়েদ ইবনে মানাত ইবনে আদী ইবনে আমর ইবনে মালেক ইবনে নেজার এর কন্যা। এ হিসাবে তিনি হযরত উম্মে সালমার বোন এবং হযরত আনাসের খালা হন।[১]

কেবল তাহযীব গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার প্রথম স্বামী ছিলেন আমর ইবনে কায়েস আনছারী।[২] অবশ্য অন্যান্য জীবন চরিত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, হযরত ওবাদা ইবনে ছামেত ছিলেন তার স্বামী। তিনি ছিলেন বড় দরজার সাহাবী। ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদের মতে তার প্রথম বিয়ে হয় ওবাদা ইবনে ছামেত এর সাথে। পরে আমর ইবনে কায়েস এর সাথে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কারণ, ওবাদা ইবনে ছামেত যে শেষ স্বামী ছিলেন, নির্ভরযোগ্য জীবন চরিত গ্রন্থ থেকে তা বুঝা যায়।

হযরত (সাঃ) তার শহীদ হওয়ার সংবাদ দিয়েছিলেন। একদিন নবীজী তার ঘরে আসেন। খবার পর তিনি আরাম করেন এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। একটু পরই জেগে উঠে হেসে বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার উম্মাতের কিছু লোক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে। উম্মে হারাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য দোয়া করুন, আমিও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। নবীজী দোয়া করে আবার শুয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর আবার জেগে উঠে পুনরায় সে স্বপ্নের কথা বললেন। উম্মে হারাম এবারও

দোয়ার জন্য আবেদন জানান। আঁ- হরত এরশাদ করলেন, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।[৪]

এর কিছুদিন পরই হযরত ওবাদা ইবনে ছামেত এর সাথে তার বিয়ে হয়। ২৭ হিজরীতে হরত ওসমান (রা:) এর খেলাফত কালে শাম দেশের শাসনকর্তা আমীর মুআবিয়া সাইপ্রাস দ্বীপে অভিযান পরিচালনার অনুমতি লাভ করেন। এ অভিযানের জন্য তিনি একটা বাহিনীও তৈয়ার করেন। ঐ বাহিনীতে হযরত আবূ যর, হযরত আবূ দারদা এবং হযরত ওবাদা ইবনে ছামেতসহ অনেক সাহাবী ছিলেন। স্বামীর সাথে হযরত উম্মে হারামও রওয়ানা করেন। কিন্তু তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করতে পারেন নি। ঘোড়া তাকে পৃষ্ঠ হতে ফেলে দেয়। ফলে তিনি নিচে পড়ে ভীষণ আঘাত পান। এ আঘাতে তিনি সেখানেই মারা যান। বাধ্য হয়ে তাকে সেখানেই দাফন করা হয়।[৫]

অন্যান্য নারীদের মত তিনিও হাদীস বর্ণনার মর্যাদা লাভ করেছেন। হযরত আনাস, হযরত আমর ইবনে আসওয়াদ, ওবাদা ইবনে ছামেত, হযরত আতা ইবনে ইয়াসার, ইয়া'লা ইবনে শাদাদ ইবনে আওস তার শ্রবণের উপর নির্ভর করেছেন এবং তার সিলসিলায় হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৬] উসুদুল গাবাহ্ গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেন যে, হযরত (সা:) তার সম্মান করতেন তাকে দেখার জন্য যেতেন এবং তার গৃহে আরাম করতেন।[৭]

তিনি তিন পুত্র রেখে যান। প্রথম স্বামীর পক্ষে কায়েস এবং আবদুল্লাহ আর দ্বিতীয় স্বামীর পক্ষে মোহাম্মদ।[৮]

১. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩০৮-৩১০, ২. অহযীব ১৩শ খন্ড পৃষ্ঠা ৪৬২, ৩. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৬৮, ৪. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড যুরকানী ১১শ খন্ড পৃষ্ঠা ৬৬, ৫. উসুদুন গাবাহ পৃষ্ঠা ৫৭৫, ৬. আল-এছাবাহ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা ৮৫৩. ৭. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৭৭৪. ৮. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩১৮।

হযরত সুমাইয়্যা বিনতে খাবাত (রাঃ)

তার নাম সুমাইয়্যা, খাবাতের কন্যা। তিনি ছিলেন মশহুর সাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের এর মাতা। তার বংশ ধারা সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী কিছু জানা যায় না।[১] তিনি ছিলেন আবূ হোযাইফা ইবনে মুগীরা মাখযুমীর দাসী। আবূ হোযাইফার বন্ধু ইয়াসের ইবনে আমের আবাসীর সাথে তার বিয়ে হয়। হযরত আম্মারের জন্ম হলে আবূ হোযাইফা তাকে আজাদ করে দেন।[২]

যারা ইসলামের জন্য সকল দুঃখ-কষ্ট অকাতরে বরণ করে নেন, হযরত সুমাইয়্যা ছিলেন তাদের একজন। ঐতিহাসিক ইবনে আসীর এবং হাফেয ইবনে হাজার বর্ণনা করেন যে, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত সুমাইয়্যা ছিলেন ৭ম। তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা, যাকে সত্যের জন্য নানা প্রকার নির্যাতন সইতে হয়েছে। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সংযমের সাথে আল্লাহর পথে শহীদ হন।[৩] কেবল ইসলাম গ্রহণের কারণে মুশরেকরা তাকে লোহার পোশাক পরিধান করিয়ে মক্কার উত্তপ্ত বালুর মধ্যে দাড় করিয়ে রাখতো। কিন্তু তার স্থিরতা ও দৃঢ়তায় এতটুকু দুর্বলতাও দেখা যায়নি। হযরত (সা:) সে পথ দিয়ে গমনকালে হযরত আম্মার এবং মাতা-পিতাকে এ অবস্থায় দেখে বলতেন, ধৈর্য ধারণ কর ইয়াসর এর পরিবার, তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।[৪] তার দিন অতিবাহিত হতো এ অমানুষিক নির্যাতনের মধ্যে দিয়েই, রাত্রে কিছুটা পানি পেতেন। একদিন রাত্রে গৃহে এলে আবূ জেহেল গালী দিতে দিতে তার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করে। এতেই তার মৃত্যু হয়।[৫] অসহায় মায়ের করুণ মৃত্যুতে হযরত আম্মার অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি নবীজীর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন যুলুম-নির্যাতন তো চরমে পৌঁছেছে। তিনি ধৈর্য্যের দীক্ষা দিয়ে বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَاتُعَذِّبْ اَحَدًا مِنْ اٰلِ يَاسِرَ بِالنَّارِ.

অর্থ : প্রভু হে, ইয়াসের পরিবারের কাউকে তুমি দোযখের শাস্তি দেবে না।[৬]

হযরত সুমাইয়্যা ছিলেন অনেক দুর্বল এবং বয়স্কা। অনেক বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার শাহাদাতের পর বদর যুদ্ধে আবূ জেহেল মারা পড়লে হযরত (সা:) হযরত আম্মারকে বলেন ঃ قَدْ قَتَلَ اللّٰهُ قَاتِلَ اُمِّكَ.

অর্থ : আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মায়ের হত্যাকারীকে হত্যা করেছেন।[৭]

হযরত সুমাইয়্যা হিজরতের পূর্বে শহীদ হয়েছেন। তাই তিনি যে ইসলামে প্রথম শহীদ ছিলেন, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

১. আল-এস্তীআব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৫৯, ২. ঐ. ৩. পৃষ্ঠা ৭৬. উসুদুল গাবাহ, ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৪১. ৪. , উসুদুল গাবাহ. ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৮১, ৫. আল-এস্তীআব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৬৩. ৬. ঐ পৃষ্ঠা ২৭৬. ৭. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৯২।

৩০

হযরত শায়মা সা'দিয়া বিনতে হারেস (রাঃ)

তার আসল নাম হোযাফা। শায়মা বা শাম্মা নামে তিনি বেশি পরিচিতা ছিলেন। তিনি ছিলেন হারেস ইবনে আবদুল ওয্যা ইবনে রেফা'আর কন্যা এবং নবীজীর দুধ বোন।[১]

ইসলাম কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করলে একদল মুজাহিদ বনু হাওয়াযেন গোত্রের উপর আক্রমণ চালায়। এর ফলে গনীমতের মাল ও অন্যান্যের সাথে শায়মাও হস্তগত হয়। আঁ-হযরতের খেদমতে নীত হলে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার দুধবোন। এর প্রমাণ হিসেবে কিছু আলামতের উল্লেখ করলে তা দেখে আঁ-হযরতের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। তিনি চাদর মোবারাক বিছিয়ে ভালোভাবে বসতে দেন। এরপর এরশাদ করেন, তুমি আমার কাছে থাকতে চাইলে ইজ্জত-আরামের সাথে রাখা হবে, আর আপন কবীলায় ফিরে যেতে চাইলে সেখানে পৌঁছে দেয়া হবে। শায়মা আপন কবিলায় ফিরে যাওয়া পছন্দ করেন এবং তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজী তাকে তিনটি গোলাম-বাঁদী, কিছু টাকা এবং বকরী দিয়ে বিদায় দেন।[২]

মুহাম্মদ ইবনে মুআল্লা 'তারকীছ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত (সাঃ) যখন খুব ছোট ছিলেন তখন শায়মা তাকে খাওয়াতেন এবং এ সময় তিনি কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

يَارَبَّنَا اَبْقِ لَنَا مُحَمَّدًا – حَتَّى اَرَاهُ يَافِعًا وَاَمْرَدًا.

অর্থ : হে খোদা! আমাদের জন্য মোহাম্মদকে বাঁচিয়ে রাখ।

এমনকি আমরা যেন তাকে জওয়ান দেখি।

ثُمَّ اَرَاهُ سَيِّدًا مُوَدَّدَا – وَاَكَبِّتْ اَعَادِيْهِ مَعًا اَلْحَسَدًا وَاَعْطِه مَذْايَدُوْمُ اَبَدًا.

অর্থ : এরপর আমরা যেন তকে একজন সম্মানিত সর্দার হিসেবে দেখি। এমন অবস্থায় যখন তার প্রতি শত্রুতা পোষণকারী দুশমনরা হবে অনুগত প্রভু হে, তাকে স্থায়ী ইজ্জত দান কর।

কি সুন্দর ছিল দোয়া, যা আল্লাহ্‌র দরবারে অক্ষরে অক্ষরে কবুল হয়েছে। তার মৃত্যুর তারিখ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

১. আল- এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬৬১, ২. আল এস্তী'আব ২য় খন্ড পষ্ঠা ৭৬২।

৩১

হযরত উম্মে ওয়ারাকা বিনতে আবদুল্লাহ (রাঃ)

ঐতিহাসিকরা তার আসল নাম উল্লেখ করেননি। কুনিয়াত উম্মে ওয়ারাকা। তিনি ছিলেন আনছারী মহিলা ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর এবং আল্লামা ইবনে আবদুল বার তার কোন বংশধারাও উল্লেখ করেন নি। তারা বলেন, এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়। অবশ্য হাফেয ইবনে হাজার এছাবাহ্ গ্রন্থে তার বংশধারা উল্লেখ করেছেন– উম্মে ওয়ারাকা বিনতে আবদুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে উয়াইমির ইবনে নওফল। ইবনে হাজারের মতে তাকে উম্মে ওয়ারাকা বিনতে নাওফলও বলা হতো।[১] খুব সম্ভব হিজরতের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবীজীর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন।[২]

বদর যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে উম্মে ওয়ারাকা নবীজীর খেদমতে নিবেদন করে বলেন, আমাকেও অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হোক। আমি আহত এবং রোগাক্রান্তদের সেবা করবো। হতে পারে আল্লাহ্ আমাকে শাহাদাত নছীব করবেন। নবীজী বললেন, তুমি গৃহেই থাক, খোদা তোমাকে সেখানেই শাহাদাত দেবেন।[৩] তিনি যেহেতু কুরআন শরীফ পড়তে জানতেন, তাই নবীজী তাকে গৃহেই স্ত্রীদের ইমাম করেন।[৪] নবীজীর অনুমতিক্রমে একজন মোয়াজ্জেনও নিয়োগ করা হয়। তিনি একজন গোলাম এবং একজন দাসীকে কথা দিয়েছিলেন যে, আমার পর তোমরা আজাদ হবে। তারা বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সময় আসার পূর্বেই প্রতিশ্রুতির সুযোগ নিতে চায়। এক রাত্রে চাদর মুড়ি দিয়ে তারা তার ইহলীলা সাঙ্গ করে। এ ঘটনার পর তারা দু'জনই পলায়ন করে। ভোরে হযরত উমর (রাঃ) তার ঘরে গিয়ে দেখেন ঘরের এক কোণে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে রয়েছেন। তিনি আক্ষেপ করে বললেন, আল্লাহ্ এবং তার রাসূল ঠিকই বলেছেন। অতঃপর মসজিদে এসে মিনারে দাঁড়িয়ে এ খবর প্রচার করে গোলাম এবং দাসীকে গ্রেফতার

করে আনার নির্দেশ দেন। তাদেরকে গ্রেফতার করে আনা হলে খলীফাতুল মুসলেমীনের নির্দেশে উভয়কে শুলীবিদ্ধ করা হয়।[৫]

এরা হচ্ছে প্রথম মুসলমান, যাদেরকে মদীনায় শুলী বিদ্ধ করা হয়।[৬] নবীজী হযরত উম্মে ওয়ারাকাকে দেখতে তার গৃহে গমন করতেন। এবং তাকে শহীদা বলে ডাকতেন। এজন্য হযরত উমর (রাঃ) তার শাহাদাতের পর বললেন, রাসূলাল্লাহ্ (সাঃ) ঠিকই বলতেন, চলো শহীদার গৃহে যাই।[৭] ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ উল্লেখ করেন যে, হযরত উম্মে ওয়ারাকা নবীজীর কাছ থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। অবশ্য অন্যান্য জীবন চরিত গ্রন্থে এর কোন উল্লেখ নেই।[৮]

১. আল-এছাবাহ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৮০, ২. তবকাত ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৩৫, ৩. আল-এস্তীআব ২য় খন্ড. পৃষ্ঠা ২৮৬. ৪. ঐ, ৫. আল-এছাবাহ. দ্বিতীয় খন্ড. পৃষ্ঠা ৯৮১, ৬. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৩৫ ও আল-এস্তীআব ইত্যাদি, ৭. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৯৮১. ৬. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৩৫ ও আল-এস্ত ীআব ইত্যাদি, ৭. উসুদুল গাবাহ. ৫ম খন্ড. পৃষ্ঠা ৬৩৬, ৮. তবকাত, ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৩৫।

৩২

হযরত উম্মে মা'বাদ বিনতে খালিদ (রাঃ)

তার আসল নাম আতেকা, উম্মে মা'বাদ কুনিয়াত। তিনি ছিলেন খুনাইস ইবনে খালেদের বোন। বংশধরা হলো, উম্মে মা'বাদ বিনতে খালিদ ইবেন খালীফ ইবনে মানকাদ ইবনে রবীআ ইবনে হরম ইবনে খমিস ইবনে হারাম ইবনে হাবীসা ইবনে কা'আব ইবনে আমর।[১] তিনি ছিলেন খোযা'আ গোত্রের সন্তান। তাঁর চাচাত ভাই তামীম ইবনে আব্দুল ওয্যা ইবনে মুন্‌কাযের সাথে তার বিয়ে হয়।

হিজরতের সময় নবীজী তার গৃহে অবস্থান করেন। তার গৃহ ছিল কুদাইদ নামক স্থানে নবীজী সোমবার শেষ রাত্রে বা মঙ্গলবার ভোর রাত্রে গুহা থেকে বের হলে মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে একটা শব্দ শোনা যায়। কে এই শব্দ দিয়েছে, তার তালাশে মক্কার নারী-পুরুষ-শিশু সকলে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বেরিয়ে আসে। কিন্তু কাউকে দেখতে পায়নি। আওয়াজটি ছিল এই–

جَزَى اللهُ رَبُّ النَّاس خَيْرَ جَزَائه

رَفِيْقَيْن قَالاَ خَيْمَةَ أمَّ مَعْبَدِ

هُمَا نَزَلاَ بِالبِرِّ وَاعْتَنى بَابَه فَقَدْ

فَازَمَنْ اَمْسى رَفِيْقَ مُحَمَّد

اَيْهِنَ بَنِىْ كَعْبِ مَقَامَ فَمَكَا نَهُمْ

وَمَقْعَدُ هَا لِلمُسلِمِيْنَ مَوصَدُ.

অর্থ : যে দু'জন বন্ধু উম্মে মা'বাদের খীমায় আশ্রয় নিয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

তারা মঙ্গলের সাথে সেখানে অবস্থান করেছে আর তারা তো এ জন্য অভ্যস্ত।

সুতরং যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা:) এর সাথী হয়েছে সেতো সফলকাম হয়েছে।

বনুকাবের জন্য এমন নারী মোবারাক হোক, যার গৃহ মুসলমানের আশ্রয়স্থল।

নবীজী যখন হযরত উম্মে মা'বাদের গৃহে অবস্থান করেন, তখন তার সাথে হযরত আবূ বকর (রা:) এবং তার ভৃত্য আব্দুল্লাহ্ ইবনে আরীকীতও ছিলেন। হযরত উম্মে মা'বাদ জবাই করার জন্য একটা দুধের বকরী হাযির করেন। নবীজী বকরীটির স্তনে হাত দিয়ে বললেন, এটি জবাই করবে না। হযরত উম্মে মা'বাদ অপর বকরী নিয়ে আসেন এবং তা জবাই করে নবীজী এবং তার সাথীদেরকে খাওয়ান। নাশতাও করান। উম্মে মা'বাদ বলেন, নবীজী যে বকীটির স্তনে হাত রাখেন, তা হযরত উমরের (রা:) শাসনকাল পর্যন্ত আমাদের কাছে ছিল। আমরা প্রতিদিন দু'বেলা বকরীটির দুধ দোহন করতাম। এটা ছিল হিজরী ৮ম সালের কথা।

মুহাম্মদ উবনে উমর-এর বর্ণনা মতে হযরত উম্মে মা'বাদ যখন নবীজীর দর্শন লাভ করেন, তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্যরা বলেন, পরে তিনি একদিন নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং বায়আত গ্রহণ করেন।[৩] তার মৃত্যু সাল ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

১. আল-এছাবাহ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৬২, তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২১১, ২. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২১২।

৩৩

হযরত যয়নব বিনতে আবূ মু'আবিয়া (রাঃ)

তার নাম যয়নব, লকব রায়েতা। তিনি ছিলেন সকীফ বংশের কন্যা। বংশধারা হচ্ছে, যয়নব বিনতে আবদুল্লাহ্ আবূ মু'আবিয়া ইবনে এতাব ইবনে আস'আদ ইবনে আমের ইবনে হাতীত ইবনে জশম ইবনে সকীফ।[১] বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদের সাথে তার বিয়ে হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ছিলেন অত্যন্ত গরীব। তার আয়-উপার্জনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। স্ত্রী হযরত যয়নব হাতের কারুকাজ জানতেন। এর দ্বারাই পরিবারের ব্যয় নির্বাহ হতো। ছদকার সাওয়াবের কথা শুনেছিলেন। তাই তার প্রতি বেশ লক্ষ্য রাখতেন। একবার তিনি স্বামীকে বললেন আমি যা কিছু উপার্জন করি, তোমার এবং শিশুদের জন্য ব্যয় হয়ে যায়। ছদকা-খায়রাতের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। বলো, এতে আমার কি লাভ? হযরত আবদুল্লাহ জবাব দেন, তুমি তোমার লাভের কথা চিন্তা কর। আমি তোমার ক্ষতি চাই না। হযরত যয়নব এবার নবীজীর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, আমি হাতের কাজ করে যা কিছু উপার্জন করি, স্বামী এবং সন্তানের জন্য সবই ব্যয় হয়ে যায়। স্বামীর কোন আয়-উপার্জন নেই। এ কারণে অভাবীদেরকে কিছু ছদকা দিতে পারি না। এমতাবস্থায় আমি কোন সাওয়াব পাব কি? নবীজী বললেন, হা, তোমাকে তাদের দেখাশুনা করতে হবে, খবর রাখতে হবে।[২]

এর কাছাকাছি বিষয়বস্তুর আর একটি বর্ণনা বুখারী-মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। নবীজী বলেছেন ঃ

تَصَدَّقْنَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْمِنْ حُلْيِكُنَّ.

অর্থ: হে নারী সমাজ! তোমরা ছদকা করবে, যদি তোমাদের গয়না দ্বারাও তা করতে হয়। এ বাণী শুনে হযরত যয়নব নবীজীর দরবারে হাযির হন। দরজায় দেখা হয় একজন আনছারী মহিলার সাথে। তার নামও ছিল যয়নব। উভয়ে হাযির হয়েছেন একই প্রয়োজনে। কিন্তু ভয়ে-সংকোচে ভেতরে প্রবেশ করছেন না। ইতিমধ্যে হযরত বেলাল উপস্থিত হন। তারা দু'জনেই হযরত বেলালকে বললেন, আপনি ভেতরে গিয়ে খবর দিন যে, দু'জন মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা আপনার কাছে জানতে চায় যে, স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্যদেরকে ছদকা দিলে সাওয়াব পাওয়া যায় কি-না? অবশ্য আমরা যে কে, তা যেন তিনি জানতে না পারেন। হযরত বেলাল নবীজীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তারা কে? বললেন, একজন আনসারী মহিলা, অপরজন যয়নব। জিজ্ঞেস করলেন, কোন যয়নব? বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদের স্ত্রী যয়নব। নবীজী বললেন ঃ

لَهُمَا اَجْرَانِ اَجْرُالصَّدَقَةِ وَاَجْرُ الْقَرَابَةِ.

অর্থ : তারা দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে, ছদকার সাওয়াব এবং আত্মীয়তার সাওয়াব।[৩]

মশহুর হাদীস বিশরাদ হযরত আবূ ওবায়দা ছিলেন তার সুযোগ্য সন্তান অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদের পুত্র।

তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং নবীজী থেকে কয়েকটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। তার সিলসিলায় যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা হচ্ছেন তার পুত্র আবদুল্লাহ্, তার ভাই (নাম অজানা), ওমর ইবনে হারেস, বিশর ইবনে সাঈদ, ওবায়েদ ইবনে সাবাক প্রমুখ।[৪]

১. আল-এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬১২, ২. ছহীহ মুসলিম, ছদকা অধ্যায়, ৩. উসদুল গাবাহ, ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৭০. আল-এস্তীআব, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৫৫. ৪. আল-এছাবাহ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭১২।

৩৪

হযরত উম্মে আতিয়্যা বিনতে হারেস (রাঃ)

তার আসল নাম নাসীবা, উম্মে আতিয়্যা কুনিয়াত। তিনি ছিলেন আনছার পরিবারের মহিলা। তার পিতার নাম হারেস। তার বংশ পরিচয় এর চেয়ে বেশি জানা যায় না।[১]

হিজরতের আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজী মদীনায় উপস্থিত হলে আনছারের স্ত্রীদেরকে বায়আতের জন্য একটা গৃহে সমবেত করান। হযরত উমর (রাঃ) কে দরজায় পাঠিয়ে বলেন যে, এসব শর্তে তাদের থেকে বায়আত গ্রহণ কর, শেরক করবে না, চুরি এবং ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবে, সন্তানদেরকে হত্যা করবে না এবং ভালো কথা অস্বীকার করবে না। নারীরা তা স্বীকার করলে হযরত উমর (রাঃ) ভিতরের দিকে হাত বাড়ান আর নারীরাও বাইরে হাত বাড়ান। যেন এটাই ছিল বায়আতের আলামত। বায়আত শেষে হযরত উম্মে আতিয়্যা জিজ্ঞেস করেন, ভালো কথা অস্বীকার করার অর্থ কি? হযরত উমর বললেন, বিলাপ ও মাতম না করা।[২]

হযরত উম্মে আতিয়্যা নবীজীর সাথে কয়েকটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এসব যুদ্ধে তিনি খাবার তৈয়ার করা, মাল-সামান হেফাযত করা, রুগীদের সেবা করা এবং আহতদের পট্টি বাঁধা ইত্যাদি কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৩] হযরত যয়নব বিনতে রাসূলের ওফাত হলে তিনি আরও কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে তাকে গোসল করান। নবীজী তাদের গোসল করাবার পদ্ধতি শিক্ষা দেন।[৪]

খেলাফতে রাশেদার শাসনামলে হযরত উম্মে আতিয়্যার এক সন্তান কোন এক যুদ্ধে অসুস্থ হয়ে বসরায় গমন করেন। তিনিও খবর পেয়ে বসরা গমন করেন। কিন্তু তিনি বসরা পৌঁছার একদিন আগেই তাঁর অসুস্থ সন্তান মারা যান। বসরায় তিনি বনু খলফ এর প্রাসাদে অবস্থান করেন। তৃতীয় দিন

খোশবু চেয়ে নিয়ে ব্যবহার করেন এবং বলেন, স্বামী ছাড়া অন্য কারো জন্য তিন দিনের বেশি শোক করা ঠিক নয়।[৫]

তিনি নবীজীর নির্দেশ পুরোপুরী মেনে চলতেন। বিলাপ-মাতম থেকে সব সময় বিরত থাকেন। বায়আতের সময় নবীজী বিলাপ করতে নিষেধ করলে তিনি বলেন, অমুক বংশের লোকেরা আমার গৃহে এসে কেঁদে গেছে। তাদের গৃহে গিয়ে আমারও কান্না জরুরী। আপনি অমুক বংশকে বাদ দিন। নবীজী তার এ আরয মনজুর করেন।[৬] একবার নবীজী তার কাছে ছদকার একটি বকরী পাঠান। তিনি হযরত আয়েশাকেও এ বকীরর গোশ্‌ত দেন। নবীজী হযরত আয়েশার গৃহে গেলে কিছু খাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। হযরত আয়েশা বললেন, আর কিছুতো নেই, অবশ্য আপনি উম্মে আতিয়্যার কাছে যে বকরী পাঠিয়েছেন, তার গোশ্‌ত আছে। নবীজী বললেন, তাই নিয়ে এসো। কারণ, তা উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে গেছে।[৭] নবীজীর বন্ধুদের সাথেও তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ বলেন, হযরত আলী (রাঃ) উম্মে আতিয়্যার গৃহে খাওয়ার পর বিশ্রাম নিতেন।[৮]

আল-এস্তী'আব গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান মহিলা সাহাবী। তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হোন।[৯]

তিনি হযরত (সাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম এই ঃ

হযরত আনাস্ মুহাম্মদ যিনি ইবনে সীরীন নামে পরিচিত, হাফসা ইবনে সীরীন, ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আতিয়্যা, ইবনুল মালেক, ইবনে উমাইর প্রমুখ।[১০]

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর ব্যাপারে তার হাদীস বিশেষভাবে গৃহীত। বড় বড় সাহাবী, তাবেঈ এবং বছরার আলেমরা এ ব্যাপারে তাঁকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন।[১১]

১. আল-এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬২৩, ২. মুসনাদ ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৬০৯, ৩. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২২৪, ছহীহ মুসলিম ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ১৬০, ৪. সহীহ বুখারী. ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৮- ১৭০. ৫. সহীহ বুখারী ১ম খন্ড. পৃষ্ঠা ১৬২-১৭২, ৬. মুসনাদ ৬ষ্ঠ খন্ড. পৃষ্ঠা ৪০৭. ৭. সহীহ মুসলিম. ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৪০১. ৮. তবকাত ৮ম খন্ড. পৃষ্ঠা ৩৩৪, ৯. আল-এস্তীআব. ২য় খন্ড. পৃষ্ঠা ৮০০, ১০. আল-এছাবাহ. ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৯২৪. ১১. আল-এস্তীআব ২য় খন্ড. পৃষ্ঠা ৮০০।

৩৫

হযরত রাবী' বিনতে মুআউবিয ইবনে আফ্রা (রাঃ)

তাঁর নাম রাবী। বনু খায্রাজের নেজার গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক। বংশ ধারা হলো-রাবী' বিনতে মুআউওবিয ইবনে হারেস ইবনে রেফা'আ ইবনে হারেস ইবনে সাওয়াদ ইবনে মালেক ইবনে গানাম ইবনে মালেক ইবনে নেজার। তার মাতা ছিলেন উম্মে ইয়াযীদ, যিনি ছিলেন কায়েস ইবনে যাউরা ইবনে হারাম ইবনে জুন্দুব ইবনে আমের ইবনে গানাম এর কন্যা। এ ভিত্তিতে তার নানীকুল চার পাঁচ সিড়ি উপরে গিয়ে দাদী-কুলের সঙ্গে মিলিত হয়।[১] হযরত রাবী এবং তার সকল ভাই ছিলেন মশহুর।[২]

তিনি হিরতের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বায়আতে রেদওয়ান এ অংশ গ্রহণ করেন।[৩] আয়াস ইবনে বকীর লাইসরি সাথে তার বিয়ে হয়। ভোরে নবীজীর গৃহে এসে বিছানায় বসে পড়েন। তখন মেয়েরা দফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধের প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করছিল। এ পর্যায়ে একজন মেয়ে নবীজীর দৃষ্টান্ত দিয়ে এ কাব্যাংশ পাঠ করে ঃ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَافِيْ غَدٍ

আর আমাদের মধ্যে এমন নবী আছেন, যিনি আগামী দিনের খবর রাখেন।[৪]

নবীজী, বললেন, এটা বলবে না, বরং আগে যা গাইছিলে তাই গাও। তিনি অধিকাংশ জিহাদে অংশ গ্রহণ করে আঁ-হযরতের সঙ্গী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। এসব উপলক্ষে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কাজ করেন। মুজাহিদদেরকে পানি পান করান, তাদের খেদমত করেন, নিহত এবং আহদেরকে মদীনা নিয়ে যাও।[৫] হোদায়বিয়ার ঘটনায় তার অংশগ্রহণ সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। বায়আতে রেদওয়ানে অংশ গ্রহণের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কোন ব্যাপারে স্বামীর সাথে মনোমালিন্য দেখা দেয়। এমনকি পরিস্থিতি এ পর্যন্ত দাঁড়ায় যে, হযরত রাবী স্বামীকে বলেন, আমার কাছে যা কিছু আছে, সব নিয়ে মুক্ত হয়ে যাও। যা কিছু তার কাছে ছিল, সবই দিয়েছেন, শুধু গায়ের জামাটা ছিল। এটাও ছিল তার কাছে অসহ্য। হযরত ওসমানের (রা:) আদালতে নালিশ করেন। যেহেতু শর্ত ছিল ঠিক আর দাবি ছিল সত্যি, তাই হযরত ওসমান বললেন, তোমাদর শর্ত পুরো করতে হবে। আর তার স্বামীকে বললেন, তুমি চাইলে তার ঘোড়া বাধাঁর রশিটা পর্যন্ত তোমার।[৬] হাফেয ইবনে হাজার-এর উক্তি অনুযায়ী এটা ২৫ হিজরীর ঘটনা।[৭]

তিনি নবীজীকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। একবার দু'টি তশ্তরীতে করে আঙ্গুর এবং খেজুর নিয়ে গেলে নবীজী তাকে অলংকার বা স্বর্ণ দান করেন।[৮] নবীজী অধিকন্তু তার গৃহে যেতেন। একবার নবীজী এসে ওজুর জন্য পানি চাইলে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওজু করান।[৯]

তার ধর্মীয় অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র ছিল। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবূ রাবী'আ মখযুমারী স্ত্রী আসমা বিনতে মাখরাবা আতর বিক্রয় করতেন। একবার তিনি কয়েকজন নারীসহ হযরত রাবী'এর গৃহে আগমন করেন এবং তার নাম-গোত্র জিজ্ঞেস করতে শুরু করেন। তিনি বললেন, যেহেতু রাবী-এর ভাই আবূ জেহেলকে বদর যুদ্ধে হত্যা করেছিল, আর হযরত আসমা ছিলেন কোরাইশ বংশের, তাই তিনি বললেন, তুমি তো আমাদের সরদারকে হত্যাকারীর বোন। আবূ জেহেলকে সর্দার বলা তার কাছ খুব খারাপ লেগেছে। তিনি জবাব দিয়ে বলেন, সর্দার নয়, বরং আমি তো গোলামকে হত্যাকারীর বোন। আসমা আবূ জেহেলের এ অবমাননা সহ্য করতে পারেননি। তাই তিনি উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, তোমার কাছে সদাই বিক্রি করা আমার জন্য হারাম। তিনিও তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, তোমার কাছ থেকে কিছু কেনাও আমার জন্য হারাম। কারণ, তোমার আতর ছাড়া অন্য আতরে আমি দুর্গন্ধ পাইনি।[১০]

আবূ ওবায়দা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আম্মার ইবনে ইয়াসের তার কাছে নবীজীর অবয়ব-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ

يَابُنَيَّ لَوْرَأَيْتَه كَرَئَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً.

বৎস! তুমি যদি তাকে দেখতে তাহলে যেন সূর্য উদয় হচ্ছে বলে মনে করতে।[১১]

হযরত রাবী' নবীজী থেকে ২১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইমাম যয়নুল আবেদীন তার কাছে মাসায়েল জিজ্ঞেস করতেন। তার জ্ঞানের মর্তবা সম্পর্কে এ থেকে ধারণা করা যায়। রাবীদের মধ্যে যাদের নাম জানা গেছে তারা হচ্ছেন ঃ আয়েশা বিনতে আনাস ইবনে মালেক, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, আবূ সালমা ইবনে আব্দুর রহমান, নাফে, ওবাদা ইবনুল ওয়ালীদ, খালেদ ইবনে যাকওয়ান, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল, আবূ ওবায়দা ইবনে মুহাম্মদ এবং আম্মার ইবনে ইয়াসের প্রমুখ।[১২]

তার সন্তানদের মধ্যে কেবল মুহাম্মদ সম্পর্কে জানা যায়।[১৩] জীবন চরিত গ্রন্থে তার মৃত্যু সালের উল্লেখ নেই।

১. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৩৮, ২. তাহযীবুত তাহযীব, দ্বাদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১৮, ৩. উসুদুল গাবাহ, ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৫২, ৪. ঐ, তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৩৮, ছহীহ বুখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৫২০, ৫. আল-এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৫৭৫, ৬. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩২৮, ৭. আল-এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৫৭৫, ৮. এল-এস্তীআব, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৫২, ৯. মুসনাদ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৩৫৮, ১০. আবূ দাউদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩, ১১. আল-এস্তীআব, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৫২, ১২. উসুদুল গাবাহ, ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৫২, ১৩. আল-এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৫৭৪।

হযরত উম্মে হানী বিনতে আবূ তালেব (রা:)

তার আসল নাম ফাখেতাহ। তিনি ছিলেন নবীজীর চাচা আবূ তালেবের কন্যা। তার এবং আকীল, জাফর, তালেব ও হযরত আলীর (রা:) মাতা ছিলেন ফাতিমা বিনতে আসাদ। এরা সকলেই ছিলেন তার আপন ভাই।[১] হোবায়রা ইবনে আমর ইবনে আয়েয মখযূমীর সাথে তার বিয়ে হয়।[২]

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজী সেদিন তার গৃহে গমন করেন, সেখানে গোসল করেন এবং চাশত-এর নামায পড়েন।[৩] হযরত উম্মে হানী তার দুজন বান্ধবীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। নবীজীও তাদেরকে আশ্রয় দেন।[৪] তার স্বামী হোবায়রা মক্কা বিজয়ের দিন নাজরানের দিকে পলায়ন করেন এবং এ প্রসঙ্গে এ কবিতা পড়েন ঃ[৫]

لَعَمْرُكَ مَاوَلَّيْتُ ظَهْرِى مُحَمَّدًا.

وَاَصْحَابَه جُنُبًا وَلاَخِيْفَةَ الْقَتْلِ

وَلَكِنَّنِىْ قَلَبْتُ اَمْرِىْ فَلَمْ اَجِدْ

لِسَيْفِىْ عِنَاءًا اِنْ ضَرَبْتُ وَلاَيُنْلِىْ

وَقَفْتُ فَلَمَّا خِفْتُ ضَيْفَةَ مَوقِفِىْ

رَجَعْتُ لِعَوْدِ كَاهَزْوِ اِلَىْ الشِّبْلِ.

অর্থ : তোমার শপথ, আমি কাপুরুষতা বা নিহত হওয়ার ভয়ে মুহাম্মদ এবং তার সাথীদের থেকে পলায়ন করিনি।

কিন্তু আমি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে দেখলাম, তীর-তরবারী ব্যবহার করা যথেষ্ট মনে করিনি।

যতক্ষণ আমার অবস্থানস্থল সংকীর্ণ দেখিনি, ততক্ষণ অবস্থান করেছি।

অতঃপর ফিরে এসেছি, যেমন সিংহ ফিরে আসে সিংহ শাবকের কাছে।

তিনি নবীজীকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। মক্কা বিজয়কালে নবীজী তার গৃহে যান, শরবত পান করেন, তাকেও দেন। সেদিন তিনি রোযা রেখেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শরবত পান করেন। নবীজী জানতে পেরে রোযা ভাঙ্গার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন, আমি আপনার ঝুটা ফেরৎ দিতে পারি না।[৬] নবীজীও তাকে অতি ভালো জানতেন। একবার বলেন, উম্মে হানী! বকরী রাখবে। এটা বড় বরকতের জিনিষ।[৭] একবার তিনি নবীজীর খেদমতে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমি বৃদ্ধা হয়ে পড়েছি। চলা ফেরায় দুর্বলতা অনুভব করি। এমন কোন আমল বলে দিন, যা বসে বসে করতে পারি। তিনি একটা ওযীফা বলে দেন।[৮]

হযরত উম্মে হানী নবীজী থেকে ৪৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে তা সংগৃহীত হয়েছে। নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা এসব হাদীসের রাবী–

জা'দাহ, ইয়াহ্ইয়া, হারুন, আবূ মুররা, আবূ ছালেহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইবনে হারেস ইবনে নওফেল, আবদুর রহমান, ইবনে আবূ লায়লা, মুজাহিদ, ওরওয়া প্রমুখ।[৯]

তার মৃত্যু সাল সম্পর্কে জানা যায় না। অবশ্য আল-এছাবাহ গ্রন্থের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, হযরত আলীর (রাঃ) পরও তিনি জীবিত ছিলেন।[১০] তার সন্তানদের মধ্যে আমর, হানী, ইউসুফ এবং জাদাহ প্রসিদ্ধ।

১. আল-এস্তী'আব, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৭৬, ২. ও ৩. উসুদুল গাবাহ, ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৬২৪, ৪. মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ২৪২, ৫. ঐ পৃষ্ঠা ৩৪৩, ৬. ঐ, ৭. ঐ, ৮. পৃষ্ঠা ৩৪৪, ৯. আল-এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৯৭৮, ১০. ঐ।

৩৭
হযরত উম্মে সুলাইম বিনতে মালহান (রাঃ)

তার আসল নাম রমীলা বা মাহলা, কারো কারো মতে রীশা। উম্মে সুলাইম এবং উম্মে আনাস কুনিয়াত। তবে উম্মে সুলাইম নামেই তিনি বেশি পরিচিত। গামীছা, রামীছা তার লকব বা উপাধী। তার পিতা ছিলেন মালহান ইবনে খালেদ ইবনে যায়েদ ইবনে হারাম ইবনে হারাম ইবনে জুন্দুব। তিনি ছিলেন মদীনার বাসিন্দা এবং আনসারদের নেজার কবীলার লোক। তার মাতার নাম মুলাইকা। তিনি মালেক ইবনে নেজার এর কন্যা।[১] পৈত্রিক বংশধারায় তিনি ছিলেন সালমা বিনতে যায়েদ এর পৌত্রি আর সালমা ছিলেন আব্দুল মুত্তালেবের মাতা। তিনি ছিলেন নবীজীর পূর্ব পুরুষ। এ কারণে উম্মে সুলাইম ছিলেন নবীজীর খালা। একই গোত্রের মালেক ইবনে নযর এর সাথে তার বিয়ে হয়। এ পক্ষে হযরত আনাস জন্ম গ্রহণ করেন।[২]

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি মুসলমান হন। এ ভিত্তিতে হাফেয ইবনে হাজার আল-এছাবাহ গ্রন্থে লিখেন ঃ আনসাদের মধ্যে যারা প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম।

হযরত আনাস তখনো ছোট, হযরত উম্মে সুলাইম ছোট শিশুকে কালেমা পড়ান। স্বামী মালেক ইবনে নযর মুশরেক ছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করেন নি। শিশুকে কালেমা পড়াতে দেখে স্বামী মালেক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তুমি আমার শিশুকেও বেদ্বীন বানাচ্ছ। এ অবস্থায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে শাম দেশে চলে যান।[৩]

সেখানে তার কোন দুশমন আগে থেকেই প্রতীক্ষায় ছিল। সুযোগ পেয়ে সে তাকে হত্যা করে। উম্মে সুলাইম বিধবা হয়ে পড়েন। শিশুপুত্রকে নিয়ে

তিনি অত্যন্ত অস্থির ছিলেন। এমন সময় তিনি বিয়ে করলে আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মুকাবিলা করেন এবং এই বলে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন যে, আমার শিশুপুত্র মজলিসে উঠা-বসা এবং কথা বলার যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করবো না। শিশুপুত্র যখন আমার বিয়েতে মত দেবে, তখন বিয়ে করবো।[৪] সৎ বাপ দ্বারা হযরত আনাসের যাতে অসুবিধা না হয় সে কারণে তিনি একথা বলেন।

হযরত আনাস উপযুক্ত বয়সে উপনীত হলে তারই কবীলার আবূ তালহা বিয়ের পয়গাম দেয়। কিন্তু মালেক এর মতো ইনিও ছিলেন মুশরেক। আগে তার এবং মালেকের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির যে কারণ ছিল, এখানেও তাই অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। তাই হযরত উম্মে সুলাইম আপত্তি করে বলেন, আমি তো মুহাম্মদ (সা:) এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। অবশ্য তোমাদের জন্য আফসোস যে, তোমরা পাথরের বা কাঠের মূর্তির পূজা কর, যা তোমাদের ভালো-মন্দ কিছুই করতে পারে না। এ কথাগুলো এমন হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়, যাতে ইসলামের সত্যতা আবূ তালহার কাছে প্রতিভাত হয় এবং কয়েক দিন চিন্তা করার পর তিনি উম্মে সুলাইমের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫]

আবূ তালহা ছিলেন খুব মামুলী ধরনের লোক। কিন্তু যেহেতু তিনি উম্মে সুলাইমের কথা মতো ঈমান এনেছেন, তাই উম্মে সুলাইমের কাছে তার সত্য প্রীতির মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ইসলাম গ্রহণ করার পরই তিনি আবূ তালহাকে বলেন ঃ

আমি তোমাকে বিয়ে করেছি, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মোহরানা তোমার কাছ থেকে নেবো না। অর্থাৎ তালহার ইসলাম গ্রহণই তার মোহরানা সাব্যস্ত হয়।[৬] এ বিয়ে হয় হযরত আনাস-এর উদ্যোগে।[৭]

অন্যান্য মুসলিম নারীর মতো হযরত উম্মে সুলাইমও পুরুষের পাশাপাশি অনেক যুদ্ধে অংশ নেন এবং নিয়মিত কাজ করেন। ছহীহ্ মুসলিমে এ আছে ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم يَغْزُوْ بِامِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٌ مِنَ الاَنْصَارِ مَعَهُ اِذَا غَزَا فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى.

নবীজী যুদ্ধে উম্মে সুলাইম ও অন্যান্য আনছারী মহিলাদেরকে সঙ্গে রাখতেন। তিনি যখন যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতেন, তখন এসব মহিলারা পানি পান করাতো এবং আহতদের সেবা করতো।[৮]

ওহোদের যুদ্ধে হযরত উম্মে সুলাইম স্বামী তালহাসহ অংশ নেন। আবূ তালহা নবীজীর খেদমতে দুশমনদের তীর-তরবারী ও বর্শা বুক পেতে নেন। আর উম্মে সুলাইম অতি যোগ্যতার সাথে মুজাহিদদের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। হযরত আনাস বলেন, আমি আয়েশা এবং উম্মে সুলাইমকে মশক ভরে পানি এনে আহতদেরকে পান করাতে দেখেছি। মশক খালি হলে আবার তা ভরে আনতেন।[৯] সপ্তম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত উম্মে সুলাইম এতেও নবীজীর সাথে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর হযরত ছফিয়্যা যখন নবীজীর স্ত্রীভুক্ত হন, তখন হযরত (সা) নববধূকে সাজিয়ে দেয়ার ভার দেন উম্মে সুলাইমকে।[১০] হযরত উম্মে সুলাইম হোনাইনের যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে আবূ তালহা নবীজীকে গিয়ে বলেন, যে, উম্মে সুলাইম হাতে খঞ্জর ধারণ করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কি করবে? বললেন, কোন মুশরেক আমার কাছে এলে এ দিয়ে তার ভুঁড়ি কেটে ফেলবো। তার জবাব শুনে নবীজী হাসেন। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আইকার লোকেরা পলায়ন করেছে। তাদেরকে হত্যার অনুমতি দিন। আঁ-হযরত বললেন ঃ إنَّ الله قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ -আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি তাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করেছেন।[১১]

আবূ তালহার সাথে বিয়ে হওয়ার পর নবীজী মদীনায় এলে হযরত উম্মে সুলাইম পুত্র আনাসকে নবীজীর খেদমতে পেশ করেন। হযরত আনাস ছিলেন নবীজীর বিশেষ খাদেমের একজন। তিনি ছিলেন আঁ-হযরতের অতি প্রিয়পাত্র। নবীজী একবার হযরত উম্মে সুলাইমের গৃহে তাশরীফ আনলে তিনি মাখন এবং খেজুর খেতে দেন। তিনি উম্মে সুলাইম এবং তাঁর পরিবারের জন্য দোয়া চান। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনাস আপনার খাদেম। আমি তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি তার বিশেষভাবে দোয়া করুন।

নবীজী তার জন্য দোয়া করলেন। দ্বীন-দুনিয়ার কোন খুবীর কথাই বাদ দিলেন না। তিনি বললেন ঃ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْهُ مَالاً وَوَلَداً وَبَارِكْ لَهُ.

প্রভু হে! তাকে মাল দাও আওলাদ দাও, তার হায়াতে বরকত দাও। নবীজীর এ দোয়ার বরকতে হযরত আনাস ছিলেন আনছারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মালদার ব্যক্তি। তার বয়স ছিল সবচেয়ে বেশি। তার আওলাদ হয়েছিল সবচেয়ে বেশী এবং হায়াতও পেয়েছিলেন তিনি একশত বছরের অধিক।

হযরত আনাস নিজেই বলেন ঃ

আমি আনছারদের মধ্যে সবচেয়ে মালদার ব্যক্তি। বছরায় হাজ্জাজের আগমন পর্যন্ত আমার ঔরস থেকে একশ উনত্রিশ জন সন্তান দাফন হয়েছে।[১২]

হযরত আবূ তালহার ঔরসে আবূ উমাইর নামে তার এক পুত্র হয়। অল্প বয়সেই আবূ উমারইর মারা যায়। একবার নবীজী আবূ তালহার গৃহে গমন করেন। আবূ উমাইরকে বিষণ্ন দেখে তিনি উম্মে সুলাইমকে জিজ্ঞেস করেন, কি ব্যাপার? আজ আবূ উমাইর এত মনমরা কেন? উম্মে সুলাইম বললেন, তার একটা পাখি ছিল। পাখিটি নিয়ে সে খেলা করতো। পাখিটি মারা গেছে, তাই সে বিষণ্ন। নবীজী তাকে ডেকে মাথায় হাত রাখেন, আদর করে বলেন ঃ

يَاأَبَا عُمَيْرٍ مَافَعَلَ النُّغَيْرُ.

আবূ উমাইর! তোমার নাগীর পাখিটা কোথায়? সে হেসে ফেলে। আর তখন থেকে নবীজীর বরকত হিসেবে এটা একটা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে।[১৩] নবীজীর সাথে হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ-এর বিয়ে উপলক্ষে হযরত উম্মে সুলাইম একটা বারকোশে করে কিছু হাদিয়া পাঠান হযরত আনাস-এর মারফত এবং তা গ্রহণ করার জন্য হযরতের প্রতি অনুরোধ জানান।[১৪]

তিনি ছিলেন পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী মহিলা। ধৈর্য-শৈর্য ছিল তাঁর বিশেষ গুণ। আগেই আবূ উমাইর-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই আবূ উমাইর মারা গেলে তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তাকে গোসল করান, কাফন পরান এবং এক পাশে লাশ রেখে দেন। আবূ তালহাকে না জানাবার জন্য সকলকে বলে দেন। আবূ তালহা তখন ঘরে ছিলেন না। বাইরে কোথাও

গিয়েছিলেন। রাতে ঘরে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করেন, আবূ উমাইর কেমন আছে। তিনি জানালেন, তুমি যে অবস্থা দেখে গেছে, তার চেয়ে ভালো আছে। এরপর তিনি স্বামী আবূ তালহাকে খানা-দানা করান। ঘরের সব কাজকর্ম সেরে অনেক রাত হলে অতি শান্তভাবে স্বামীকে বলেন, আবূ তালহা! কাউকে যদি কোন জিনিস ধার দেওয়া হয় আর তা দ্বারা সে ব্যক্তি উপকৃত হয়, এরপর ধার দেয়া জিনিস যদি ফেরত নেয়া হয়, তবে কি তার খারাপ লাগা উচিত? আবূ তালহা বললেন, এটা তো ইনসাফের কথা নয়। বললেন, তবে শোন, তোমার শিশুও ছিল আল্লাহ্র আমানত, তিনি তা ফেরত নিয়ে গেছেন। এটা শুনে আবূ তালহা ইন্নালিল্লাহ পড়লেন। ভোর হলে এ সম্পর্কে নবীজীকে জানান হয়। তিনি পিতা-মাতার ধৈর্যের কাহিনী শুনে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দোয়া করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আবূ উমাইর এর পরিবর্তে উত্তম প্রতিদান দিবে। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ উমাইর এর পরিবর্তে তাকে পুত্র আব্দুল্লাহ্ দান করেন। নবীজী নিজে যার লালন-পালন করেছেন।[১৫] নবীজীর দোয়ার বরকতে হযরত আবদুল্লাহ্ বড় কামেল হয়েছিলেন এবং তার সন্তানদের মধ্যে দশ জন প্রসিদ্ধ কারী হয়েছিলেন।[১৬]

তিনি নবীজীকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন, ভালোবাসতেন। একবার আবূ তালহা ঘরে এসে বললেন, নবীজীর ঘরে খাবার কিছুই নেই, কিছু খাবার পাঠিয়ে দাও। হযরত উম্মে সুলাইম একটা কাপড়ে পেঁচিয়ে কয়েকটি রুটি হযরত আনাসের হাতে দিয়ে বললেন, হযরতের দরবারে এ রুটি পৌছে দাও। হযরত তখন কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে মসজিদে বসেছিলেন। হযরত আনাসকে দেখে বললেন, হযরত আনাসের হাতে দিয়ে বললেন, হযরতের দরবারে এ রুটি পৌছে দাও। হযরত আনাসকে দেখে বললেন, আবূ তালহা তোমাকে পাঠিয়েছে। তিনি বললেন, জ্বি। নবীজী উপস্থিত সাহাবীদেরকে নিয়ে আবূ তালহার গৃহে এলেন। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে উম্মে সুলামকে বললেন, এখন কি করা যাবে? খাবারতো খুবই সামান্য। নবীজীর সাথে লোকতো অনেক। হযরত উম্মে সুলাইম অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জবাব দেন, আল্লাহ্ ও তার রাসূল এসব বিষয়ে ভালো জানেন। আবূ তালহা ভিতরে এলে তিনি সে রুটি এবং তরকারী পেশ করেন। রাসূল (সাঃ) সকল সাহাবীকে নিয়ে তা খান।[১৭]

তিনি নবীজীকে কতো ভালবাসতেন, নিচের ঘটনা থেকে তা আঁচ করা যায়। হজ্জ্ব সমাপনান্তে নবীজী মিনায় চুল কাটালে উম্মে সুলাইম আবু তালহাকে বলেন, হাজ্জামের কাছ থেকে হযরতের মোবারক চুলগুলো চেয়ে নাও। সেগুলো চেয়ে আনার পর বরকতের উদ্দেশ্যে তিনি তা একটা শিশিতে পুরে রাখেন।[১৮]

নবীজী অধিকন্তু তার গৃহে আরাম করতেন। একবার ঘুম থেকে জেগে দেখেন, উম্মে সুলাইম চেহারা মোবারক থেকে ঘাম মুছছেন। বললেন, উম্মে সুলাইম! তুমি এটা কি করছো? বললেন, বরকত হাসিল করছি।[১৯] মুসনাদে আহমাদে এ বর্ণনাটি বিবৃত হয়েছে একটু পরবর্তন করে। এতে বলা হয়েছে যে, আঁ-হযরত দুপুরে ঘুমিয়ে উঠলে তিনি ঘাম এবং ঝরে পড়া চুল কুড়িয়ে নিয়ে একটা শিশিতে পুরে রাখেন।[২০] একবার নবীজী তার মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করেন। হযরত উম্মে সুলাইম মশকের মুখ কেটে রেখে দেন। কারণ, হযরতের মোবারক মুখ তা স্পর্শ করেছে।[২১]

তার প্রতি রাসূলেরও এমনি ভালোবাসা ছিল। নবীজী তার প্রতি বিশেষ আচরণ করতেন এবং তার মঙ্গল ও বরকতের জন্য দোয়া করতেন। ছহীহ মুসলিম এ বর্ণিত হয়েছে ঃ

كَانَ النَّبِيُّ صَلْعَم لاَيَدْخُلُ عَلَى اَحَدَ مِنَ النِّسَاءِ الاَّ عَلَى اَزْوَاجِه الاَّ اُمَّ سُلَيْمٍ فَانَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا- فَقِيْلَ لَهُ فِىْذلكَ فَقَالَ اِنِّىْ اَرْحَمُهَا قُتِلَ اَخُوْهَا مَعِى.

নবীজী স্ত্রীদের ছাড়া অন্য কোন নারীর ঘরে যেতেন না। অবশ্য উম্মে সুলাইম এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তার প্রতি আমার দয়া হয়। কারণ তার ভাই আমার সহযোগিতায় গিয়ে জীবন দিয়েছে।[২২]

কোন কোন সময় তিনি উম্মে সুলাইমের গৃহে থাকতেন। নামাযের সময় হলে চাটাই বিছিয়ে নামায পড়ে নিতেন।[২৩] একবার নবীজী হজ্জ্বের জন্য মক্কা গমন কালে উম্মে সুলাইমকে বলেন, তুমি এবার আমার সাথে হজ্জ্ব করবে না? তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামীর কাছে মাত্র

দুটি যানবাহন ছিল। তিনি তার পুত্রসহ তা নিয়ে হজ্জে চলে গেছেন। আমাকে একা রেখে গেছেন। নবীজী আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের সাথে তাকেও তুলে নেন। পথে নারীদের উট পেছনে পড়ে যায়। চালক ছিল তার গোলাম আঞ্জাশা। সে উট হাঁকার গান জুড়ে দেয়। এর ফলে উট তীব্র গতিতে ছুটে চলে। নবীজী কাছে এসে বললেন, আঞ্জাশা, ধীরে চলো, ধীরে, এরা কাঁচের মত।[২৫]

হযরত উম্মে সুলাইম যেভাবে শিশুদের লালন-পালন করেন, হযরত আনাস-এর নিম্নোক্ত উক্তি থেকে তা অনুমান করা যায় ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার মাতাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।

হযরত উম্মে সুলাইম ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি এবং পরিপূর্ণ নারী। তার প্রজ্ঞা-বুদ্ধিমত্তা ছিল অত্যন্ত প্রখর। ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর তার সম্পর্কে লিখেন ঃ

كَانَتْ مِنْ عُقَلَاءِ النِّسَاءِ.

তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতি মহিলাদের অন্যতম।

হাদীস শাস্ত্রে তার ভালো জ্ঞান ছিল। লোকেরা তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করে সন্দেহ দূর করতো। একবার একটা মাসআলা নিয়ে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে উভয়ে তাকে সালিশ মানেন।[২৬]

মাসায়েল জিজ্ঞেস করায় তিনি কোন লজ্জাবোধ করতেন না। একবার নবীজীর নিকট আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বপ্নে কি নারীর উপরে গোসল ওয়াজেব? উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা শুনছিলেন। তিনি শুনেই হেসে ওঠেন এবং বলেন, তুমি নারীদেরকে বড় কলংকিত করলে। নারীদেরও কি এমনটা হয়? নবীজী বললেন, কেন হবে না? না হলে শিশু মায়ের আকৃতি পায় কেন?[২৭]

আবূ ত্বালহার ইসলাম গ্রহণের বিষয় পূর্বে আলোচিত হয়েছে। যে সুন্দরভাবে তিনি তাকে দাওয়াত দেন, তা তার বুদ্ধির পরিপক্কতার বিশেষ

পরিচায়ক। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী আল-এছাবাহ গ্রন্থে তার প্রচার ভঙ্গি সম্পর্কে বলেন ঃ

তিনি বলেন, আবূ তালহা! তুমি জাননা যে, তোমার মা'বূদ মাটির সৃষ্টি? বললো হ্যাঁ, তিনি বললেন, তবে গাছের পূজা করতে তোমার কি লজ্জা করে না?[২৮]

হযরত উম্মে সুলাইমের বৈশিষ্ট্য অনেক। নিচের হাদীস থেকে তার বৈশিষ্ট্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

قَالَ النَّبِيُّ صَلْعَمَ دَخَلْتُ الْجَنَّتُ فَسَمِعْتَ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقِيْلَ الرُّمَيْصَاءُ بِنْتُ مَلْحَانَ.

নবীজী বলেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে কি যেন একটা শব্দ শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? বলা হলো ,রুমাইছা বিনতে মালহান।[২৯]

হযরত উম্মে সুলাইম থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আনাস, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত, হযরত আবূ সালমা এবং হযরত আমর ইবনে আছেম তার কাছ থেকে এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩০]

তার মৃত্যুর সন-তারিখ জানা নেই। খুব সম্ভব খেলাফতে রাশেদার প্রথম দিকে তিনি ইন্তিকাল করেছেন।

১. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩১০, উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৯১, ২. আল এছাবাহ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৮৯১, ৩. ঐ ৪. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩১১, ৫. ঐ, ৬. ঐ, ৭. ঐ পৃষ্ঠা ৩১২, ৮. ছহীহ মুসলিম ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৫৩, ৯. ঐ, ১০. ছহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৫০, ১১. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩১১, ১২. ঐ পৃষ্ঠা ৩১৪, ১৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৩১৩, ১৪. ছহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৫০, ১৫. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩১৬, ১৬. আল-এছাবাহ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৮৩৮, ১৭. ছহীহ মুসলিম ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৪২, ছহীহ বুখারী, ২য় খন্ড ৮১০, ১৮. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩১৩, ১৯. ঐ, ২০. মুসনাদ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ২৯২, ২১. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩১৩, ২২. ঐ পৃষ্ঠা ৩৪১, ২৩. ঐ পৃষ্ঠা ৩১৩, ২৪. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩১৫, ২৫. ঐ পৃষ্ঠা ৩১২, ২৬. মুসনাদ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৪৩০, ২৭. ছহীহ বুখারী, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬২৯. ২৮. আল-এছাবাহ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৮৯২, ২৯. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩১৪, ছহীহ মুসলিম ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪২, ৩০. আল-এছাবাহ, ২য় পৃষ্ঠা ৮৯২।

হযরত উম্মে রুমান বিনতে 'আমের (রাঃ)

উম্মে রুমান তার নাম নয়, কুনিয়াত। আসল নাম জানা যায় না। তিনি ছিলেন বনু কেনানার কেরাস গোত্রের মহিলা।[১] বংশধারা হলো, উম্মে রুমান বিনতে আমের ইবনে উয়াইমির ইবনে আবদে শাম্‌স ইবনে আযীনা ইবনে সাবী' ইবনে ওয়াহমান ইবনে হারেস ইবনে গানাম ইবনে মালেক ইবনে কেনানা।[২]

আবদুল্লাহ্ ইবনে হারেস ইবনে সানজারার সাথে তার বিয়ে হয়। স্বামীর সাথে তিনি মক্কায় বসবাস করেন। এখানে হযরত আবদুল্লাহর ঔরসে তার এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। শিশু পুত্রের নাম রাখা হয় তোফায়েল। স্বামী আব্দুল্লাহর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর সাথে তার বিয়ে হয়। এই রিশতায় তোফায়েল ছিলেন হযরত আয়েশা ও হযরত আব্দুর রহমানের দুধ ভাই। অর্থাৎ তাদের বাপ এক, মা দুই। মানে হযরত আয়েশা ও হযরত আবদুর রহমান ছিলেন হযরত আবূ বকর এর ঔরসের সন্তান আর হযরত তোফায়েল ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেস এর ঔরসজাত।[৩] তিনি হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর সাথে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আয়েশার আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত উম্মে রুমান এর হিজরত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কেবল এটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, হযরত আবূ বকর নবীজীর সাথে হিজরত করেন, পরিবার-পরিজন মক্কায় ছিলেন। আবূ রাফে এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আরীকতকে মক্কায় পাঠানো হলে তাদের সাথে উম্মে রুমানও মদীনা গমন করেন।[৪]

৬ষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে হযরত আবূ বকর আছহাবে ছুফফার তিনজন বুজুর্গকে নিজ গৃহে নিয়ে আসেন। একদিন তিনি নবীজীর কাছে যান। বাসায় ফিরতে দেরী হলে হযরত উম্মে রুমান জিজ্ঞেস করেন, ঘরে মেহমান রেখে কোথায় গিয়ে বসে রয়েছেন ? বললেন,তুমি তাদেরকে খাবার দাওনি? তিনি জবাব দেন, খাবার পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তারা খায়নি। এরপর খাবার দেয়া হয় এবং তাতে এত বরকত হয় যে,অনেক খাবারই বেঁচে যায়। হযরত আবূ বকর (রা) উম্মে রুমানকে জিজ্ঞেস করেন,এখন কতটা খাবার আছে? বললেন, তিনগুণেরও বেশি। অতিরিক্ত সব খাবার নবীজীর খেদমতে প্রেরণ করা হয়।[৫]

হযরত উম্মে রুমানের ইন্তিকালের তারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন ৪ হিজরী,আর কারো কারো মতে ৬ হিজরী। কিন্তু এর কোনটিই ঠিক নয়। হযরত উম্মে রুমান ৯ হিজরী বা তার কিছু পরে ইন্তি কাল করেন।হাফেয ইবনে হাজার আল এছাবাহ গ্রন্থে দলীল দিয়ে প্রমাণ করেন যে, ৯ হিজরীর আগে তার ইন্তিকাল হয়নি।[৬]

ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ তার সম্পর্কে বলেন, উম্মে রুমান ছিলেন নেককার মহিলা। তার লাশ কবরে রাখার পর নবীজী বলেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى امْرَاَةٍ مَعَ الحُوْرِ الْعِيْنِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى اُمِّ رُوْمَانَ.

যে ব্যক্তি নারীদের মধ্যে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুর দেখতে আনন্দ পায়, সে যেন উম্মে রুমানকে দেখে। হযরত আফফান-এর হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত (সাঃ) নিজে তাকে কবরে নামান।[৭]

১. ছহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৫, ২. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২০২, ৩. আল-এস্তীআব, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৯২, ৪. ঐ, ৫. ছহীহ বুখারী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫, ৬. আল এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৮৪, ৭. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২০২।

৩৯

হযরত শেফা' বিনতে আবদুল্লাহ্ (রাঃ)

তার নাম শেফা'। বংশধারা হচ্ছে শেফা বিনতে আবদুল্লাহ ইবনে আবদে শামস ইবনে খালফ ইবসে সদাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে কুরত ইবনে রযাহ ইবনে আদী ইবনে কা'আব। তিনি ছিলেন কোরাইশ বংশের আদী খান্দান উদ্ভূত।[১] তার মাতা ছিলেন ফাতিমা বিনতে আবূ ওয়াহাব ইবনে আমর ইবনে আয়েয ইবনে আমর ইবনে মাখ্যূম।[২] আবূ হাসমা ইবনে হোযাইফার সাথে তার বিয়ে হয়।[৩] হিজরতের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। যে সব মহিলা প্রথমে হিজরত করেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম।[৪]

নবীজী তার ভক্তি-ভালোবাসার কদর করতেন। কখনো তার ঘরে গেলে সেখানেই বিশ্রাম নিতেন। তিনি নবীজীর জন্য বিছানা এবং একটা তহবন্দ পৃথক করে রেখেছিলেন। এগুলো নবীজী ব্যবহার করতেন। নবীজীর পর এটা তার সন্তানদের নিকট অতি যত্নের সাথে রক্ষিত ছিল। কিন্তু পরে মারওয়ান এসব অধিকার করে নেয়। যার ফলে এ বরকত তার বংশের কাছ থেকে চলে যায়।[৫] হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে বিশেষ মূল্য দিতেন, তার অভিমতকে প্রাধান্য দিতেন, তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন এবং বাজারের দায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত করতেন।[৬] নবীজী তাকে একটা ঘর দান করেন। তিনি পুত্র সুলাইমানকে নিয়ে এ গৃহে বসবাস করতেন।

একবার হযরত উমর (রাঃ) তাকে ডেকে এনে চাদর দান করেন এবং আতেকা বিনতে উসাইদকে তার চেয়ে ভালো চাদর দিলে তিনি বলেন, তোমার হাত ধূলো-মলিন হোক। তুমি তাকে আমার চেয়ে ভালো চাদর দিয়েছ, অথচ আমি তার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমিতো তোমার চাচাত বোন। এছাড়াও তুমি আমাকে ডেকে এনেছ, আর সে নিজেই

এসেছে। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, তোমাকে ভালো চাদর দিতাম কিন্তু তিনি চলে আসায় তার প্রতি লক্ষ্য আরোপ করতে হয়েছে। কারণ, বংশধারায় তিনি নবীজীর নিকটতম।[৭]

তিনি পিপীলিকা ও সর্প কাটার মন্ত্র জানতেন এবং কিছুটা লিখতেও জানতেন। জাহেলী যুগে এ দু'টি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখা হতো। একবার তিনি নবীজীর খেদমতে হাযির করেন, আমি জাহেলী যুগে ঝাড়-ফুঁক করতাম। অনুমতি পেলে এ মন্ত্র আরম্ভ করবো। তিনি অনুমতি দিয়ে বলেন, এ মন্ত্র দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করবে, এবং হাফছাকেও শেখাবে।[৮]

এক বর্ণনায় দেখা যায়, নবীজী তাকে বলেন ঃ

عَلِّمِي حَفْصَةَ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِهَا الْكِتَابَةَ.

তুমি হাফছাকে যেমন লেখা শিখিয়েছ, তেমনি তাকে পিপীলিকা কাটার মন্ত্রও শিখাও। এ থেকে জানা যায় যে, উম্মুল মু'মেনীন হযরত হাফছা তাঁর কাছে লিখাও শিখেছেন।[৯] তিনি হযরত (সাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) থেকে কয়েকটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। রাবীদের মধ্যে তার পুত্র সুলাইমান, পৌত্র, আবূ বকর এবং ওসমান ছাড়াও আবূ সালমা, আবূ ইসহাক এবং উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফছাও অন্তর্ভুক্ত আছেন।[১০] খোলাছা গ্রন্থের রচয়িতার মতে তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২টি।

তার এক পুত্র সুলাইমান এবং এক কন্যা সম্পর্কে জানা যায়। তার কন্যাকে শারজীল ইবনে হাসানার সাথে বিয়ে দেয়া হয়।[১১]

তার মৃত্যুর সাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

১. আল-এছাবাহ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬৫৬, ২. উসুদুল গাবাহ, ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৮৬, ৩. তবকাত, ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৯৬, ৪. আল-এছাবাহ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬৫৬, ৫. আল-এস্তী আব, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৬২, ৬. আল-এছাবাহ. ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬৫৬, ৭. উসুদুল গাবাহ, ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৯৭. ৮. ৯. ১০. আল-এছাবাহ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা৬৫৬. ১০. আল-এছাবাহ. ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬৫৬, ১১. উসুদুল গাবাহ, ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৮৭।

হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে 'আকাবা (রা:)

তার আসল না অজানা। উম্মে কুলসুম নাম নয়, কুনিয়াত। বংশধারা হলো উম্মে কুলসুম বিনতে আকাবা ইবনে আবূ মুঈত ইবনে আবূ আমর ইবনে উমাইয়্যা ইবনে আবদে শাম্‌স ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কোছাই।[১] হযরত ওসমান এবং তার মাতা ছিলেন এক-আরদা বিনতে কোরাইয। এ রিশতায় তিনি ছিলেন হযরত ওসমানের বৈপিত্রিক বোন। মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরতের পূর্বে বায়আত করেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধিতে মুশরেকদের সাথে চুক্তি হয়েছিল যে, কোরাইশের কোন ব্যক্তি, সে মুসলমানই হোক না কেন-মদীনায় এলে তাকে ফেরত দেয়া হবে। মদীনাবাসীদের জন্য ছিল একই শর্ত।[২] উম্মে কুলসুম বিনতে আকাবা হোদায়বিয়ার সন্ধির পর বনু খোযা'আর এক লোকের সাথে পায়ে হেঁটে মদীনায় হিজরত করেন। ওয়ালীদ ও আম্মারা নামে তার দু'ভাই ছিল। জানতে পেরে তারাও পেছনে ছুটে আসে এবং উম্মে কুলসুমের পরদিন তারাও মদীনায় পৌঁছে তাকে ফেরত নেয়ার জন্য নবীজীকে বলে, আমাদের শর্ত পুরো করুন। ওদিকে হযরত উম্মে কুলসুম ফরিয়াদ করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নারী। আর নারীরা দুর্বল হয়ে থাকে। আমার আশংকা হচ্ছে, আপনি আমাকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাবেন না। চুক্তিতে যেহেতু নারীদের কথা উল্লেখ ছিল না, তাই এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ

بِاِيْمَانِهِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَاتَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ– (الممتحنة: ٩)

তোমরা যারা ঈমান এনেছ, মুমেন নারীরা তোমাদের নিকট হিজরত করে এলে তাদেরকে পরীক্ষা কর। তোমরা যদি জানতে পার যে, তারা মোমেন, তাহলে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত দেবে না। (মুমতাহিনাঃ ৯)

এ আয়াত অনুযায়ী নবীজী হযরত উম্মে কুলসুমকে ফেরত দিতে অস্বীকার করেন।[৩]

তখনো তার বিয়ে হয়নি। মদীনায় আগমন করার পর হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার সাথে তার বিয়ে হয়। মূতার যুদ্ধে হযরত যায়েদ শহীদ হলে হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু হযরত যুবায়ের এর মেযাজ ছিল কঠোর, তাই তার সাথে বনি-বনা হয়নি। বাধ্য হয়ে তাকে তালাক দিতে হয়। এরপর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তাকে বিয়ে করেন। তিনি মারা গেলে হযরত আমর ইবনুল আছ তাকে বিয়ে করেন। বিয়ের একমাস পর তিনি মারা যান।[৪] হযরত আমর ইবনুল আছ তখন মিশরের শাসনকর্তা।

হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম-এর ঘরে এক কন্যা যয়নব এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের ঔরসে ইবরাহীম, হামীদ, মুহাম্মদ এবং ইসমাঈল চার পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত যায়েদ এবং হযরত আমর ইবনুল আছ-এর ঔরসে কোন সন্তান হয়নি।

হামীদ ইবনে আব্দুর রহমান, হামীদ ইবনে নাফে[৫] এবং ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান প্রমুখ তার কাছ থেকে কিছু হাদীস বর্ণনা করেন।[৬] বুখারী-মুসলিম এবং আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় তার বর্ণিত হাদীসগুলো বর্তমান।[৭]

১. ও ২. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৬৭, ৩. ঐ, ৪. আল-এস্তী আব, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৯৪, ৫. ঐ, ৬. আল-এছাবাহ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৯৫২, ৭. ঐ।

৪১
হযরত ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (রাঃ)

তার নাম ফাতিমা, কুনিয়াত উম্মে জামীল। বংশধারা হলো, ফাতিমা বিনতে খাত্তাব ইবনে নোফইল ইবনে আবদুল ওয্যা ইবনে রুবাহ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে কোরত ইবনে রযাহ ইবনে আদী ইবনে কা'আব। তিনি ছিলেন হযরত উমর (রাঃ) এর বোন।[১] হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ-এর সাথে তার বিয়ে হয়।[২] স্বামীর সাথে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। যে দশজন মুসলমান সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন, এরা ছিলেন তাদের অন্যতম।[৩] তার ইসলাম গ্রহণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তার কারণে হযরত উমর ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত উমর তার ইসলাম গ্রহণের যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পর তিনি রাস্তায় বেরুলে জনৈক সাহাবীর সাথে তার সাক্ষাৎ এবং নিম্নোক্ত কথোপকথন হয় ঃ

হযরত উমর : তুমি পূর্ব পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদের (সাঃ) ধর্ম গ্রহণ করেছ?

সাহাবী : হ্যাঁ, কিন্তু একাজ তো তোমার নিকটাত্মীয়ও করেছে, আমার তুলনায় যার উপরে তোমার হক বেশি।

হযরত উমর : কে সে?

সাহাবী : তোমার বোন ও ভগ্নিপতি।

হযরত উমররের ক্রোধ ছিল অনেক বেশি। আরবের অন্যতম বীর পুরুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন খ্যাত। আর বেশি কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সোজা চলে যান তিনি বোনের বাসায়। দেখেন, ঘরের দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে কালামুল্লাহ্ শরীফ তেলাওয়াতের শব্দ ভেসে আসছে। ক্রুদ্ধ

হয়ে দরজা খোলান। জিজ্ঞেস করেন, এ কিসের শব্দ? তারা বললেন, কই, কিছুই না। তিনি আরও ক্ষেপে গেলেন। এমনকি ভগ্নিপতিকে জাপটে ধরলেন। স্বামীকে রক্ষার করার জন্য বোন এগিয়ে এলে চুল ধরে তাকে এমন মার দেন যে, গোটা দেহ রক্তাপ্লুত হয়ে যায়। কিন্তু এতেও তার দৃঢ়তায় একটুও ফাটল ধরেনি। বললেন, ওমর, যা খুশি করো। কিন্তু তোমার বিরোধিতার কারণে আমরা ইসলাম ত্যাগ করতে পারি না। এ জবাব হযরত উমরের উপর বিরাট ক্রিয়া করে। লজ্জায় তিনি অধোবদন হয়ে যান। বিদ্যুতের প্রবাহ মনের উপর ক্রিয়া করে। বললেন, তোমরা কি যেন পড়ছিলে, আমাকেও এটুকু শোনাও দেখি। ফাতিমা কুরআন মজীদের আয়াতগুলো সামনে এনে রাখরেন। হযরত উমর আয়াতগুলো পড়ছিলেন আর ভয়ে তার অন্তর প্রকম্পিত হচ্ছিলো। একটা আয়াতে পৌছে চিৎকার করে বলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র রাসূল।[৪]

স্বামী যায়েদ ইবনে সাবেত এর সঙ্গে তিনিও হিজরত করেন।[৫] আদ দুররুল মানসুর গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, জ্ঞানী-বুদ্ধিমতি ও নেককার মহিলা। ভাল কাজ পছন্দ করতেন, খারাপ কাজ তিনি ঘৃণা করতেন, ভালো কাজের নির্দেশ দিতেন আর মন্দ কাজ থেকে বারণ করতেন।[৬]

হযরত উমরের খেলাফতকালে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৭] তিনি চারজন পুত্র সন্তান রেখে যান- আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান, আযইয়াদ ও আসওয়াদ।

১. তবকাত-৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৯৫, ২. ঐ, এস্তীআব, ইত্যাদি, ৩. আদ-দুররুল মানসুর, ৪. আল-এছাবাহ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৩৪, আদ-দুররুল মানসুর. পৃষ্ঠা ৩৬৪, উসুদুল গাবাহ ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ৫৪. ৫. আল-এস্তীআব ২য় পৃষ্ঠা ৫৫৩, ৬. আদ-দুররুল মানসুর পৃষ্ঠা ৩৬৪. ৭. আল-এস্তী-'আব, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা-৫৫৩।

৪২

হযরত যয়নব বিনতে আবূ সালমা (রাঃ)

তার নাম যয়নব। গোত্রের নাম বনু মখযুম। বংশধারা-যয়নবক বিনতে আবূ সালমা ইবনে আবদুল আসাদ ইবনে হেলাল ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর মখযুম। তার মাতার নাম উম্মে সালমা। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর তাকে দুধ পান করান।[১] হাবশায় তার জন্ম হয়। এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, জন্মের পূর্বেই তার পিতা আবূ সালমা মারা যান।[২] হযরত আবূ সালমার যে বৎসর ইন্তিকাল হয়, সে বৎসরই ইদ্দত পালনের পর হযরত উম্মে সালমার সাথে নবীজীর বিয়ে হয়। যয়নব তখন দুধের শিশু। এ অবস্থায় মাতার সাথে তিনিও নবীজীর কাছে আসেন।[৩]

সাধারণ মানুষের প্রতি বিশেষ করে শিশুদের প্রতি নবীজীর স্নেহ-ভালোবাসা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়। শিশু যয়নবতো তার পোষ্য। এ কেন তার দানে দন্যা হবে না। তাকে মায়ের কোলে দুধ পান করতে দেখলে নবীজী ফিরে যেতেন।[৪] তিনি যখন হাঁটি হাঁটি পা পা করছেন, তখন নবীজী গোসল করার সময় তিনি কাছে এলে মুখে পানি ছিটিয়ে দিতেন। এর বরকতে বার্ধক্যেও তার চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি। শেষ পর্যন্ত তার চেহারায় যৌবনের দীপ্তি ছিল উজ্জ্বল।[৫]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যাম্‘আ ইবনে আসওয়াদ-এর সাথে তার বিয়ে হয়। তার ৬ পুত্র-আবদুর রহমান, ইয়াযীদ, ওয়াহাব, আবূ সালমা ও কবীর প্রমুখ এবং ৩ কন্যা-কারীবা, উম্মে কুলসুম ও উম্মে সালমা জন্ম গ্রহণ করেন। হাররার যুদ্ধে তার দুই সন্তান শহীদ হয়। শহীদদের লাশ তার সামনে আনা হলে তিনি ইন্নালিল্লাহ্ পড়ে বলেন, আমার উপর ভীষণ বিপদ এসেছে।[৭]

আল্লাহ্ তাআলা তাকে যে মর্যাদা ও পূর্ণতা দান করেছেন, তাতে তিনি ছিলেন একক। হযরত আবূ রাফে' বলেন, আমি মদীনার কোন মহিলা ফকীহ্র নাম উল্লেখ করলে তাতে যয়নবের নাম অবশ্যই থাকে।[৮]

আল্লামা ইবনে আবদুল বার লিখেন, তিনি নবীজীর নিকট থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং হযরত উম্মে সালমা, হযরত উম্মে হাবীবা ও হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ-এর কাছে কয়েকটি হাদীস শোনেন। তার সিলসিলায় যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের নাম হচ্ছে– আবূ ওবায়দা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যাম'আ, মুহাম্মদ ইবনে আতা, আরাক ইবনে মালেক, হামীদ ইবনে নাফে, ওরওয়াহ্ ইবনে যুবায়ের, আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমান এবং ইমাম যয়নুল আবেদীন প্রমুখ।

তার যখন ইন্তিকাল হয়, তখন তারেক মদিনার শাসনকর্তা। তাহযীব গ্রন্থে উক্ত হয়েছে যে, পুত্রদের শাহ্দাতের পরও তিনির ১০ বৎসর বেঁচে ছিলেন। ৭৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১০] তাকে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়।[১১] জানাযার নামাযে তারেকও অংশ নেন।[১২]

১. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৩৮, ২. আল-এছাবাহ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬০৭, ৩. ঐ, ৪. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৪৮, ৫. আল-এছাবাহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬-৮, ৬. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৩৮, ৭. আল-এস্তীআব ৩য় খন্ড. পৃষ্ঠা ৭৫২, ৮. আল-এছাবাহ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬০৮. ৯. আল-এস্তী'আব, ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৭৫৬. ১০. তাহযীব, ১৩শ খন্ড পৃষ্ঠা ৪২১, ১১. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৩৮, ১২. ঐ।

৪৩

হযরত উম্মে হাকীম বিনতে হারেস (রাঃ)

তার আসল নাম জানা যায় না। উম্মে হাকীম তার নাম নয়, কুনিয়াত। বংশধারা হলো, উম্মে হাকীম বিনতে হারেস ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে মাখ্যুম। কোরাইশের মাখযুম কাবীলার লোক। মাতার নাম ফাতিমা বিনতে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা। তার মাতা ছিলেন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদের বোন।[১]

তিনি কাফেরদের পক্ষে ওহোদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু মুসলমানদের মক্কা বিজযের পর অন্যান্যদের সাথে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন।[২] মাতা ফাতিমা বিনতে ওয়ালীদও তার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩]

ইকরামা তখনো শিরকে ডুবে আছে। পিতার মতো ইসলামের ঘোর বিরোধী, তখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য ইয়ামানে পলায়ন করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। এ কারণে তিনি নবীজীর নিকট স্বামীর নিপরাত্তার আবেদন জানান। নবীজী তা মনযুর করেন। এবার তিনি ইয়ামান গিয়ে ইকরামাকে নিয়ে আসেন। স্বদেশে ফিরে এলে তিনি স্বানন্দে ইসলাম গ্রহণ করেন। বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে গুণাহের কাফফারা আদায় করেন। হযরত আবূ বকরের (রা:) শাসনামলে রোমকদের সাথে যুদ্ধে উম্মে হাকীমকে সঙ্গে নিয়ে অংশ গ্রহণ করেন। আজনাদীনের যুদ্ধে বীরত্বের সাথে শাহাদাত লাভ করেন।

ইদ্দতের মুদ্দত চার মাস দশ দিন শেষ হওয়ার পর নানা দিক থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে। ইয়াযীদ ইবনে আবূ সুফিয়ানও আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তিনি সকলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আমকে বিয়ে করার জন্য উদ্যত হন। চারশ দিরহাম মোহরে বিয়ে হয়। তখনো তুলে

নেয়ার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়নি। মুসলমানরা যুদ্ধে 'মারাজ আছ-ছাফার' স্থানে উপস্থিত হলে হযরত খালিদ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে আগ্রহী হন। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু খালিদ বললেন, এ যুদ্ধে শাহাদাত লাভ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। তার কথায় হযরত উম্মে হাকীম চুপ করে যান। একটা পুলের কাছে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। পরে এ পুল্‌টি কানতারা-ই উম্মে হাকীম- (উম্মে হাকীম পুল) নামে খ্যাত হয়। ভোরে তাআমে ওয়ালীমার ব্যবস্থা করা হয়। এতে অনেককে দাওয়াত দেয়া হয়। খাওয়া-দওয়ার কাজ শেষ হওয়ার আগেই রোমকরা উপস্থিত হয়ে যায়। তাড়াহুড়া করে প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানরাও প্রতিরোধে বুক পেতে দেয়। হযরত খালিদ ইবনে সাঈদও ছুটে যান এবং তাঁবুর একটা খুঁটি তুলে নিয়ে বীরত্বের সাথে কাফেরদের উপর ঝাপিয়ে পড়েন। ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেন যে, এ খুঁটি দিয়েই তিনি কাফেরদেরকে হত্যা করেছেন।[৪]

তার ওফাতের তারিখ এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

১. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৯১, ২. আল-এস্তীআব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৯০, ৩. . তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৯১,
৪. যুদ্ধ সম্পর্কিত গোটা আলোচনা আল-এস্তীআব, ২য় খন্ড ৭৯০ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

44

হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ)

নাম খাওলা। উম্মে শোরাইক কুনিয়াত। বনু সুলাইম বংশোদ্ভূত। বংশধারা- খাওলা বিনতে হাকীম ইবনে উমাইয়্যা ইবনে হারেস ইবনে আওকাছ ইবনে মুররা ইবনে বেলাল ইবনে ফালেহ্ ইবনে যাকওয়ান ইবনে সা'লাবা ইবনে বাহ্সা ইবনে সুলাইম।[১] রিশতায় তিনি ছিলেন নবীজীর খালা।[২] অতি উঁচু স্তরের সাহাবী হযরত ওসমান ইবনে মাযউনের সাথে তার বিয়ে হয়।[৩]

বিয়ের পরই ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরী দ্বিতীয় সালে বদর যুদ্ধের পর হযরত ওসমান ইবনে মাযউন ইন্তিকাল করলে তিনি আর বিয়ে করেননি। তিনি অধিকাংশ সময় চিন্তিত থাকতেন। বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি নিজেকে নবীজীর খেদমতে পেশ করেছিলেন।[৪] আল-এস্তীআব গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়, তিনি ছিলেন নেককার এবং মর্যাদাবান মহিলা।[৫]

মুসনাদ গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি দিনে রোযা রাখতেন, রাতে ইবাদাতে কাটাতেন।[৬]

অলংকারের প্রতি তার বেশ মোহ ছিলো। একবার নবীজীকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তায়েফ বিজয় হলে আমাকে বাদিয়া বিনতে গায়লান বা ফারেআ বিনতে আকীল-এর অলংকার দেবেন। নবীজী বললেন, আল্লাহ্ তার অনুমতি না দিলে আমি কি করবো।[৭]

নবীজী থেকে তিনি কয়েকটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। তার কাছ থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তারা হচ্ছেন, হযরত সা'আদ ইবনে আবূ ওয়াককাছ, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, হযরত বিশ্‌র ইবনে সাঈদ, হযরত ওরওয়া প্রমুখ।[৮] বলা হয়ে থাকে যে, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা পনর। ওফাতের সন তারিখ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

১. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৪৪, ২. মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৩০৯, ৩. উসুদুল গাবাহ, পৃষ্ঠা ৪৪৪, ৪. আল এস্তী'আব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৪২, ৫. ঐ, ৫. মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৯, ৭. আল এস্তী'আব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৪৩, ৮. আল-এছাবা, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৫৫৬।

৪৫

হযরত হাম্‌না বিনতে জাহাশ (রাঃ)

নাম হামনা। তিনি উম্মুল মু'মেনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ এর বোন। হযরত যয়নব সম্পর্কে আলোচনায় তার বংশধারা উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। হযরত মুসআব ইবনে উমাইর এর সাথে তার বিয়ে হয় এবং সম্ভবত তার সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেন। যে সব মহিলা হিজরত করেছেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি ওহোদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দেন। পিপাসার্তদেরকে পানি পান করান, আওদের সেবা করেন এবং তাদেরকে নিজ গৃহে পৌছানোর দায়িত্ব পালন করেন। এ যুদ্ধেই হযরত মুসআব ইবন উমাইর শহীদ হন। তার পরে হযরত তাল্‌হার সাথে বিয়ে হয়। নবীজী হযরত তালহাকে জান্নাতী বলে সু সংবাদ দেন। ইফ্‌ক বা হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনায় তিনিও জড়িত ছিলেন। হযরত আয়েশা সম্পর্কে আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে এর উল্লেখ রয়েছে।[১]

নবীজী থেকে কিছু হাদীসও বর্ণনা করেন। পুত্র ইমরান ইবনে তালহা তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদের বর্ণনা মতে তার গর্ভে হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর এর ঔরসে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।[২] কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় হযরত তালহার ঔরসে তার গর্ভে দু'জন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়, মুহাম্মদ এবং ইমরান। মুহাম্মদের উপাধী ছিলো সাজ্জাদ। ওফাতের সঠিক সন-তারিখ জানা যায় না।

১. তাঁর সম্পর্কে গোটা আলোচনাটাই গৃহীত হয়েছে উসুদুল গাবাহ, ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪২৮ থেকে. ২. তবকাত ইবনে আসাদ, ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৮৫।

হযরত উম্মে আবূ হোরায়রা (রাঃ)

তার আসল নাম উমায়মা। পিতার নাম ছবীহ বা ছফীহ ইবনুল হারেস। হযরত আবূ হোরায়রা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন পর্যন্ত তিনি ছিলেন মুশরেক। হযরত আবূ হোরায়রা ছিলেন দরবারে নবুওয়্যাতের খাদেম। তাই তিনি মনে প্রাণে কামনা করতেন তার পিতা-মাতাও ইসলামের সৌভাগ্য থেকে যেন বঞ্চিত না থাকেন। এক দিন তিনি নবীজীর শানে বেআদবী করলে হযরত আবূ হোরায়রা মনে অত্যন্ত ব্যথা পান। তিনি কাঁদতে কাঁদতে নবীজীর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করেন, হুজুর! আমার মাতার জন্য দোয়া করুন, তিনি যাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজী দোয়া করলেন। ওদিকে তৎক্ষণাৎ দেখা দেয় তার মধ্যে পরিবর্তন। তখনই গোসল করে নতুন কাপড় পধিান করেন এবং হযরত আবূ হোরায়রার সামনে কালেমা পড়ে ইসলাম কবুল করেন। হযরত আবূ হোরায়রা আনন্দে আত্মহারা হয়ে নবীজীর দরবারে ছুটে যান। নবীজী আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদয় করেন।[১]

তার সন্তানদের মধ্যে হযরত আবূ হোরায়ারা সবচেয়ে বেশী খ্যাতী লাভ করেছেন। ওফাতের সন-তারিখ অজানা।

১. সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা- ৩৫৭।

৪৭

হযরত উম্মুদ দারদা (রাঃ)

ইসলামের ইতিহাসে এ নামে দু'জন মহিলা প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন। একই নামের এ দু'জন মহিলাই চিলেন নবীজীর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ দারদার স্ত্রী। এদের মধ্যে বড়জন ছিলেন মহিলা সাহাবী। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন-এর মতে তার নাম ছিলো খায়রা। তিনি ছিলেন আবূ হাদর আসলামীর কন্যা।[১]

হাফেয ইবনে আবদুল বার লিখেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি, বিদূষী, সুস্থ চিন্তাধারার অধিকারীণী এবং ইবাদত গুজার মহিলা।

নবীজী এবং স্বামী হযরত আবূ দারদার নিকট থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। মামুন ইবনে মেহরান তার শাগরেদ। তার কাছ থেকে হযরত মামুনের হাদীস শ্রবণ সম্পর্কে সমস্ত মুহাদ্দেসীনরা একমত। আল-এস্তীআব গ্রন্থে আরও কিছু রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঠিক নয়। কারণ, অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে, এদের কেউ হযরত উম্মে দারদার সময় পাননি।

হযরত ওসমানের (রাঃ) খেলাফত কালে হযরত আবূ দারদার ইন্তিকালের দু'বছর পূর্বে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১. গোটা আলোচনা আল-এস্তীআব ২য় খন্ড ৭৯১ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

হযরত উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)

তার নাম আমেনা। কুনিয়াত উম্মে খালিদ। বংশধারা আমেনা বিনতে খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আদ ইবনে উমাইয়্যা ইবনে আব্দে শাম্স। কোরাইশের বনু উমাইয়্যা বংশোদ্ভূত। মাতা হামীনা বিনতে খালফ ইবনে আসআদ ইবনে আমের। বনু খোজাআ বংশোদ্ভূত।

হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ হিজরত করে স্ত্রীসহ হাবশা গমন করে। সেখানে হযরত আমেনার জন্ম হয়। মশহুর সাহাবী হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম-এর সাথে তার বিয়ে হয়। শোধ-বোধ হওয়ার বয়স পর্যন্ত পিতা-মাতার সাথে তিনি হাবশায় অবস্থান করেন। তার যখন পুরোপুরি বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়, তখন পিতা তাকে নিয়ে নৌকা যোগে মদীনা শরীফ রওয়ানা হন। তখন নাজাশী ছিলো হাবশার শাসনকর্তা। তারা সফরের জন্য প্রস্তুত হলে নাজাশী তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা সকলে রাসূলে খোদার খেদমতে আমার সালাম পৌছাবে।

হযরত আমেনা বলেন, যারা রাসূলে খোদার খেদমেত নাজাশীর সালাম পৌছিয়েছেন, আমিও তাদের একজন।

তিনি নবীজী থেকে কয়েকটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন।[১] রাবীদের নাম হলো মূসা ইবনে ওকবা, ইবরাহীম ইবনে ওকবা, কুরাইব ইবনে সুলাইমান কেন্দী প্রমুখ।[২]

তার গর্ভে দু'টি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে- আমর ইবনে যুবায়ের এবং খালিদ ইবনে যুবায়ের।[৩]

১. তবকাত ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৭০, ২. উসুদুল গাবাহ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০১, ৩. ঐ।

৪৯

হযরত মু'আযা বিনতে আবদুল্লাহ্ (রাঃ)

তার নাম মুআযা। পিতার নাম আবদুল্লাহ্। বংশধারা-মুআযা বিনতে আবদুল্লাহ ইবনে জারীর আযযারীর ইবনে উমাইয়্যা ইবনে হারারা ইবনে হারেস ইবনে খাযরাজ। তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ সালুল এর দাসী। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের বদৌলতে আল্লাহ্ তাকে মুক্ত করেছেন। যে সব নারী ইসলাম গ্রহণের পর নবীজীর নিকট বায়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তিনিও ছিলেন তাদের একজন।

সহল ইবনে কোরযার সাথে তার বিয়ে হয়। সহল ইবনে কোরযার ইন্তিকাল বা তালাকের পর হোমাইর ইবনে আদীর সাথে তার বিয়ে হয়। হোমাইর তালাক দেয়ার পর আমের ইবনে আদীর সাথে বিয়ে হয়। সহল ইবনে কোরযার ঔরসে একজন পুত্র সন্তান– আবদুল্লাহ ইবনে সহল এবং একজন কন্যা সন্তান উম্মে মা'বাদ ইবনে সহল জন্ম গ্রহণ করে। হোমাইর ইবনে আদীর ঔরসে দু'জন জমজ পুত্র এবং একজন কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। পুত্র সন্তানদ্বয়ের নাম হারেস এবং আদী আর কন্যা সন্তানের নাম উম্মে সা'আদ। আমের এর ঔরসে কেবল একজন কন্যা সন্তান উম্মে হাবীব বিনতে আমের জন্ম গ্রহণ করে। আল-এস্তীআব গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন একজন বিদূষী মুসলিম মহিলা।

ইসলাম গ্রহণের পর আজাদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর অধিকারে। সে তার উপর নানা রকম যুলুম চালাতো। মুসলমানরা তাকে মুক্ত করে নিতে আসবে আর এ সুবাদে মোটা অংকের ফিদিয়া বা মুক্তিপণ আদায় করে নিতে পারবে এ মতলবে সে তাকে নানাভাবে কষ্ট দিতো। কিন্তু এতসব যুলুম-নির্যাতন তিনি অকাতরে বরণ করে নেন। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূর এ এরশাদ করেন ঃ

وَلَاتُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا.

তোমরা অপকর্মের জন্য দাসীদের উপর জবরদস্তী করবে না, যদি তারা সতী থাকতে চায়।

এ আয়াতটি তার শানে নাযিল করেন এবং কাফেরদের করতল থেকে তাকে মুক্ত করেন।

তার ওফাতের সন-তারিখ এবং অন্যান্য বিষয় জানা যায় না।

৫০

হযরত হাওয়্যা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ)

হযরত হাওয়্যা পিতার নাম ইয়াযীদ। বংশধারা-হাওয়্যা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে সেনান ইবনে কুরয ইবনে আওরা ইবনে আবদুল আ্শহাল। কায়েস ইবনে হাতীমের সাথে তার বিয়ে হয়। স্বামীর অগোচরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। স্বামী কায়েস মক্কায় আগমন করলে রাসূলে খোদা তার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তিনি অবকাশ চেয়ে বলেন, মদীনায় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করে নেই। নবীজী তাকে অনুমতি দিয়ে বলেন, তাহলে স্ত্রী থেকে দূরে থাকবে। স্ত্রীর সাথে সদাচারের অনুমতি দিয়ে জানান যে, তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেছেণ। কায়েস নবীজীর কথা পুরোপুরি মেনে নেন। তিনি এ সম্পর্কে জানতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন।

মুহাম্মদ ইবনে সালাম তরকাতুশ শু'আরা গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, কায়েস হযরত হাওয়্যাকে ইসলাম থেকে বারণ করার চেষ্টা করেন । নামাযে তিনি সিজদায় গেলে স্বামী কায়েস তাকে ফেলে দিতেন। আরো নানাভাবে কষ্ট দিতেন এ ঘটনা হিজরতের আগের। নবীজী তখন মক্কায় ছিলেন। কিন্তু মক্কায় অবস্থান করেও মদীনার আনছারদের সম্পর্কে তিনি খোঁজখবর রাখতেন। এ সময় হযরত হাওয়্যার ইসলাম গ্রহণ এবং স্বামীর অত্যাচার সম্পর্কে তিনি অবগত হন। কায়েস মক্কায় এলে রাসূলে খোদা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার স্ত্রী তো ইসলাম গ্রহণ করেছে। তুমি তার প্রতি যুলুম করছো। আমি চাই, এখন আর তাকে উত্যক্ত করবে না।

প্রথম এবং দ্বিতীয় বায়আতের মঝামাঝি সময়ে হযরত হাওয়্যা ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথম পর্যায়ে যারা ঈমান এনেছেন, তিনি ছিলেন তাদের একজন। তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা মত প্রকাশ করেছেন, হাওয়্যা ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম ছিলো সৌন্দর্য মন্ডিত।

৫১

হযরত উম্মুল খায়ের বিনতে ছাখর (রাঃ)

তার আসল নাম জানা যায় না। কুনিয়াত উম্মুল খায়ের। বংশধারা হলো, উম্মুল খায়ের বিনতে ছাখর ইবনে আমের ইবনে কা'ব ইবনে সা'আদ ইবনে তাইম ইবনে মুররাহ্। কোরাইশের তাইম কবীলায় তার জন্ম। তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক-এর মাতা। আবূ কোহাফার সাথে তার বিয়ে হয়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইসলাম গ্রহণ করে সর্বপ্রথমে যে কাজটি করেন, তা হচ্ছে, তিনি কাফেরদের প্রকাশ্যে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান। মুশরিকদের প্রতিশোধের স্পৃহা ক্ষিপ্ত করার জন্য এটা খুব একটা কম ছিল না। চারিদিক থেকে সকলে হৈ চৈ করে তার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং নানাভাবে তাকে কষ্ট দেয়। একদিন অনেকে মিলে তাকে ভীষণ প্রহার করে। মৃত্যু পথযাত্রী মনে করে বনূ তাইমের কিছু লোক একটা কাপড়ে জড়িয়ে তাকে ঘরে রেখে যায়। তিনি তখন সঙ্গাহীন। সঙ্গা ফিরে এলে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলে খোদার কি অবস্থা? পিতা-মাতা এবং খান্দানের অন্যান্য লোকেরা তাকে তিরস্কার করে। কিন্তু তার একই জিজ্ঞাসা। শেষ পর্যন্ত নবীজী নিজে উপস্থিত হন। তার কপালে চুমু খান এবং এ অবস্থা দেখে চক্ষু অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) আপন মাতার প্রতি ইঙ্গীত করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আমার মাতা। তার জন্য দোয়া করুন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দিন। হতে পারে আপনার বরকতে আল্লাহ্ তাকে দোযখের আযাব থেকে হেফাযত করবেন। নবীজী তার জন্য দোয়া করেন। ইসলাম কবুল করার জন্য তার প্রতি আহ্বান জানান। আল্লাহ্র কুদরত, তার অন্তর তখনি কুফরীর কালিমা মুক্ত হয়। সত্য তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে– তিনি তখনি কুফরীর কালিমা মুক্ত হন। সত্য তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বলেন, ইসলামের সূচনা পর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

স্বামী হযরত আবূ কোহাফার ইন্তিকালের পূর্বে ইন্তিকাল করেন।[২]

১. উসুদুল গাবাহ, ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৮০, ২. ঐ।

৫২

হযরত লায়লা বিনতে আবূ হাশমা (রাঃ)

তার নাম লায়লা। উম্মে আবদুল্লাহ্ কুনিয়াত। কোরাইশের 'আদী কবিলায় তার জন্ম। বংশধারা হলো লায়লা বিনতে আবূ হাশমা ইবনে গানেম ইবনে আমের ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওবায়েদ ইবনে উয়াইজ ইবনে আদী ইবনে কা'বা ইবনে লুওয়াই।[১] আমের ইবনে রবীআ আম্বরীর সাথে তার বিয়ে হয়।

স্বামীর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথমে হাবশায় এবং পরে মদীনায় হিজরত করেন। যে কয়জন মহিলা প্রথমে হিজরত করেন, তিনি ছিলেন তাদের একজন। তার আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি দু'কেবলার দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। অর্থাৎ প্রথম মুসলমানদের কেবলা ছিলো বায়তুল মুকাদ্দাস। পরে কেবলা হয়েছে কা'বা শরীফ। যেহেতু তিনি আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাই বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করাও তার জীবনে একটা গর্বের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

হাবশায় হিজরতের কথা স্বয়ং তার যবানীতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, হযরত উমর তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাই কাফেররা আমাদের উপর নির্যাতন চালাতো। বাধ্য হয়ে আমরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করার জন্য প্রস্তুত হই। কাফেলা রওয়ানা হবে। আমি উটের পিঠে বসা। এমন সময় হযরত উমর এসে জিজ্ঞেস করলেন, উম্মে আবদুল্লাহ্! কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? আমি বললাম তোমরা তো আমাদেরকে দ্বীনের জন্য অনেক কষ্ট দিয়েছ। খোদার রাজ্য তো সংকীর্ণ নয়। যেখানে স্থান পাই, চলে যাবো। আমের ইবনে রবী'আ এলে আমি তার কাছে সব কিছু খুলে বলি। হযরত উমরের মনে তখন যে এক প্রকার করুণার ভাব দেখা দেয়, তার

কাছে তাও বলি। আমের বললেন, তুমি চাও যে, ওমর ইসলাম গ্রহণ করুক? আমি বললাম হ্যাঁ, অবশ্যই চাই। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাই করেছেন। আমার মনের আশা পূর্ণ হয়েছে।

একবার তিনি নবীজীর সম্মুখে স্বীয় পুত্রকে বলেন, এসো আমি তোমাকে কিছু দেবো। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি দিতে চাও? তিনি বললেন, খেজুর। নবীজী বললেন তুমি তাকে কিছু না দিলে আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতাম।

১. উসুদুল গাবাই. ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৪১, গোটা আলোচনা উক্ত গ্রন্থ এবং আল-এস্তি আব ২য় খন্ড. ৭৭০ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

৫৩

হযরত খালিদা বিনতে কায়েস (রাঃ)

হযরত খালিদার বংশধারা- খালিদা বিনতে কায়েস ইবনে সাবিত ইবনে খালিদ ইবনে আশজা। তিনি ওয়াহমান কবীলার লোক। বনু সালমার বারা' ইবনে মারুর সাথে তার বিয়ে হয়। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি বায়আতে অংশ গ্রহণ করেন। নবীজীকে যখন বকরীর গোশতের সাথে বিষ প্রয়োগ করা হয়, তখন খালিদার পুত্র হযরতের সাথে খাওয়ায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নিচের ঘটনা থেকে এ বর্ণনায় সমর্থন পাওয়া যায়।

যে রোগে হযরত (সাঃ) ইন্তিকাল করেছেন, তাতে আক্রান্ত হওয়ার পর হযরত খালিদা তাকে দেখতে আসেন। তিনি নবীজীর বদন মুবরাকে হাত রেখে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার মতো এতো কঠিন জ্বর আর কারো শরীরে দেখিনি। নবীজী বললেন, যেমনি আমাকে অনেকগুণ বেশি পূণ্য দেয়া হয়, তেমনি বিপদাপদও দেয়া হয় অনেকগুণ বেশি। এরপর নবীজী জানতে চান যে, আমার অসুস্থতা সম্পর্কে মানুষের কি ধারণা? হযরত খালিদা আরয করেন, তাদের ধারণা, আপনি 'যাতুল জম্ব' এ আক্রান্ত হয়েছেন। নবীজী বললেন, আল্লাহ্ আমাকে এ রোগে আক্রান্ত না করুন। এটা হচ্ছে শয়তানী প্ররোচনা। আমি এবং তোমার পুত্র খায়বর যুদ্ধকালে যে ভিষ পান করেছিলাম, আমার ব্যাধি হচ্ছে তারই প্রতিক্রিয়া এ বিষ ভেতরে ভেতরে ক্রিয়া করে বর্তমান অবস্থায় পৌছেছে।

হযরত খালিদা কয়েকটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। তার একটা মশহুর বর্ণনা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। একদা তিনি নবীজীর খেদমতে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মৃত ব্যক্তিকে কি চেনা যায়? আঁ-হযরত বললেন, তোমার হস্তদ্বয় ধূলায় ধুসরিত হোক। পবিত্র রূহতো জান্নাতে সবুজ পাখির মতো। গাছের ডালে পাখিকে যদি চেনা যায়, তবে তাদেরকেও চেনা যাবে। তার ওফাত এবং অন্যান্য ঘটনা কিছুই জানা যায় না।[১]

১. গোটা আলোচনা তবকাত ৮ম খন্ড ২২৯ ও ২৩০ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

৫৪

হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা (রাঃ)

হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবার বংশধারা এই– খাওলা বিনতে সা'লাবা ইবনে আহরাম ইবনে ফিহির ইবনে সা'লাবা ইবনে গানাম ইবনে আওফ। বনূ আওফ ইবনে খাযরাজের লোক। নবীজীর মশহুর সাহাবী হযরত ওবাদা ইবনে ছামেত-এর ভাই আওস ইবনে ছামেত-এর সাথে তার বিয়ে হয়। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নবীজীর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন।

যেহার সমস্যার সমাধানের সাথে তিনি সম্পৃক্ত। জাহেলী যুগের রীতি ছিল যেন কেউ একবার আপন স্ত্রীর সাথে মোযাহারা করলে অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সাথ তুলনা করলে সে স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যেতো। দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হতো চিরতরে। হযরত খাওলার স্বামী আওস ছিলেন অতি বৃদ্ধ লোক। খিট খিটে মেযাজ আর কর্কশ কথাবার্তা এ বয়সের বৈশিষ্ট্য। সামান্য কথায় তিনি রেগে উঠতেন। এমনিতেই তার মেযাজ ভালো ছিল না আর এ বয়সে মেজায ভালো থাকেও না।

একবার কোন ব্যাপারে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। রাগের বশে স্ত্রীকে বলেন ঃ

اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ

তুমি আমার কাছে যেন আমার মায়ের পিঠ। অর্থাৎ আমার মায়ের মতো, তুমি আমার জন্য হারাম। বৃদ্ধ বয়সের রাগ। কিছুক্ষণ পর রাগ কেটে গেলে লজ্জিত-অনুতপ্ত হন। হযরত খাওলার কাছে যেতে চাইলে তিনি বললেন, তুমি আমাকে তালাক দাওনি ঠিক, কিন্তু আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল নির্দেশ না

দেয়া পর্যন্ত তোমার সাথে আমার দাম্পত্য সম্পর্ক হারাম। তুমি আল্লাহ্র নবীর কাছে যাও এবং যা-কিছু করেছ, তার ফয়সালা করাও। স্বামী আওস ইবনে ছামেত বললেন, এ ব্যাপারে নবীজীর দরবারে কিছু আরয করতে আমার লজ্জা হচ্ছে। বরং তুমি-ই যাও। আল্লাহ্ আমাদের উপর রহম করতে পারেন, আল্লাহ্র রাসূলের মাধ্যমে আমাদের জন্য মঙ্গলের পথ করে দিতে পারেন। স্বামীর কথায় খাওলা রাযী হন। কাপড়-চোপড় পরে প্রস্তুত হন। হযরত আয়েশার গৃহে নবীজীর দরবারে হাযির হন। নবীজী অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আওসকে তো আপনি জানেন। তিনি আমার চাচাতো ভাই এবং অতি প্রিয় ব্যক্তি। তার গরম মেযাজ, কটু ভাষণ আর বার্ধক্য জনিত দুর্বলতা সম্পর্কে তো হুজুর ভালো করেই জানেন। তিনি রাগের বসে এমন সব কথাবার্তা বলেছেন, আমি হলফ করে বলতে পারি যে, তালাক নয়। তিনি বলেছেন, اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ তুমি তো আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো। নবীজী বললেন, আমি মনে করি, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছে। এ কথা শুনে খাওলা ব্যথিত হন এবং নবীজীর সাথে বাক যুদ্ধে লিপ্ত হন। এরপর হাত তুলে দোয়া করেন, হে খোদা! আমি তোমার কাছে আমার কঠোর অসুবিধা এবং তার বিচ্ছেদ ব্যাথার অভিযোগ করছি। হে খোদা! আমাদের জন্য যা দয়ার কারণ হতে পারে, তোমার নবীর মাধ্যমে আমাদের জন্য তা প্রকাশ কর। হযরত আঁয়েশা বলেন, এ দৃশ্যটি এমন হৃদয়বিদারক ছিল যে, আমি এবং আমাদের গৃহের সকলেই খাওলার সহানুভূতিতে ক্রন্দন করতে শুরু করলাম।

এ অবস্থায় খুব বেশি সময় না যেতেই নবীজীর উপর ওহী নাযিলের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। হযরত আয়েশা খুশিতে হযরত খাওয়ালাকে বলেন, খাওলা, অনতিবিলম্বে মনে হচ্ছে খোদার তরফ থেকে তোমার ব্যাপারে ফয়সালা হবে। সময়টি ছিলো খুবই নাজুক। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব খাওলাকে আরও অস্থির করে তুলছিলো। আশংকা হচ্ছিলো, বিচ্ছেদের হুকুম হলে

শোকে দুঃখে যেন তিনি প্রাণ হারাবেন। কিন্তু নবীজীর প্রতি নযর করে দেখেন তিনি যেন মৃদু হাসছেন। নবীজীকে হাসতে দেখে তার মনে আশা জাগে। আনন্দে তিনি উঠে দাঁড়ান। নবীজী বললেন, আল্লাহ্ তোমার ব্যাপারে ফয়সালা দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْ اِلَى اللّٰهِ- وَاللّٰهُ

يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا- اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَّصِيْرٌ - الخ

অর্থ : যে মহিলা স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে তর্ক করছিলো এবং আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করছিলো, আল্লাহ্‌র নিশ্চয়ই তা শুনছেন। আল্লাহ্ শুনছেন তোমাদের কথা-বার্তা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাশ্রোতা, মহাদ্রষ্টা।

হুজুর বললেন, তোমার স্বামীকে বলবে, একজন দাস বা দাসী আযাদ করতে। হযরত খাওলা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কাকে আযাদ করবো? খোদার কসম, তার কাছে কোন দাস-দাসী নেই। আর নেই আমি ছাড়া কোন খাদেম। নবীজী ইরশাদ করলেন, তাহলে এক নাগাড়ে ষাটটি রোযা রাখবে। খাওলা বললেন, খোদার কসম, এ ক্ষমতাতো তার নেই। দিনে কয়েকবার তো তাকে খেতে হয়। শরীর দুর্বল হওয়া ছাড়াও সেতো দৃষ্টিশক্তিও হারিয়েছে। নবীজী বলেন, তাহলে তাকে বল ষাটজন মিসকীনকে খাবার দিতে। হযরত খাওলা জবাব দেন, এটাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। নবীজী বললেন, উম্মুল মুনযির বিনতে কয়েসকে ডেকে আন। তার কাছ থেকে উট বোঝাই খেজুর নিয়ে মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করবে।

হযরত খাওলা সালাম জানিয়ে নবীজীর দরবার থেকে বিদায় নেন। গৃহে ফিরে দেখেন, স্বামী আওস দরজায় দাঁড়িয়ে। হযরত খাওলাকে দেখে অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করেন, খাওলা! খবর কি? বললেন, ভালো মনে হচ্ছে, তুমি ভাগ্যবান। নবীজী ইরশাদ করেছেন, তুমি উম্মুল মুনযির বিনতে কায়েসকে সঙ্গে নিয়ে আসবে এবং তার কাছ থেকে কয়েকটি উট বোঝাই

খেজুর নিয়ে ষাটজন মিসকীনকে ছদকা করে দেবে। হযরত আওস অত্যন্ত খুশি হয়ে কসমের কাফফারা আদায় করেন। নবীজীর ইরশাদ অনুযায়ী কাজ করেন।

হযরত উমর তাকে খুব সম্মান করতেন। একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। তার সাথে ছিলো অনেক লোক। পথিমধ্যে হযরত খাওলার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তার প্রতি লক্ষ্য করেন। অনেকক্ষণ তার সাথে কথা বলেন। এক ব্যক্তি বললেন, আমীরুল মু'মেনীন! সকলেই তো এ বৃদ্ধার প্রতি নাখোশ। হযরত উমর বললেন, রে কমবখত! তুই কি জানিস, কে এই বৃদ্ধা? এতো সেই বৃদ্ধা, যার ফরিয়াদ আল্লাহ্ আরশ থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি হচ্ছেন খাওলা বিনতে সালাবা, যার পসঙ্গে আয়াত قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قول الَّتِىْ নাযিল হয়েছে। তিনি রাত পর্যন্ত অবস্থান করলেও আমি নামায ছাড়া অন্য কোন কাজ করতাম না। তার সঙ্গে কথা বলে কাটাতাম।[১]

১. গোটা আলোচনা তবকাত ৮ম খন্ড ২৭৫-২৭৭ পৃষ্ঠা এবং উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড, ৪৪২, পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

৫৫

হযরত রবী' বিনতে নযর (রাঃ)

আনসারদের আদী ইবনে নাজ্জার খান্দানে হযরত রবী' এর জন্ম। হযরত আনাস ইবনে নযর ছিলেন তার ভাই।[১] তিনি নবীজীর মশহুর খাদেম হযরত আনাস ইবনে মালেক এর ফুফী ছিলেন। বংশধারা-রবী' বিনতে নযর ইবনে যমযম ইবনে যায়েদ ইবনে হারাম।[২]

তার পুত্র হারেসা ইবনে সুরাকা বদর যুদ্ধে শহীদ হন। একবার তিনি নবীজীর দরবারে হাযির হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হারেসা সম্পর্কে জানতে চাই। সে জান্নাতে থাকলে আমি ছবর করবো এবং তার শান্তিতে থাকার জন্য আনন্দিত হবো। অন্যথায় কান্নাকাটিতে দিন কাটবে।

নবীজী বললেন ঃ اِنَّهُ اَصَابَ الْفِردَوْسَ الاَعْلٰى.

তুমি নিশ্চিত থাকবে যে, আল্লাহ্ তাকে মহান জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দিয়েছেন।[৩]

একবার তিনি এক মহিলার দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। মহিলার লোকেরা প্রতিশোধ দাবী করে। বিষয়টি নবীজীর দরবারে উপস্থাপন করা হয়। তিনি কেছাছ এর নির্দেশ দেন। নির্দেশ শুনে হযরত আনাস ইবনে নযর কাকুতি-মিনতি করে বলতে শুরু করেন, রাবী'র দাঁত ভাঙ্গা না হোক। তার বিনয়াবত ভাবভঙ্গি আর আকুতীতে সকলে আপ্লুত হয়ে ক্ষমা করে দেয়।[৪]

১. উসুদুল গাবাহ, ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৫২, ২. আল-এছাবাহ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬, ৩. উসুদুল গাবাহ, ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৫২, ৪. ঐ।

হযরত দোররা বিনতে আবূ লাহাব (রাঃ)

আব্দুল মোত্তালেবের পুত্র আবূ লাহাবের কন্যা হযরত দোররা ছিলেন রিশতায় নবীজীর চাচাতো বোন। তার বংশ পরিচয়ের জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু উল্লেখ করার দরকার নেই। হারেস ইবনে নওফেল ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালেবের সাথে তার বিয়ে হয়। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি মদীনা শরীফে হিজরত করেন। মদীনায় পৌঁছে রাফেই ইবনে মালা যরাকীর গৃহে অবস্থান করেন। সেখানে যুরাইকের বংশের অন্যান্য মহিলারা তার সাথে দেখা করতে এসে বলেন, তুমি তো আবূ লাহাব-এর কন্যা, যার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব। এমতাবস্থায় হিজরত দ্বারা তোমার কি সাওয়াব হবে? কথাগুলো শুনে তিনি খুব মনক্ষুণ্ন হন এবং সে অবস্থায় দরবারে নবুওয়্যাতে হাযির হন। অন্যান্য নারীরা যা বলেছে, তা নবীজীর দরবারে পেশ করলে তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বসতে বললেন। অতঃপর সকলের সাথে যোহর নামায আদায় করে মিম্বরে আরোহণ করে সংক্ষিপ্ত খোতবা দেন। এতে তিনি বলেন, আমার বংশ সম্পর্কে লোকেরা আমাকে কষ্ট দেয়।[১] অথচ, খোদার কসম, আমার নিকটত্মীয়রা অবশ্যই আমার শাফায়াত পাবে। এমনকি, ছা'দ-হাকাম এবং সা'লবও[২] এ দ্বারা উপকৃত হবে। তার নিকট থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে। রাবীদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমাইরা এবং হযরত আলী প্রমুখ রয়েছে। ওতবা, ওলীদ এবং আবূ মুসলেম তিন পুত্র সন্তান রেখে যান।[৩] ওফাত সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

১. উস্‌দুল গাবাহ ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৫০. ২. এগুলো হচ্ছে আরব কাবীলার নাম। এসব কাবীলার সাথে নবীজীর দরকম সম্পর্ক রয়েছে, ৩. আল-এস্তীআব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা- ৭৪৭।

৫৭

হযরত হিন্দ বিনতে ওতবা (রাঃ)

হযরত হিন্দ ছিলেন কোরাইশের অন্যতম সর্দার ওতবার কন্যা। পিতৃকুল ওতবা ইবনে রাবী'আ ইবনে আব্দে শামস ইবনে আব্দে মানাফ আর মাতৃকুল ছফিয়্যা বিনতে উমাইয়্যা ইবনে হারেসা ইবনে আওকাদ ইবনে মুররাহ ইবনে হেলাল সালামিয়া।[১] ফাকেহা ইবনে মুগীরা মাখ্যুমীর সাথে তার প্রথম বিয়ে হয়। তারপর আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব-এর সাথে তার বিয়ে হয়। তার গর্ভে আবূ সুফিয়ানের ঔরসে আমীর মু'আবিয়া জন্ম গ্রহণ করেন।[২]

হিন্দ-এর পিতা ওতবা এবং স্বামী সুফীয়ান এরা সকলেই ছিলেন ইসলামের ঘোর দুশমন। আবূ জেহেলের নেতৃত্বে মুশরিকদের হাতে ইসলামের বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু বদর যুদ্ধে আবূ জেহেল ও অন্যান্য বড় বড় মুশরিকদের হত্যার ফলে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ অনেকাংশে হ্রাস পায়। এ সময় আবূ সুফিয়ান আবূ জেহেলের স্থলাভিসিক্ত হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। বদর যুদ্ধের পর সবগুলো যুদ্ধই ছিলো আবূ সুফিয়ানের ষড়যন্ত্রের ফল। ওহোদ যুদ্ধও ছিলো তার প্রতিশোধ স্পৃহার একটা কৌশল মাত্র। আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দও এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এ মহিলা মুশরিকদের পক্ষে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে পিতা ওতবা ও বন্ধুদের স্বপক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণে যে পাষাণ হৃদয়তার পরিচয় দিয়েছে, সে কথা ভাবলেও মন কেঁপে উঠে। এ মহিলা যুদ্ধের ময়দানে ছিল একান্ত তৎপর। যুদ্ধে কাফেরদেরকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ-উৎসাহিত করছিলো। এ উপলক্ষে মহিলা যেসব কবিতা আবৃত্তি করে, ইবনুল আসীরসহ অন্যান্য ঐতিহাসিকরাও তার উল্লেখ করেছেন।[৩]

বদর যুদ্ধে হযরত আমীর হামযার হাতে হিন্দ-এর পিতা ওতবাও নিহত হয়। তাই হযরত আমীর হামযা তার পিতার হত্যাকারী হিসেবে বিশেষ দুশমনে পরিণত হন এবং সে এজন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। জুবাইর ইবনে মুতয়েম এর গোলাম ওয়াহশী ছিলেন যুদ্ধে তীর-বর্শা নিক্ষেপে বিশেষ দক্ষ। মহিলা পিতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাকে পূর্ব হতে ঠিক করে রেখেছিল। তাকে এ প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে যে, এ কৌশলে সে সফল হলে তাকে আযাদ করে দেয়া হবে। হযরত হামযা ওয়াহ্শীর নিকটে এলে সে তাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করলে তার নাভীতে বিদ্ধ হয়। হযরত হামযা জবাবী হামলা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। মাটিতে লুটে পড়ার পরপরই তাঁর প্রাণ পাখি উড়ে যায়।

কোরাইশের নারীরা প্রতিশোধ স্পৃহায় মুসলমানদের প্রতি এতটা ক্ষিপ্ত ছিল যে, মুসলমানদের লাশ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেও তারা ইতস্তত করতো না। তাদের নাক-কান কেটে এসব মহিলারা নিজেরা হিংস্র মানসিকতার পরিচয় দেয়। সবচেয়ে বেশি অপমান করা হয় হযরত আমীর হামযার মৃত দেহের প্রতি। এ মহিলা তার বক্ষ বিদীর্ণ করে কলিজা বের করে তা চিবিয়ে খায়। নবীজী স্বচক্ষে আপন চাচা মহাবীর আমীর হামযার কলিজা চিবিয়ে খাওয়ার এ দৃশ্য অবলোকন করেন। এ সবের পরও হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করলে মহানবী (সা:) তার কাছ থেকে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

ইসলাম গ্রহণ

মক্কা বিজয়ের পর আরবের পুণ্যভূমি ইসলামরে শীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলে নবীজী সকলের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। নেকাব পরে অন্যান্য নারীদের সাথে হিন্দও শরীক হয়। আত্মগোপন করা তার নেকাব পরার অন্যতম উদ্দেশ্য হতে পারে। এ উপলক্ষ্যে নবীজীর সাথে কথাবার্তায় সে চরম ঔধ্যত্যের পরিচয় দেয়। এখানে কথাবার্তার অংশ বিশেষ উল্লেখ করছি–

হিন্দ : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কোন বিষয়ে আমাদের বায়আত গ্রহণ করেন?

নবীজী : আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না।

হিন্দ : আপনি পুরুষদের জন্য এ শর্ত আরোপ করেননি। তারপরও আমি মেনে নিচ্ছি।

নবীজী : চুরি করবে না।

হিন্দ : আমি স্বামীর অর্থ-সম্পদ থেকে কখনো কিছু ব্যয় করে ফেলি। জানি না এটা জায়েজ কিনা।

নবীজী : সন্তান হত্যা করবে না।

হিন্দ : আমরাতো তাকে শৈশব থেকে লালন পালন করেছি। বড় হলে আপনি তাকে হত্যা করেন।

এতসব সত্ত্বেও হিন্দ নবীজীকে প্রশস্ত চিত্তের অধিকারী হিসেবে দেখতে পেয়েও তার সাধুতা এবং ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে নেয়।

হিন্দ বলে : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আগে আপনার চেয়ে বড় আমার কোন দুশমন ছিল না। আর এখন আপনার চেয়ে বেশি প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ নেই। এখন হিন্দতো আর আগের হিন্দ নেই।[৪] তার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। গৃহে ফিরে হিন্দ মূর্তি পূজার প্রতি লানত-অভিশম্পাত করেন। আপন হাতে মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন এবং বলেন, তোমার কারণে আমরা এতদিন গোমরাহীতে ডুবে ছিলাম।[৫] কেবল জাহেলী যুগেই নয়, ইসলামের যুগেও হযরত হিন্দ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত উমরের যমানায় ইয়ারমুকের লড়াইয়ে তিনি স্বামী আবূ সুফিয়ানের সাথে অংশ গ্রহণ করেন এবং রোমকদের সাথে বীর বিক্রমে লড়াই করবার জন্য মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেন।[৬]

চরিত্র

তার চরিত্র সম্পর্কে উসুদুল গাবাহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ছিলেন একজন অভিমানী ও আত্ম-মর্যাদা সম্পন্ন নারী। তার মতামত ছিলো সুস্থ, বুদ্ধি ছিল প্রখর।[৭] তার হাত ছিলো খোলা, মন ছিল উদার। কিন্তু তাই বলে ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারেননি। কারণ, স্বামী আবূ সুফিয়ান ছিলো বখিল। আবূ সুফিয়ান তাকে প্রয়োজন অনুপাতে অনেক কম দিতেন। ইসলাম গ্রহণের পর নবীজী তার কাছ থেকে চুরি না করার বায়আত গ্রহণ করলে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ সুফিয়ান আমাকে পুরো খরব দেয়

না। আমি তার অগোচরে গ্রহণ করলে জায়েজ হবে কি? নবীজী বললেন, প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করায় দোষ নেই।[৮] পিতা ওতবা ইবনে রাবী'আও কন্যার প্রজ্ঞা বুদ্ধিমত্তা ও বিচার ক্ষতার কথা স্বীকার করতেন। বিয়ের ব্যাপারে দু'জনকে বাছাই করে তাদের যে কোন একজনকে পছন্দ করার ইখতিয়ার দেন পিতা কন্যা হিন্দকে। এদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান হিন্দ এর মানদন্ডে উত্তীর্ণ হয়।[৯]

ওফাত

হযরত উমরের খেলাফতকালে তিনি ইন্তিকাল করেন। তার এবং হযরত আবূ কোহাফার ইন্তিকাল হয় একই দিনে। কিন্তু ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদের মতে হিন্দ-এর ইন্তিকাল হয়েছে হযরত ওসমানের শাসনামলে। কিতাবুল আমসাল' থেকেও মনে হয়, বর্ণনাটি সঠিক। কারণ হযরত ওসমানের যমানায় যখন আবূ সুফিয়ানের ওফাত হয়, তখন হিন্দকে বিয়ে করার জন্য কেউ আমীর মুআবিয়ার কাছে প্রস্তাব করে। কিন্তু তিনি অতি শান্তভাবে জবাব দেন যে, এখন সে তো বন্ধ্যা হয়ে গেছে। তার এখন আর বিয়ের প্রয়োজন নেই।[১০]

১. তবকাত, ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৭০, ২. উসুদুল গাবাহ ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬৩. আদ-দুররুল মানসুর ইত্যাদি, ৩. উসুদুল গাবাহ, ৪. ছহীহ বোখারী, ৫. তবকাত, ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৮১. ৯. তবকাত, ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৮১. ১০. আল-এছাবাহ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৮২১।

৫৮

হযরত উম্মে সুরাইকা দাওসিয়া (রাঃ)

মহিলা সাহাবীদের মধ্যে হযরত উম্মে সুরাইকা দাওসিয়া অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। কিন্তু যে পরিমাণ খ্যাতি রয়েছে সে পরিমাণ তথ্য তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকরা তাঁর আসল নাম ও নসবানামা বর্ণনা করেননি। শুধু এতটুকু লিখেছেন যে, দাওস গোত্রের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট। ইয়েমেনের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই গোত্র বসবাস করতো। উম্মে সুরাইক (রাঃ) মক্কায় কখন বা কি কারণে এসেছিলেন, তা জানা যায় না। অবশ্য অনেক ঐতিহাসিকের মতে, আঁ-হযরত (সাঃ) এর নবুয়াত প্রাপ্তির পর যখন দ্বীনের দাওয়াত দিতে শরু করেন তখন তিনি মক্কায় ছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি নির্দ্বিধায় এবং চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাওহীদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আর এমনিভাবে তিনি আস্‌সাবিকুনাল আউয়ালূনের পবিত্র দলের সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন।

আল্লামা ইবনে সা'দত (রঃ) তাবকাত গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত উম্মে সুরাইকা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলে মুশরিক আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে প্রখর রোদে দাঁড় করিয়ে দিতো এবং রুটির সঙ্গে মধু খাওয়াতো। ফলে তাঁর শরীর খুবই গরম হতো। কিন্তু তাঁকে পানি দেয়া হতো না। এমনিভাবে তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মুশরিকরা তাঁকে নতুন দ্বীন পত্যািগের কথা বললো। তিনদিন ও তিনরাতের নির্যাতনে তিনি অনেকটা জ্ঞানহীন হয়ে পড়েছিলেন। মুশরিকদের কথার অর্থ তিনি বুঝতে পারলেন না। যখন তারা আসমানের দিকে ইঙ্গিত করলো তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন যে, তারা তাওহীদ অস্বীকার করার কথা বলছে। তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠলেন: "আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো ঐ আকিদার ওরপর কায়েম রয়েছি।"

হযরত উম্মে সুরাইকা (রাঃ) শুধু নিজেই ইসলাম গ্রহণ করে চুপচাপ বসে থাকেন নি, বরং অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কোরাইশ মহিলাদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। আল্লামা ইবনে আসির (রাঃ) উসুদুল গাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন, ইসলামের প্রথম যুগে হযরত উম্মে সুরাইকা (রাঃ) কোরাইশ মহিলাদের মধ্যে ইসলামের তাবলীগ করতেন। মক্কার কুরাইশরা তাঁর গোপন তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁকে মক্কা থেকে বের করে দেয়।

ঐতিহাসিকরা হযরত উম্মে সুরাইকার (রাঃ) হিজরতকাল সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা দেননি। কিন্তু এটা প্রমাণিত যে, তিনি হিজরত এবং মদীনা মুনাওয়ারাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন। সুনানে নাসাঈতে আছে, হযরত উম্মে সুরাইক (রাঃ) বাড়ীতে- নও-মুসলিমদের দেখা-শুনা করতেন। তাবাকাত গ্রন্থে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, দশ হিজরীতে মশহুর মহিলা সাহাবী হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিনতে কায়েসকে স্বামী আবূ আমর ইবনে মুগিরা তালাক দিয়ে দেন। এ সময় হুজুর (সাঃ) ইদ্দতের সময় পর্যন্ত তাঁকে উম্মে সুরাইকার বাড়িতে অধিক সংখ্যক মেহমানের গমনাগমন থাকে এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনও তাঁর সঙ্গে অবস্থান করে। এজন্য সেখানে পর্দার ব্যবস্থা হবে না। সুতরাং তুমি ইদ্দতকালে অন্ধ ইবনে উম্মে মাকতুমের (রাঃ) গৃহে অবস্থান করো।

রাসূলে খোদা (সাঃ)এর প্রতি হযরত উম্মে সুরাইকরা (রাঃ) অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিলো। আল্লামা ইবনে সা'দ বলেছেন, তাঁর কাছে তেল রাখার হিসেবে ঘি প্রেরণ করতেন। খোদার কি কুদরত! সেই পাত্রের ঘি কখনো শেষ হতে চাইতো না। তিনি সেই পাত্রের ঘি নিজে ব্যবহার করতেন এবং শিশু সন্তানদেরকেও দিতেন। একদিন তিনি পাত্রটি উল্টিয়ে দেখতে চাইলেন যে, তাতে কি পরিমাণ ঘি অবশিষ্ট রয়েছে। সেদিন তেকেই সেই পাত্র ঘি শূন্য হয়ে গেলো। হযরত উম্মে সুরাইকা (রাঃ) হুজুরের খেদমেত হাজির হয়ে এ ঘটনা শুনালেন। ঘটনা শুনে রাসূলে করীম (সাঃ) বললেন : যদি তুমি পাত্রটি না উল্টাতে তাতে দীর্ঘদিন যাবত ঘি অবশিষ্ট থাকতো।

আল্লাহ্‌র পথে নিবেদিতা হযরত উম্মে সুরাইকার (রাঃ) ওফতের সাল ও বিস্তারিত অবস্থা জানা যায়নি।

৫৯

হযরত তামাদুর বিনতে আসবাগ (রাঃ)

হযরত তামাদুর বিনতে আসবাগ (রাঃ) ছিলেন কালাব গোত্রের সরদার আসবাগ বিন আমুরল কালবি (রাঃ) এর কন্যা। তার পিতা ছিলেন খৃস্টান ধর্মাবলম্বী। ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফকে (রাঃ) দাওমাতুল জান্দালের অভিযানে নিয়োগ করেন। তিনি যখন অভিযানে রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, দাওমাতুল জান্দাল পৌঁছে কালাব গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। তারা যদি দাওয়াত কবুল করে তাহলে তাদের সরদারের কন্যাকে বিয়ে করবে। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হুজুরের নির্দেশ পালন করলেন। গোত্রের সরদার আসবাগ (রাঃ) এবং তাঁর কাওমের অনেক মানুষ হৃষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) নির্দেশ অনুযায়ী আসবাগের (রাঃ) কন্যা তামাদুরকে (রাঃ) বিয়ে করলেন এবং তাঁকে জীবন সঙ্গিনী করলেন। কিন্তু একটি রেওয়াতে আছে, হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) মৃত্যু শয্যায় তাঁকে নিজের স্ত্রী থেকে স্বাধীন করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত যোবায়েরের (রাঃ) সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু কিছুদিন পরই এ বিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

কতিপয় রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ) তাঁকে হযরত আবদুর রহমানের (রাঃ) ধন-সম্পদ থেকে অংশ দিয়েছিলেন। তাঁর গর্ভে হযরত আবদুর রহমানের পুত্র আবূ সালাম (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। নেতৃস্থানীয় ঐতিহাসিকরা তাঁর ওফাতের সাল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লেখেননি। অবশ্য বিভিন্ন রেওয়ায়েতে থেকে স্পষ্ট হয় যে, আমীরে মুআবিআর (রাঃ) শাসনামল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

হযরত উম্মে ফারদাহ্ (রা:)

হযরত উম্মে ফারদাহ (রা:) কুরাইশের বনু তাইম বংশোদ্ভূত এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দিকের (রা:) সহোদরা ছিলেন। বংশধারা হলো: উম্মে ফারদাহ (রা:) বিনতে আবূ কোহাফাহ ওসমান (রা:) ইবনে আমর ইবনে কা'বা সা'দ ইবনে তাইম বিম মাররাহ্ ইবনে কা'বলুব্বী।

চরিতকাররা তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময় লিখেননি। কিন্তু তিনি যে সাহাবী ছিলেন এ ব্যাপারে সকলেই একমত। হযরত আশয়াছ (রা:) ইবনে কায়েসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। হাফিজ ইবনে হাজার (রা:) 'ইসাবাহ' গ্রন্থে লিখেছেন, আশয়াছ (রা:) ইবনে কায়েস ইয়েমেনের কিন্দার শাসক ছিলেন। তিনি ১০ম হিজরীতে একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূলের (রা:) খেদমতে হাজির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রিয় নবীর (সা:) ইন্তিকালের পর ধর্মদ্রোহীর ফেতনায় অংশ নেন। অবশেষে তাঁকে গ্রেফতার করে খলিফা হযরত আবূ বকর সিদ্দিকের (রা:) খেদমতে আনা হয়। তিনি সত্য অন্তরে খলিফাতুর রাসূলের কাছে তাওবা করেন এবং নিজের পদস্খলের জন্যে লজ্জিত হন। এতে সিদ্দিকে আকবর (রা:) তাঁকে শুধু ক্ষমাই করেননি, বরং নিজের সহোদরা উম্মে ফারদাহকে তার সাথে (রা:) বিয়েও দেন। বিয়ের পর আশয়াছ (রা:) বাজারে গেলেন। বাজারে উট আসছিলো। তিনি তরবারী হাতে নিলেন এবং যে উটই সামনে পেলেন তাঁর কুনুই কেটে মাটিতে ফেলে দিতে লাগলেন। লোকজন আশ্চার্য হয়ে গেলো। আশয়াছ (রা:) বললেন, আমি যদি দেশে থাকতাম তাহলে

আরো অনেক সম্পদ থাকতো। একথা বলেই তিনি উটগুলোর মূল্য আদায় করে দিলেন এবং মদীনাবাসীদেরকে বললেন: আপনাদের দাওয়াত রইলো।

হযরত আশয়াছ (রা:) ২০টি উট মেরে মাটিতে ফেলে দিলেন। এতে বাজারে শোরগোল পড়ে গেল যে, আশয়াছ (রা:) কাফের হয়ে গেছে। আশয়াছ (রা:) এ কথা শুনে তরবারী ফেলে দিয়ে বললেন: "খোদার কসম! আমি কাফের হইনি। বরং তিনি (আবূ বকর সিদ্দিক) নিজের সহোদরাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। আমি যদি আজ দেশে থাকতাম তাহলে এর চেয়েও উত্তম ওয়ালিমা করতাম। মদীনাবাসীরা! এ গোশত নিয়ে যাও এবং খাও। আর উটের মালিকরা! তোমরা আমার কাছ থেকে উটের মূল্য নিয়ে যাও।"

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, তিরমিযী এবং আবূ দাউদ হযরত উম্মে ফারদাহর (রা:) কাছ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবীকে (সা:) জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, কোন্ কাজ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেছেন, প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা।

পরিশিষ্ট

ইসলামের স্বর্ণযুগে এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে নারীরা পূর্ণ যোগ্যতা ও অধিকারসম্পন্ন মানুষ হিসেবে সমাদৃত হয়। সেখানে নারী সর্বজনমান্য মানুষ প্রস্তুতকারী এক মহীয়সী জননী হিসেবে সমাজের কাছ থেকে যথার্থ মর্যাদা লাভ করে। সমাজে ইবাদতের স্থান, জ্ঞানচর্চার স্থান এবং যুদ্ধের ময়দানে ক্ষণস্থায়ী সময়ের জন্যে নারী ও পুরুষের একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিতো। তারপরও এসব স্থানে নারীদের জন্যে পৃথকভাবে বসা, শালীনতাসম্পন্ন পোশাক ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশ বিরাজমান থাকায় কোনো লোলুপ দৃষ্টি তাদেরকে বিব্রত করেনি, কিংবা কারো অসংযত আচরণ তাদেরকে পীড়া দেয়নি। সেখানে কোন নারী যখন পুরুষদের সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করে তখন পুরুষরা লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিতো। কোনো নারী যখন আসন গ্রহণ করে তখন পুরুষরা তার থেকে সরে দাঁড়ায় এবং কোনো নারী যখন কোনো রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে, তখন তার প্রতি সম্মান আর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হতো। ইসলামী ফিকহ্ শাস্ত্রে নারী সংক্রান্ত নীতিমালায় মাযহাবী মতভেদ যতই প্রতিফলিত হোক, তার আসল রূপ সর্বযুগে এক রকমই থেকেছে। কেননা আল্লাহ্র কিতাবে, রাসূলের হাদীসে, রাসূল সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের পরবর্তী অনুসারীদের বাস্তব অনুশীলন ও কর্মধারায় এই নীতিমালা স্বচ্ছ ও স্পষ্টভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

তারপর ক্রমাগত মুসলিম সভ্যতার বিকাশ-সম্প্রসারণ এবং মুসলিম দেশসমূহের রীতিনীতি ও আচার আচরণে বিবর্তন ঘটতে থাকায় নারীকে বিভিন্ন যুগ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কখনো তার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষিত হয়, আবার কখনো তা অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হয়। সর্বশেষে নারী এমন এক পতনের যুগে পদার্পণ করে, যখন তার অধিকার ও মর্যাদা অনেকাংশে ভূলুণ্ঠিত হয় এবং সে চরম অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হয়। ফলে ইসলাম নারীর উপর যে সামাজিক দায়িত্ব অর্পণ করেছিল, তা পালনে সে একবারেই অক্ষম হয়ে পড়ে। এসব বিষয় আমরা সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, এই তমসাচ্ছন্ন যুগেও দুইটি জনিসি অঅবিকৃতভাবে বহাল ছিলো:

এক : ইসলাম নারীর যে অধিকারসমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল তা মুসলিম ফকীহ্দের প্রণীত গ্রন্থসমূহে অবিকৃতভাবে বহাল ছিলো, যদিও

সমকালীন সমাজ বেশির ভাগই কার্যকরি রাখতে সক্ষম হয়নি। এর মুল কারণ ছিলো, মুসলিম নারী ইসলামী সমাজে যেসব অধিকার পেয়েছে ও ভোগ করেছে, তা কোনো আকস্মিকভাবে উদ্ভূত সামাজিক জরুরী পরিস্থিতির তাগিদে দেয়া অধিকার ছিলোনা যে, স্বাভাবিক অবস্থা বহাল হওয়ার পর বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারবে। বরং এগুলো ছিলো স্বয়ং আল্লাহ্‌র শাশ্বত আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অধিকার, যাকে বিকৃত বা পরিবর্তিত করার অধিকার কারো ছিলোনা, তা সে যতো উচ্চ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই হোক না কেন।

দুই : মুসলিম নারীর সতিত্ব ও সৎ চরিত্রের সুনাম এবং তার পারিবারিক দায়িত্ব পালনের অভ্যাস এই পতনের যুগেও অটুট ও অক্ষুণ্ন ছিলো। পতন যুগে মুসলিম সমাজ যত বিকৃতি, অধঃপতন ও নৈরাজ্যেরই শিকার হোক না কোন, তার নারী সমাজের এ উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যটি কখনো কালিমালিপ্ত হয়নি। আর এই বৈশিষ্ট্য মুসলিম নারীকে পাশ্চাত্যের লেখকদের কাছে ঈর্ষার পাত্রে পরিণত করেছে। এর কারণে তারা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের সূচনাকালে মুসলমানদের সাথে যোগাযোগ রাখা ও তাদের অবস্থা অনুসন্ধান করা শুরু করেছে।

সত্যি কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুসলিম দেশগুলোতে কর্মরত অমুসলিম সংযোগ মাধ্যমগুলো মুসলিম সমাজের ঐতিহ্য ও রীতিনীতিতে নারীর সতিত্ব সুরক্ষা ও তার প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন থেকেই বিরত থাকাকে মুসলিম নারীর কৃতিত্ব ও সুখ্যাতির কারণ বলে মেনে নিয়েছে, যা থেকে পাশ্চাত্যের নারী বঞ্চিত। অথচ মুসলিম নারী ও খ্রিস্টান নারী একই ধর্মের অনুসারী। (ওহীযোগে প্রাপ্ত ধর্মের)। এ কারণেই আমরা আজও সম্ভ্রান্ত খ্রিস্টান পরিবারসমূহে নারীর সতিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মানসিকতা দেখতে পাই, যদিও আমাদের সাথে তাদের ঐতিহ্য, নৈতিকতা ও রীতিনীতিতে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

অতএব এই নারী সমাজকে সেই স্বর্ণযুগে ফিরে আসতে হলে মহিলা সাহাবীদের জীবনী অনুসন্ধান ও গবেষণা করা একান্ত প্রয়োজন।

সমাপ্ত